নয়া ভারতের শিক্ষা

[EDUCATION IN NEW INDIA]

শ্রীহুমায়ুন কবির

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬২

দাম : আট টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস,
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণায় ভারত সংকল্প গ্রহণ করেছে যে, দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে সকল নাগরিকই যেন উন্নতির সমান অবকাশ ও সুযোগ পায়। দেশের নবীন আশা ও নতুন নতুন প্রয়োজন আরো সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ করবার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গেই দেশে শিক্ষাপ্রণালীর নতুন করে পুনর্গঠনের এক বিরাট পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে। সকলের জন্যে সুযোগ-সুবিধার সমীকরণ ও শিক্ষাপ্রণালীর পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানিতে সংক্ষিপ্তভাবে তার বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি। আশা করি যে, সংক্ষিপ্ত হলেও এ-বিবরণ পাঠককে এই সমস্ত ব্যবস্থার বিষয়ে যথাযথ ধারণা দেবে।

স্বাধীনতা-লাভের প্রাক্কালে দেশের শিক্ষা-পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা-লাভের পরে সে-পরিস্থিতিতে যে-পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে তার আভাস দেওয়ার পরে বাকী অধ্যায়গুলিতে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতে কি কি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা সুরু হয়েছে তারই বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। ভারতে বুনিয়াদি-শিক্ষার ধীরে ধীরে যেভাবে বিকাশ হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে তার প্রসারের সম্ভাবনা প্রচুর এবং সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষাবিদের জন্যই তার বিশেষ মূল্য আছে। বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতে যে-নতুন পরিকল্পনা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে অন্যান্য দেশের পক্ষেও তার তাৎপর্য কম নয়। শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতে বিশেষ কোন নতুন পরীক্ষা হয় নি। অন্যান্য দেশে এ-ধরনের শিক্ষা যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে ভারতে তারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষার ক্ষেত্রেই ভারতে সাম্প্রতিক বিকাশের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও

এ-ক্ষেত্রে নতুন কোন পরীক্ষার পরিচয় নাই বলে বর্তমান গ্রন্থে তার বিষয় আলোচনা করিনি।

এই বইটি লিখতে বহু লোকের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের ঋণস্বীকার সম্ভবপর নয়। মন্ত্রণালয়ের সহকর্মিগণ এবং রাজ্যশিক্ষা-অধিকারগুলির কাছে বহু তথ্য, তত্ত্ব ও ভাষ্যের জন্য আমি ঋণী। অবশ্য এই বই-এ প্রকাশিত সব মতামতই আমার নিজস্ব এবং তার দায়িত্বও আমার। বিশেষতঃ এই মতামতগুলির জন্য ভারত সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্ট্‌স্ কমিশনকে কোনভাবেই দায়ী করা চলবে না।

বিভিন্ন সময়ে ভারত, ইউরোপ এবং আমেরিকার সাময়িক পত্রাদিতে ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছি বর্তমান গ্রন্থ-রচনায় সেগুলির বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু পুরানো রচনা সংশোধিত ও পরিবর্তিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় পুরোপুরি পুনর্লিখিত হয়েছে। বই-এর অন্তর্ভুক্ত কোন প্রবন্ধই বর্তমান আকারে পূর্বে প্রকাশিত হয় নি—একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। তা ছাড়া, একসঙ্গে প্রকাশ করার ফলে প্রত্যেকটি লেখাই অপর লেখা থেকে তার মতের স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং নজির সংগ্রহ করেছে। এটি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশনার দ্বারা হয় না। যদি এই লেখাগুলি পাঠককে, বিশেষ করে বিদেশের পাঠককে ভারতের শিক্ষাপ্রচেষ্টার অমিত উদ্দীপনা, প্রাণশক্তি এবং বৈচিত্র্যের আভাস দেয় তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

লণ্ডন

জুলাই ৪, ১৯৫৫

হুমায়ুন কবির

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে শিক্ষা

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের সামনে বহু কাজ দেখা দিল। তার মধ্যে একটি প্রধান হচ্ছে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও বিস্তার। তখন লক্ষ্য হল শিক্ষার বয়স হলেই যাতে সব ছেলেমেয়ে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা। কিশোর-শিক্ষার এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাও করা হল। তাছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও নতুন করে গড়ে তোলার আয়োজন করা হতে লাগল। শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ব্যবস্থাও বাদ পড়ল না। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি রাখা হল। তাই শিল্পকলার বিচিত্র রূপের উজ্জীবন ও পুষ্টির জন্যে দরকার হল সরকারী পোষকতার। বিদেশী শাসনের আমলে বহু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে, মুক্তির পর আবার সে-সম্বন্ধ পাতিয়ে নেয়া দরকার বিবেচিত হল। যে-সব দেশের সঙ্গে আগে কোন সম্পর্ক ছিল না সেখানেও সম্পর্ক পাতানো হল। ব্রিটিশ শাসনের প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রায় একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে। কিন্তু স্বতন্ত্র ভারত তো বৃহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একধারে কুঁকড়ে পড়ে থাকতে পারে না।

স্বরাজ লাভ করার পর ভারত তার সংবিধান রচনা করে নিলে। সে-সংবিধান হল গণতান্ত্রিক। তাতে এই বিধান বিধিবদ্ধ হল যে, চোদ্দ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ের শিক্ষা হবে বিনা বেতনে, আর, তা হবে বাধ্যতামূলক। নির্দেশ হল যে, এই নীতি স্বীকৃত হওয়ার

দশ বছরের ভেতর একে কাজে পরিণত করতে হবে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীদের শতকরা ২৫ জনেরও শিক্ষার এমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না; এই কথা মনে করলেই বুঝতে পারা যাবে স্বাধীন ভারতের সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা কতটা যুগান্তকারী। এ-কাজ তো এমনিতেই কঠিন; তার ওপর আবার কতকগুলো বিপর্যয় এসে একে কঠিনতর করে তুলেছিল। স্বরাজ-লাভের জন্য দেশকে চরম মূল্য দিতে হল দেশ ভাগ করে। এই দেশ-ভাগের ফলে জীবন-যাত্রার ধারা হয়ে গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; লক্ষ-লক্ষ লোক হল ছিন্নমূল, উদ্‌বাস্তু—হল শরণার্থী। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ভেতর ১ কোটি লোকের বিনিময় হল। এই অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষের পুনর্বাসনের জন্যে ভারতকে তার রসদ-সম্পদ ব্যয় করতে হল। এই সমস্যার সমাধান হতে না হতেই পৃথিবীর আর্থিক অবস্থার গতিকে ভারতীয় মুদ্রা-মানের দাম গেল কমে। তার ফলে দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতি ও সামগ্রীর অভাব। স্বরাজ-লাভের প্রথম পাঁচ বছর হয় অবৃষ্টি নয় অতি বৃষ্টি হওয়াতেও ভয়ানক অনটন আর টানাটানিতে কাটল। বিদেশ থেকে এত খাদ্য আমদানি করতে হল যা কোন কালে করতে হয় নি। এই-সব অনিবার্য কারণেই শিক্ষার উন্নতি আশানুরূপ হতে পেল না।

ভারতের স্বরাজ-লাভের পর দেশ-ভাগের জন্যে রাজনীতিক, অর্থনীতিক, এবং আরও নানা অসুবিধা সাময়িকভাবে দেখা দিলেও একটা বিষয়ে খুব উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। সেটা হচ্ছে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতের সঙ্গে ঐক্যবিধান। ইংরেজ আমলে এগুলিকে ভারত থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। তার জন্যে তখন ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের ভারতের জীবন-যাত্রায় ঐক্য ছিল না। তখন দেশীয় রাজ্যগুলি খুব পিছিয়ে ছিল, শুধু রাজনীতিক ব্যাপারে নয়, অর্থনীতিক ব্যাপারেও। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাবিষয়ে। আর

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে ছিল বলেই সামাজিক ক্ষেত্রেও ছিল পশ্চাদ্‌বর্তী। অবশ্য দু-একটা রাজ্যে যে এর ব্যতিক্রম ছিল তা মানি। তবে, মোটের মাথায়, বেশির ভাগ রাজ্যে অনগ্রসরতার জন্যে সারা ভারতের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয়েছিল বিলক্ষণ। স্বতন্ত্র ভারতে এই রাজ্যগুলোকে আবার যুক্ত-মিলিত করে সমগ্র ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ করে নেয়া হল। অনেকগুলো কড়া মিলিয়ে যেমন একটা শিকল হয় তেমনি অনেক প্রদেশ ও রাজ্য মিলিয়ে আমাদের এই বিশাল, বিচিত্র ভারতবর্ষ। শিকলের একটা কড়া মরচে-পড়া, অপোক্ত হলে গোটা শেকলটাই অশক্ত হয়ে যায়। ভারতের একটা রাজ্যও দুর্বল হয়ে থাকলে সে-দুর্বলতার ছোঁয়াচ লাগবে সমগ্র ভারতেই। এখন সমগ্র ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলো যুক্ত হওয়ায় সুবিধা এই হল যে এদের দুবলতা ও রুগ্নতা সারিয়ে ফেলতে পারলেই পূর্ণ ভারতবর্ষ হবে শক্তিতে-সামর্থ্যে, শিক্ষায়-কৃষ্টিতে প্রাণপ্রদীপ্ত, হবে উন্নতিলক্ষিত।

ভারতের মানব-সমাজের কোন-কোন অংশের বহুযুগবাহিত স্থবিরতা ও নানা অন্যায় অসুবিধা দূর করে এগিয়ে চলার সমান সুযোগ-সুবিধার বিধান দেয়া হয়েছে ঐ একই উদ্দেশ্যে। ভারতীয় মানব-সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা, বয়স্ক নিরক্ষর মানুষেরা যাতে আগেকার সামাজিক, অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত না থাকে, বরং যাতে বিশেষ সুযোগ পায় তার বিধান রয়েছে সংবিধানে। এই লক্ষ্যেই সামাজিক শিক্ষার ব্যাপক প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। বালিকা ও নারীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে ১৯৪৭—৪৮ থেকে ১৯৫৪-র ছ-সাত বছরের ভেতর নারীদের শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ডবল।

আর-একটি উপায়ে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের শিক্ষাক্ষেত্রের সুযোগ সমান করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। তা হচ্ছে বৃত্তি।

ভালো ছাত্রদের তো বহু-রকমের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়েছেই, গরিব ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকেদেরও শিক্ষাগ্রহণের নানা সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া হয়েছে। তপশীলী জাতি ও উপজাতিগুলির ইস্কুলের ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং বৃত্তি দিয়ে শিক্ষায় উৎসাহিত করছে রাজ্য সরকারগুলি। কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকার তাদের জন্যে কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪-এর ভেতর প্রদত্ত বৃত্তি হয়েছে তিরিশ গুণ। ১৯৫৩—৫৪-তে এর টাকার পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ টাকা। ১৯৫৪-৫৫-তে এই খাতে দশ লক্ষ টাকারও ওপর খরচ করার কথা।

শিক্ষার সব উন্নতি শেষ অবধি যে শিক্ষকদের গুণের ওপর নির্ভর করে—একথা এখন প্রায় সকলেই বুঝছেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে শিক্ষকদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সে-অবনতি তো চরমে পৌঁছেছিল। যাঁদের কোথাও কোন কাজ জুটত না একমাত্র তাঁরাই এসে জুটতেন শিক্ষকতা করতে। দেশনেতারা বুঝতে পারলেন, দেশের উন্নতি নির্ভর করে তরুণদের গুণাগুণের ওপর; আর তরুণদের গুণাগুণ অপেক্ষা করে ভালো-ভালো শিক্ষকের শিক্ষাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় যা-কিছু তা ১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত তো তাঁরা করতে পারেন নি।

মাত্র ১৯৪৭-এর পর থেকেই এ-বিষয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়। শিক্ষকদের মাইনের হার ভালো করা হয়, কোন-কোন ক্ষেত্রে তা বাড়িয়ে দেয়া হয় চার-পাঁচ গুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাইনে এমন দাঁড়ায় নি যাতে যথার্থ শিক্ষক হবার উপযুক্ত মানুষ শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হতে পারেন। শিক্ষকদের মানমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বাড়াবার ব্যবস্থাও কিছু-কিছু হয়েছে। এই সেবার রাষ্ট্রপতি-ভবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বিশেষ আদর-অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী ও

ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে থেকে বাছাই-করা কয়েকজনকে নিয়ে শোভন পার্বত্য পরিবেশে আলোচনা-অধিবেশন করা হয়েছিল গ্রীষ্মাবকাশে। সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকেরাও সমবেত হয়েছিলেন সিলেবাস, পাঠধারা এবং নানা শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে। সংক্ষেপে বলা যায় যে সবস্তরের শিক্ষকরা যাতে দেশের শিক্ষা ও সমাজের নিয়ম-নীতি-গঠনে অংশ নিতে পারেন তার চেষ্টা করা হচ্ছে। একথা অবশ্য এখানে স্বীকার করতে হবে যে যথার্থ উপযুক্ত ও শিক্ষাব্রতী শিক্ষকের দল পেতে হলে এ-বিষয়ে আরও অনেক কিছু করতে হবে।

১৯২১ সাল থেকে শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের বিষয় বলে গণ্য হয়ে আসছে। প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী তার পরিচালন-ব্যবস্থার জন্য ঐ সরকারের কাছে দায়ী। জনগণের নির্বাচিত মানুষ এই শিক্ষামন্ত্রী। স্বাধীন ভারত তার সংবিধানে এ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করে নি। শিক্ষার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাড়া সব স্তরের শিক্ষাই এখনও রয়েছে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বে। আর গুরুত্বপূর্ণ দিক দু'টি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ী ও কারিগরী শিক্ষা; এই দু'-রকমের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থায় ও পরিচালনায় যাতে ঐক্য ও সহযোগ থাকে, যাতে শিক্ষার মান খুব উঁচু ধরনের হয় তার জন্যে এগুলির দায়িত্ব সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার খরচ খুব বেশি; তাই, একই বিষয়ে দো-তরফা খরচ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই কারণেই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষা রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাধীন হলেও এবং এ-বিষয়ে কোন বিধিগত অধিকার না থাকলেও অবস্থাগতিকে ও জরুরী দরকারের দাবিতে শিক্ষার সব অঙ্গের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। শিক্ষাই ভবিষ্যৎ বংশীয়দের

মনোভাব গড়ে তোলার উপায়। সারা দেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অবস্থায় যাতে ঐক্য থাকে তা করা দরকার। শিক্ষা দ্বারাই তা বেশ ভালো করে হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যে উপদেষ্টা ও ঐক্য-বিধায়ক শক্তিরূপে কাজ করছে তার কারণ তিনটি। এক,— রাজ্য সরকারগুলির অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুন শিক্ষার নানা পরিকল্পনা কার্যকরী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই আর্থিক আনুকূল্য-লাভের আশায় নির্ভর করে থাকতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। দুই,—সব রাজ্যের মধ্যে আদান-প্রদানের মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করার মতো শক্তি ও সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকারেরই আছে। তিন,—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি একই রাজনীতিক দলের নির্দেশে চালিত হওয়ায়ও প্রাদেশিক সরকারগুলির সুবিধা হয়েছে, বিশেষ করে, পণ্ডিত নেহরুর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি থাকার জন্যে।

আইনের দিক থেকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির ওপর চাপ দিতে পারে না, শুধু উপদেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য না নিয়ে পারলে কোন রাজ্য সরকার তার নির্দেশ না মানতেও পারে। কিন্তু তাতে করে সারা দেশের শিক্ষা-নীতিতে ঐক্য ও সমন্বয় না হতে পারে বলে এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ' গঠন তারই ফল। এতে রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষা-মন্ত্রীরা হচ্ছেন সভ্য, তাছাড়া এতে থাকেন কয়েকজন শিক্ষাবিশেষবিদ্। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী তার সভাপতি। এই পর্ষৎ-এর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক, কোন সরকারই অমান্য করতে পারে না।

'সর্বভারতীয় কারিগরী শিক্ষা-সংসদ' এবং হালে গঠিত 'বিশ্ব-বিদ্যালয় দান কমিশন' কারিগরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐরকমই কাজ করে থাকে। এ-দু'টি ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় সরকারের

বিধি-সংগত, সংবিধান-সম্মত ক্ষমতা আছে সে-কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া, এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শে কেন্দ্রীয় সরকার মোটা মোটা টাকা দেবার ব্যবস্থা করে থাকে। এই পর্ষৎ-সংসদগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। সারা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় যাতে শৈথিল্য, বিশৃঙ্খলা না আসতে পারে, বরং যাতে সংহতি ও সংসক্তি থাকে, তার চেষ্টা করা এগুলির কাজ। আর সে-বিষয়ে এদের স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট ক্ষমতাও দেয়া আছে।

ভারত সরকারের 'পরিকল্পনা পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সারা ভারতে শিক্ষার আদর্শ ও মান-বিষয়ে ঐক্য ও সংগতি রক্ষা করে চলার আরও জোর পাওয়া গেল। ভারতের সর্বত্র সংবিধানের নির্দেশক নীতিগুলি যদি কার্যকরী করতে হয় এবং সকল মানুষের জীবন-মান উন্নত করতে হয় তবে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সামঞ্জস্য করে চলা চাই। এই প্রতীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল পরিকল্পনা পরিষদ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরিষদের কাজ হল সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পদ, পুঁজি ও মানবিক শক্তিসম্পদ সম্বন্ধে হিসেব-নিকেশ করে ঠিক করা—কেমন করে তাদের সুমিত-সফল ব্যবহার করা যায়। এর জন্যে পরিষদকে জাতীয় কর্মক্ষেত্রের সব দিকের একটা চৌহদ্দি ছকে নিতে হল। প্রয়োজনের মাপে আমাদের সম্পদ কম। তাই কোন্ কাজগুলো আগে করা দরকার তা ঠিক করে নিয়ে প্রাপ্ত সামগ্রী-সম্পদের যথার্থ ও সার্থক ব্যবহার করার দিকে দৃষ্টি রাখতে হল, দেখতে হল যাতে সবচেয়ে জরুরী জিনিস-গুলোর চাহিদা আগে-আগে মেটানো হয়। যাতে একই বিষয়ে দু'-দু'বার অর্থব্যয় হয়ে অপচয় না হয়, এবং যাতে সর্বস্তরে সর্বত্র কার্যসূচীসমূহের সহযোগ-সংগতি থাকে লক্ষ্য রাখতে হল সেদিকেও।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে একটা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রোগ্রাম করতে হল পরিকল্পনা পরিষদকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর যে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অঙ্গাঙ্গী

ভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং কোন-এক অংশের উন্নতি ব্যাহত হয়ে থাকলে যে অপর অংশের উন্নতি বিঘ্নিত হতে বাধ্য, পরিষদে স্পষ্টভাবেই তা স্বীকৃত হল। ভারতের বিভিন্ন অংশের শিক্ষার মান ও অবস্থা যে একরকম নয়, তাই ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় শিক্ষাবিষয়কে প্রোগ্রামের কিছু তফাৎ রাখা দরকার—একথাও পরিষদ বুঝল। তার জন্যে তাকে ঠিক করে নিতে হল—কোথায় কাজ আগে সুরু করতে হবে, কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, কেননা, তা নইলে যে দেশের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার কাজে সংগতি আসবে না। তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের সর্বত্র শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মান-বিষয়ে ঐক্য ও সংগতি আনতে আয়াস করবেই।

১

স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের দেশে শিক্ষার নানা স্থানে কী কী উন্নতি হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেয়া যাক এবার। ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছ' থেকে সাত বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা তিরিশ জনও শিক্ষা নিত কিনা সন্দেহ। পাঁচ বছরের ভেতর তার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হল শতকরা ৪০ জন, তার পর আরও বেড়ে চলেছে। ১৯৪৮-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ক-রাজ্যের এলাকাগুলিতে প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৪০,০০০। ১৯৫৩-র ৩১শে মার্চ তা হল প্রায় ১,৮০,০০০। এই রাজ্যগুলিতে লোকসংখ্যা বেড়েছিল ৪৬ লক্ষ। অপর শ্রেণীর রাজ্যগুলির শিক্ষাব্যবস্থার পাকা হিসাব না পাওয়া গেলেও মোটামুটি একথা বলা যায় যে ১৯৪৭-এর আগে এদের অনেকগুলোতেই শিক্ষার কোন সুনির্ধারিত ব্যবস্থা ছিল না, শিক্ষাবিষয়ক পরিসংখ্যান তো ছিলই না। এই জায়গা-গুলোতে এখন শিক্ষার প্রসার হয়েছে অনুপাতে অনেক বেশি।

১৯৫৩-র ৩১শে মার্চ সারা ভারতে প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যা হয়েছিল ২,২০,০০০, আর ছাত্রসংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষেরও ঢের বেশি।

কিন্তু শুধু যে সংখ্যাতেই শিক্ষার উন্নতি হয়েছে তা নয়, শিক্ষার গুণগত উন্নতিও বড়ো কম হয় নি। প্রাথমিক স্তরে আগে শিক্ষা ছিল অনেকটাই পুঁথিগত এবং অব্যবহারিক। এখন সেখানে ধীরে-ধীরে ঠাঁই নিচ্ছে জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা হল এই যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ থাকা চাই; সে-শিক্ষা হবে সমাজে প্রয়োজনীয় কোন কাজকে কেন্দ্র করে। এই শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী নীতি হল এই যে পঠন-পাঠনের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আলাদা-আলাদা করে দেখলে চলবে না; তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য কোথায় তা বোঝার ও বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে। এই স্তর থেকেই ছাত্রদের শেখাতে হবে সামাজিক জীবনে সহযোগিতা করে বেঁচে-থাকার নীতি। ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বুনিয়াদী শিক্ষার এই নীতি গ্রহণ করেছেন। তাই সর্বত্রই দেখা দিয়েছে পরিবর্তনের কাজ। আরও শিক্ষাবিস্তারের সুবিধার জন্যে হাতে নেয়া হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষণের এবং মুখ্য পরিকল্পনাগুলোকে কার্যকরী করার কাজ। বুনিয়াদী পাঠশালার সংখ্যাও বেড়েছে; তবে যে-পরিমাণ অগ্রগতি এতে হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল ততটা হয় নি। হয় নি যে তার কারণ যথার্থ শিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।

১৯৪৭-এ প্রাথমিক পাঠশালার ?.৬১,০০০ শিক্ষকের ভেতর শতকরা ৫৮·২ জন শিক্ষণ পেয়েছিলেন। শিক্ষণ-শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষক-ছাত্রদের সংখ্যা বছরে ৪০,০০০-এরও কম ছিল। ১৯৩৫-এর মধ্যে তা বেড়ে হল বছরে ৭০,০০০। আগে থেকে যে-শিক্ষণ-শিক্ষালয়গুলো ছিল তাদের অনেকগুলোকেই রূপান্তরিত করা হল বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষণ-কাল দেয়া হল

কমিয়ে; এমন ব্যবস্থাও করা হল যাতে মাঝে-মাঝে কাজ করে এসেও আবার শিক্ষণ নেয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এখনও শিক্ষণালয় ও শিক্ষণার্থীদের সংখ্যা দরকারের তুলনায় কম সে-কথা না মেনে পারা যায় না।

সব প্রাইমারি ইস্কুলকে বেসিক্ ইস্কুলে রূপান্তরিত করতে সময় নেবে। তাই তার আগে বর্তমান প্রাথমিক পাঠশালা-গুলোকে সম্ভবমতো উন্নত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবস্থা এমন হয়েছে যাতে পরে এগুলোকে সহজেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যায়। ছাত্রদের যাতে কর্ম ও নির্মাণশক্তি বাড়ে তার জন্য শিক্ষাবিষয়-তালিকার ভেতর এরই মধ্যে হাতের কাজ শেখাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দেশ যে শিক্ষাবিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ-বিধানকে কাজে ফলাতে কতখানি তৎপর ও উৎকণ্ঠিত তা বোঝা যায় শিক্ষাখাতে খরচের হিসেবটা জানলে। ১৯৪৮-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ক-রাজ্যগুলোর প্রাথমিক পাঠশালার উদ্দেশ্যে ব্যয়ের অঙ্ক ছিল বছরে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-র ঐ তারিখে সে অঙ্ক বেড়ে উঠেছিল ৩৪ কোটি ৯০ লক্ষে। এই সময়ে সারা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাখাতে খরচ হয়েছিল ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

আর দু'টি বিশেষ উল্লেখ্য ব্যাপারের কথা না বললে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া হবে না; সে-পরিচয় থেকে যাবে অস্পষ্ট। স্বরাজ-লাভের পর মানুষেরা এখন বেশ অধিকার-সচেতন হয়েছেন। তাঁরা এখন চান সন্তান-সন্ততিদের যোগ্য শিক্ষা দিতে। তাই গাঁয়ে-গাঁয়ে ইস্কুল গড়বার সাড়া পড়ে গিয়েছে। এর জন্যে গাঁয়ের লোকেরা পরম উৎসাহে টাকা, জমি ও শ্রম দান করেছেন। এমন হয়েছে যে একটা জেলায় স্থানীয় লোকেরাই ৬০০ বিদ্যাভবন তৈরি করে দিয়েছেন। ১৯৪৭-এর আগে যে-সব এলাকায় শিক্ষার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই হয়, কি, যদি ছিল

তো অতি সামান্যই ছিল—সে-সব জায়গায় শিক্ষার আগ্রহ আরও বেশি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি-এলাকার ৩০ হাজার মাইল জায়গা জুড়ে কোন ইস্কুল ছিল না ১৯৪৭-এর আগে। ১৯৫৩-তে সেখানে ইস্কুল হয়েছে ১,৯০০।

২

শিশুদের শিক্ষাই জাতির প্রথম কর্তব্য; সুতরাং তাতেই দেশের অর্থব্যয় প্রথম হওয়া উচিত। শিশুদের বাড়তে সময় লাগে; সে-সময়ের ভেতর পৃথিবীর ঘটনাপুঞ্জের কতই পরিবর্তন হয়ে যায়। ১৯৩৭-এ ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। তার ফলে এবং গ্রাম্য অঞ্চলে ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার দরুন জনসাধারণের ভেতর শিক্ষার একটা উদ্দীপ্ত উৎসাহ জাগে। তখন বয়স্ক-শিক্ষার আন্দোলনের ফলে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশ কিছু বাড়ে। কিন্তু পাঁচ বছরের ওপরকার লোকদের ধরলে ১৯৪১-এ শিক্ষার হার ছিল শতকরা ১৪·৬। ১৯৫১-তে সে-সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল শতকরা ১৮·৩। অবশ্য, একটা প্রচণ্ড বাধার বিষয় ধরতে হবে এর মধ্যে। ১৯৩৭-এর সেই প্রবল উদ্দীপনা দ্বিতীয় মহাসমরের কাছে ধাক্কা খেলে। এই লড়াই-এর আঘাতটা সবচেয়ে বেশি বাজল ১৯৪১-এর পর। লড়াই-এর বছরগুলোয় শিক্ষার সুযোগ, বাড়া তো দূরের কথা, অনেক কমে গেল। বহু বিদ্যালয় তো বন্ধই হয়ে গেল; বয়স্ক-শিক্ষার প্রচেষ্টাও মাথায় উঠল। বয়স্ক-শিক্ষার কাজ আবার শুরু হল সেই ১৯৪৬-এ। তাও সে-সময়টা চলছিল ডামাডোলে; শেষ অবধি তো দেশটাই গেল ভাগ হয়ে। এর জন্যে নতুন-করে গড়ার কাজে বাধাবিঘ্ন ঘটেছিল বিস্তর। যাই হোক, এই কথাটা সত্য যে ১৯৪১-এর শিক্ষিতের সংখ্যার চেয়ে স্বরাজ-লাভের ঠিক আগের সময়টায় তার সংখ্যা কমে গিয়েছিল।

সুতরাং শতকরা ১৪·৬ থেকে যে ১৮·৩-এ বৃদ্ধি তাকে স্বরাজোত্তর যুগের কাজ বলে মনে করা যেতে পারে।

স্বরাজলাভের পর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা তো বাড়লই, শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশ বেড়ে গেল। আর শিক্ষার গুণগত দিকেরও যথেষ্ট উন্নতি হল। বয়স্ক-শিক্ষার কথা ধরা যাক। স্বরাজের আগে বয়স্ক-শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শুধু লিখতে-পড়তে শেখানো। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল যে শুধু এই দিয়ে বয়স্কদের মনকে বেশি-কাল রাখা যায় না, তাদের মনের আর আঠা থাকে না। এই অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনসাধন করতে হল। তাতে বয়স্ক লোকদের আপন-আপন কাজের সুবিধাকর বিষয়ের অবতারণা করা হল।

ভারত সরকারের নব-পরিকল্পিত বয়স্ক-শিক্ষা-ব্যবস্থায় দু'টি দিকে দৃষ্টি রাখা হল। যাতে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হয়, আবার, বয়স্কদের বিচিত্র রুচিপ্রকৃতিরও চাহিদা মেটে তার ব্যবস্থা করা হল বয়স্ক-শিক্ষাকে সম্ভবমতো সফল করে তোলার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষার একটি পাঁচদফা প্রোগ্রাম তৈরি করা হল। এতে জোর দেয়া হল (ক) সাক্ষরতা, (খ) স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান, (গ) অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতিবিধায়ক শিক্ষা, (ঘ) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা এবং (ঙ) আমোদমূলক শিক্ষা।

আগেকার বয়স্কশিক্ষার কার্যসূচীর সঙ্গে এর পার্থক্য দেখাবার জন্যে এবং বয়স্কদের শিক্ষাবিষয়ে যে সমাজবোধ থাকা একান্ত দরকার সেই কথাটা বোঝাবার উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টার নাম দেয়া হল সামাজিক শিক্ষা।

১৯৩৭—৩৯-র বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে বয়স্কদের রুচিমর্জি ও প্রয়োজন-অনুযায়ী রচিত সাহিত্য-গ্রন্থ না থাকলে তাদের শিক্ষার ঝোঁক ঝিমিয়ে পড়ে। তাই ১৯৫০-এর প্রথম দিকে ঠিক হল যে সাধারণ মানুষের নতুন শিক্ষার স্বাদ-পাওয়া

মনকে টানতে পারে, নিবিষ্ট রাখতে পারে এমন কতকগুলো পুস্তিকা নানা বিষয়ে রচনা করিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তা করাও হল। হিন্দিতে ১৬০ খানা বই বার করা হল, আর, যে-কোন ভারতীয় ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ করার ঢালাও অনুমতি দিয়ে দেয়া হল। এ ছাড়া, সম্প্রতি আর-একটা পন্থা নেয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে নিও-লিটারেট অর্থাৎ নবসাক্ষর বয়স্কদের জন্যে লেখা যে-কোন ভারতীয় ভাষার বই যদি অনুমোদিত হয় তাহলে তার প্রকাশকের যাতে ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। উপরন্তু, এই-সব প্রকাশিত বই-এর মধ্যে থেকে বাছাই করে কতকগুলিকে পুরস্কার দেয়া হবে ফি-বছর। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ভাষায় পাঁচটি খণ্ডে 'সাইক্লোপিডিআ' বা বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রকাশ করার সংকল্প করেছে: এর প্রথম খণ্ডটি তো তৈরি হয়েই গেছে। নবসাক্ষরদের জন্যে গ্রন্থ রচনা-প্রকাশনার বিশেষ শিক্ষা দেবার মানসে কতকগুলো সাহিত্য-কারখানা খোলা হয়েছে। এই ধরনের গ্রন্থ-প্রকাশনে কতকগুলি রাজ্য সরকার তো এমনই উৎসাহ দেখিয়েছে যা সত্যিই খুব প্রশংসনীয়।

ভারতের এই শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা যে শুধু তার নিজের সমস্যার সীমায় সীমিত তা নয়। অনুন্নত, অনগ্রসর দেশগুলিতে জীবন-মান-উন্নয়নে শিক্ষার দান সম্বন্ধে সজাগ ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি সংসদের গ্রাম্য বয়স্কশিক্ষা-বিষয়ে আলোচনার এক অধিবেশন বসিয়েছিল ভারতে। মৌল শিক্ষা-বিষয়ের কর্মীদের শিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ-সুবিধাও করে দিয়েছে। সামাজিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে দর্শন-শ্রবণের সাহায্যে শিক্ষা নেবার উপায়গুলির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। এইজন্যে কর্মী তৈরি করতে হবে বলে মাঝে-মাঝে শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪-র মধ্যে ১ কোটিরও বেশি নিরক্ষর বয়স্ক

লোককে সাক্ষর করা হয়েছে। এ থেকেই সামাজিক শিক্ষার উন্নতির কিছু হিসেব পাওয়া যাবে। একথাও আশা এবং আনন্দের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নারীরাও এ-বিষয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে সাড়া দিয়েছেন। নব-শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাও বলবার মতো।

৩

প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার এবং বয়স্কশিক্ষার বিস্তার যে খুবই প্রয়োজনীয় সেকথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার নয় যে মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ সংস্কার এবং প্রসার না হলে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার এবং বয়স্ক-শিক্ষার বিস্তার সম্ভব নয়। এই দুই ধারার শিক্ষার জন্যে যে-শিক্ষক দরকার তা তো আসবে ঐ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে। তাছাড়া, যে-সব ছাত্র উচ্চশিক্ষা নেবে তাদেরও তো ভিত-পত্তন হয় সেখানে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার একটা বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের শিক্ষা-কাঠামোর সবচেয়ে কমজোর অঙ্গ হচ্ছে এই মাধ্যমিক শিক্ষার অংশটি। সংখ্যার দিক থেকে, ১১ থেকে ১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের শতকরা দশ জন এই শিক্ষার সুযোগ পায়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বর্ধিষ্ণু গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এ-সংখ্যা নিতান্তই কম। আরও দুঃখের বিষয় এই যে শতকরা এই দশ জনও বুদ্ধিবৃত্তির যোগ্যতার মাপে বাছাই করা হয় না, হয় পরিবারের অর্থসামর্থ্যের মাপে; অর্থাৎ, যাঁরা ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে দিতে পারেন তাঁদের ছেলেমেয়েরাই পড়তে পারে, যাঁদের সে-সামর্থ্য নেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়বার সুযোগ বড়ো-একটা মেলে না, তা যতই বুদ্ধির ধার থাক তাদের। গুণবিচারেও যে এই মাধ্যমিক শিক্ষার তেমন-কোন বিশিষ্ট মূল্য আছে তা নয়। কোন-একটা নির্দিষ্ট মানের শিক্ষার যে মোটামুটি শেষ হয় এই স্তরে তা-ও নয়।

এই পর্বটা যেন উচ্চশিক্ষা-পর্বের ভূমিকা; যারাই এ শিক্ষা নেয় তাদের প্রায় সকলেই অনন্যোপায় হয়েই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মহাসাগরে তরী ভাসায়। তাছাড়া, এ-শিক্ষা হচ্ছে পুঁথি-ঘেষা এবং বৈচিত্র্যহীন; বিভিন্ন প্রকৃতির কিশোর-তরুণদের বিচিত্র প্রবণতাকে পোষণা দেবার ক্ষমতা নেই এর।

অতএব, কি সংখ্যা, কি মান—উভয় দিকেই মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার দরকার একান্ত। একদিকে, বহুসংখ্যক কিশোর-তরুণদের সামনে বহুতর সুযোগের পথ দিতে হবে খুলে, অপরদিকে, বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর, দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলের নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্যে দরকার নতুন ধরনের বৃত্তিশিক্ষা-নিকেতনের।

১৯৪৭-এর পর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার যে সংখ্যাগত বিস্তার ঘটেছে তাকে অভাবনীয় বললে বোধ করি বাড়িয়ে বলা হয় না। ১৯৪৮-এ ক-রাজ্যগুলিতে মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় নিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের সংখ্যা ছিল ১২,৫০০-রও কিছু বেশি। তার পাঁচ বছর পরে, ১৯৫৩-তে সে-সংখ্যা দাঁড়াল ১০,৫০০। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর কথা একসঙ্গে মনে করলে এ-বিষয়ের অগ্রগতি আরও চোখে পড়বে। ১৯৪৮-এ এইরকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪,০০০-এরও কম; ১৯৫৪-তে তার সংখ্যা বেড়ে হল ১০,০০০।

ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছিল অমনি অবাক হবার মতো। ১৯৪৮-এ ক-রাজ্যগুলিতে মধ্যবিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ১০ লক্ষেরও কিছু বেশি ছিল। ১৯৫৩-তে তার সংখ্যা হল দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ১৯৪৮ সালের ১০ লক্ষ ৮০ হাজারের জায়গায় ১৯৫৩-তে হল ৩০ লক্ষ। ১৯৫৪-তে সবরকম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা হয়েছিল ৬০ লক্ষেরও বেশি। যে-সব ছাত্র মাধ্যমিক মানের পাঠ সমাধা করেছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩-র ভেতর তাদের সংখ্যা হয়েছিল দু'-গুণ।

মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে খরচের অঙ্কটাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮-এ ক-রাজ্যগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় সাক্ষাৎ খরচা হয়েছিল ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ১৯৫৩-তে তার পরিমাণ হল ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। সারা ভারতে ১৯৫৩-তে খরচ হয়েছিল ৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

এই সময়টায় মাধ্যমিক শিক্ষার মানও উন্নত করবার চেষ্টা যথেষ্ট হয়েছে। অনেক রাজ্য এ-বিষয়ে নির্দেশ-পরামর্শ দেবার জন্যে নিজের-নিজের কমিটিও নিযুক্ত করেছে। কিন্তু, দেখা গেল যে এ-রকম টুক্‌রো-টুক্‌রো করে কাজ করলে এতে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না ; একটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা ও সংস্কার হওয়া চাই। তাই ১৯৫২-তে ডক্টর্ লক্ষণস্বামী মুদালি-অরকে প্রধান করে এক কমিশন বসানো হল। ১৯৫৩-তে এই কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল।

কমিশনের মাত্র কয়েকটি নির্দেশের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার জন্যে কমিশনের পরামর্শ হল সে-শিক্ষার কাল একবছর বাড়িয়ে দেয়া হোক। যাতে করে ছাত্ররা এই শিক্ষা পেয়ে কাজকর্মে ঢুকে যেতে পারে তাই এ-নির্দেশ। কমিশনের আর একটি নির্দেশ হল সিলেবাস অর্থাৎ পাঠক্রম বদ্‌লানোর। ছাত্রদের ওপর চাপ না পড়ে অথচ পাঠ্য বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকে তার জন্যে এই নির্দেশ। কতকগুলো মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যতখানি বৈচিত্র্য আনা যায় তার নির্দেশ দেয়া হল। কমিশনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশ হল বহুশিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার। পরীক্ষা প্রথারও সংস্কার করার নির্দেশ হল।

কোন-কোন রাজ্য কমিশনের নির্দেশিত কতকগুলো কাজ বুদ্ধি করে আগে হতেই গত সাত বছরের ভেতর করেছে। বাকিগুলোও এখন করা হচ্ছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌরনীতি, সংগীত,

হাতের কাজ, কৃষি প্রভৃতি বিষয় 'কারিকুল্যম্' অর্থাৎ বিষয়-তালিকায় ঢুকিয়ে কিছু সংস্কারসাধন করা হয়েছে। কৃষি, কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্যে আলাদা করে কতকগুলো নতুন শিক্ষানিকেতন খোলা হয়েছে। আর-একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন হচ্ছে নতুন এক-ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা। এ হচ্ছে 'পোস্ট্-বেসিক' বা উত্তর-বুনিয়াদি বিদ্যালয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান-উন্নয়নের চেষ্টার কথাও এই সঙ্গে বলা দরকার। শিক্ষকদের শিক্ষণ-লাভের সুযোগ অনেক বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়া, একটা নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে; তা হচ্ছে—কাজ করতে-করতে মাঝে মাঝে শিক্ষণ-গ্রহণের সুযোগ। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাস চারের মধ্যেই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-নিকেতন স্থাপন করার কৃতিত্ব জাতীয় সরকারের প্রাপ্য। এই নিকেতনের কাজ হল শিক্ষা-বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে নতুন আলো দেয়া। কেন্দ্রীয় শিক্ষানিকেতন শহর-এলাকার উপযোগী এক-ধরনের বুনিয়াদি-শিক্ষা প্রবর্তন করবার জন্যে সচেষ্ট। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বিদ্যালয়ের ব্যবহার্য আসবাব-পত্র ও শিক্ষা-সহায়ক বিবিধ যন্ত্রপাতি সস্তায় তৈরি করতে শেখানো। অল্প সাত বছরের ভেতর মাধ্যমিক শিক্ষায় ভারত যে-উন্নতি করেছে তা শুধু ভারতের নয় বিদেশের শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্যোৎসাহীদের-ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় দেশের প্রথম দরকার হল বর্তমান সুযোগ-সুবিধাগুলোর সুব্যবস্থা ও উন্নতি করা। সংখ্যাতেও অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে। ১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতে ইউনি-ভারসিটি ছিল ২১টি। দেশভাগের পর শুধু ভারত-রাষ্ট্রেই তা হল ৩১টি। ১৯৪৮-এ যে ছাত্রসংখ্যা ছিল দু'লক্ষ পঁচিশ হাজারেরও কম, তা ১৯৫৩-তে বেড়ে হল চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। ১৯৪৮-এ ভারতের

'ক'-রাজ্যগুলির গ্রাজুএটের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার, ১৯৫৩-তে হল ৫২ হাজার।

কারিগরি-শিক্ষার খরচ বাদে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চ-শিক্ষা বাবদ 'ক'-রাজ্যগুলিতে ১৯৫৩-তে খরচা হয়েছিল ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৮-এ তা ছিল ৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। সারা ভারতে ১৯৫৩-তে ব্যয়ের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ২১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মূল কথাটা হল শিক্ষার মান-উন্নয়ন। ১৯৪৭-এর আগেও এই শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় ও অব্যবহারিক কেতাবি-বিদ্যার সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা হচ্ছিল শিক্ষাবিদ্-মহলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে কেবল শহরমুখো, গ্রামীন ভারতের প্রতি যে তা উদাসীন—সে-কথাও সমালোচিত হচ্ছিল। ১৯৪৭-এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ব্যাপারটি আগাগোড়া নতুন করে খতিয়ে দেখার দরকার অনুভূত হল। তাই অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে সভাপতি করে ১৯৪৮-এ 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন' নিযুক্ত করা হল। ১৯৪৯-এ এই কমিশনের রিপোর্ট পেশ হল।

কমিশনের মত হল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু রাজনীতি আর প্রশাসন চালাবার মতো শিক্ষা দেবে তা নয়, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি নানা কাজকর্মের শিক্ষাও দেবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি ও নানা বৃত্তি-বিষয়েও উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞানের চাহিদা মেটাবে বিশ্ববিদ্যালয়। কমিশন উন্নত উদার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নি, তবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান, নির্মাণবিদ্যা, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে নানা বিভাগ খোলার ওপর জোর দিয়েছেন। কমিশনের মতে ভারতের মতো দেশে কৃষিশিক্ষার বিস্তার সবের আগে হওয়া দরকার। কৃষিকলেজগুলি যেন সম্ভবপক্ষে পল্লী-অঞ্চলেই খোলা হয়—এই হচ্ছে কমিশনের নির্দেশ। এর সুবিধা হবে এই যে, এতে ছাত্ররা পল্লী-অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত

হবে এবং গ্রাম্য জীবনধারায় নিজেরা অংশ নিতে পারবে। তাছাড়া, উচ্চশিক্ষা পল্লীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন—এই অনুযোগেরও খণ্ডন হবার উপায় হবে।

স্বরাজ পাওয়ার আগে ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। দেশের মুখ্য জ্ঞানীগুণীরা বলতেন, এতে করে বেশির ভাগ ছাত্রের ওপর অকারণ একটা বোঝা চাপানো হয়। ইংরেজী ভাষাকে ক্রমে সরিয়ে দিয়ে যে তার জায়গায় দেশীয় ভাষার ঠাঁই করে দেওয়া উচিত—এই ছিল তাঁদের মত। ১৯৪৭-এর পর থেকে ইংরেজী ভাষাকে সরিয়ে ফেলার দাবি প্রবলতর হল। এরই এক পরোক্ষ ফল হল বহু আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা : বলা যায় যে, ১৯৫২-র ভেতর ভারতের প্রধান-প্রধান ভাষার সব অঞ্চলেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। শিক্ষাবিদ্‌গণ এবং মোটামুটি সারা দেশই এ-বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন শিক্ষার প্রয়োজন অনুসারেই হওয়া উচিত, বাইরের কোন চাপে নয়। কমিশনের মতামত ও নির্দেশ শিক্ষাবিষয়ে জনসাধারণের মতামত সুনির্ধারিত হতে এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

কমিশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনিচয়ের মধ্যে একটি ছিল গ্রেট ব্রিটেনের 'বিশ্ববিদ্যালয় দান কমিটি'র আদর্শে একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় দান কমিশন' (ইউনিভারসিটি গ্রান্‌ট্‌স্‌ কমিশন) প্রতিজ্ঞা। এই নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রথমে একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় দান কমিটি' গঠিত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মান উন্নত করার এবং বিভিন্নপ্রকার শিক্ষার ভেতর সামঞ্জস্য স্থাপন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এ-দায়িত্ব পালন করতে হলে যে 'বিশ্ব-বিদ্যালয় দান কমিটি'কে শক্তিশালী করা দরকার—একথা সরকার বেশ বুঝতে পারল। তাই ঐ কমিটিকে আরও কাজ ও ক্ষমতা দিয়ে ওকে নতুন করে গড়ে নাম দেয়া হল

'বিশ্ববিদ্যালয় দান কমিশন'। এই কমিশন যাতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থসাহায্য করতে পারে তার জন্যে এর হাতে প্রচুর টাকা দেওয়া হল। আশা করা যায় যে, এই কমিশন, সাক্ষাৎ না হলেও, পরোক্ষ কিন্তু শুভময় প্রভাব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগ-পারস্পরিকতার ভাব জাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মান উন্নত করবে। স্বরাজ-লাভের পর থেকে যে-নীতিতে কাজ চলেছে তাতে গবেষণার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়েছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় দান কমিশনের' লক্ষ্য হবে এই উন্নতিকে পড়ে যেতে না দিয়ে প্রগতির পথে চালিত করা।

কমিশনের আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা-কাজে সুযোগ দেবার জন্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানেতর বিষয়ে নানা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নততর গবেষণার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়ানো হয়েছে, আবার অনেকগুলি জাতীয় ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষণাগারও খোলা হয়েছে। ল্যাবরেটরিগুলি স্বাধীন ভারতের মহৎ সম্ভাবনাময় প্রশংসনীয় কীর্তি। এগুলিকে ঠিক শিক্ষানিকেতন বলা চলে না বটে, তবে, উচ্চতর গবেষণা-পরীক্ষণার এই কেন্দ্রগুলি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মান তুলে ধরতে যথেষ্ট কাজে লাগবে।

৫

বিগত দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর দোষত্রুটি ধরা পড়ল। অবশ্য, লড়াই-এর টানে শিল্প ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের কিছু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু, এ-উন্নতির মূলে এমন কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না যাতে জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপায় হতে পারে; এ হয়েছিল নিতান্তই তখনকার সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে।

যুদ্ধ-বিরতির পর দেশকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করার কাজ হাতে নেয়া হল, কিন্তু দেখা গেল দেশের ইঞ্জিনিআরিং ও

টেক্‌নিকাল্‌ শিক্ষার কাঠামো আগাগোড়া বদ্‌লে না ফেললে ও-কাজ ভালোভাবে করা সম্ভব নয়। তাই 'নিখিল ভারত কারিগরি-শিক্ষা-সংসদ' গঠন করা হল। এই সংসদের কাজ হল কারিগরি-শিক্ষার মান উন্নত করার এবং সর্বস্তরে কারিগরি-শিক্ষা-বিস্তারের উপায় নির্ধারণ করা।

স্বরাজ-লাভের পর এ-কাজের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হল। যত দিন যায় ততই বোঝা যেতে লাগল যে, সবরকম বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করে বিজ্ঞান ও কারিগরি-শিক্ষায় দক্ষ কর্মীদের ওপর। কি পরিমাণ, কি মান—দুই দিক থেকেই ইঞ্জিনিআরিং ও টেক্‌নিকাল্‌ শিক্ষার সুযোগ দেশে যা ছিল তাতে প্রয়োজন সিদ্ধ হত না। ১৯৪৭-৪৮-এ ভারতে ইঞ্জিনিআরিং গ্র্যাজুএট্‌ হয়েছিল ৯০০, আর কারিগরি-শিক্ষায় গ্র্যাজুএট্‌ হয়েছিল ৩০০। উচ্চতম মানের ইঞ্জিনিআরিং শিক্ষার ও তার গবেষণা-পরীক্ষণার সুযোগ ছিল যৎসামান্য, আর টেক্‌নোলজি বা নির্মাণবিদ্যার তো প্রায় ছিলই না। তাহলে, নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, এই টেক্‌নিকাল্‌ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতকে খুব অল্প সময়ের ভেতর সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যেতে হয়েছে।

এখানে দরকারটাও ছিল যেমন বেশি উন্নতিটাও হয়েছে তেমনি বলবার মতো। ইঞ্জিনিআরিং এবং টেক্‌নোলজি—দুইএতেই গ্র্যাজুএটের সংখ্যা হল তিনগুণ। সারা দেশের এই জাতীয় শিক্ষা-নিকেতনগুলি থেকে বাছাই-করা কতকগুলিকে মোটা-মোটা টাকা দেয়া হল ঘরবাড়ি, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ভালো করার জন্যে। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোরও ব্যবস্থা করা হল। গরিব মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যকল্পে বাড়িয়ে দেয়া হল বৃত্তির সংখ্যাও। এর আগে টেক্‌নিকাল্‌ শিক্ষার অন্যতম ত্রুটি ছিল ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগের অভাব। শিল্পবাণিজ্যের কর্তৃপক্ষদের সহযোগিতায় এই অভাব মোচন করার জন্যে শিল্পশিক্ষণ-বৃত্তির পরিকল্পনা করা হল।

ভারতের কারিগরি-শিক্ষার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে ১৯৫১-তে খড়গপুরে 'ভারতীয় কারিগরি-বিজ্ঞানভবন'-এর (ইন্‌ডিআন ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ অব্‌ টেক্‌নোলজি) প্রতিষ্ঠা। প্রধানত উচ্চস্তরেব কারিগরি-শিক্ষা এবং গবেষণাই এর লক্ষ্য, তবু উচ্চতম স্তরের করিগরি-শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ এতে থাকবে। শুধু তাই নয়, পরিণামে ইঞ্জিনিআরিং এবং টেক্‌নোলজির সব দরকারী বিষয়ের শিক্ষা ও গবেষণার সুবিধা থাকবে এতে। রাসায়নিক তাপসৃষ্টি, উৎপাদন-কৌশল, নৌ-নির্মাণশিল্প, যন্ত্রব্যবহার, এবং শিল্পবিষয়ক নির্মাণ-বিদ্যা প্রভৃতি যে-সব বিষয়ের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এখানে সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাঙালোরের বিজ্ঞানমন্দিরে আগেই যে-সব বিষয়-বিভাগ ছিল সেগুলিকে তো উন্নত করা হয়েছেই, আবার নতুন নতুন বিষয়-বিভাগও খোলা হয়েছে। ১৯৪৭-এর আগেও এই বিজ্ঞান-মন্দির বিশুদ্ধ এবং মৌল বিজ্ঞান-বিষয়সমূহের গবেষণার প্রখ্যাত কেন্দ্ররূপে প্রথিত হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের নির্মাণবিদ্যা-বিভাগের বিকাশ-পরিকল্পনা রচিত ও প্রায় সমাপ্ত হবার সময় থেকে এটি উচ্চতম মানের নির্মাণবিদ্যার শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

এ-বিষয়ে অগ্রগতির পরিচয়ের জন্যে কিছু হিসেব দেয়া যেতে পারে। ১৯৪৭এ নিম্নমানের কারিগরি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ লাখ; ১৯৫৩-তে তো হল ১১ লাখেরও কিছু বেশি। আর ২ কোটি ২৫ লাখ টাকার জায়গায় হল ৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়। উচ্চমানের বিদ্যালয়গুলিতেও ব্যয় এমনি মোটা রকমের হয়েছিল। এগুলিতে ১৯৪৭-এর ছাত্রসংখ্যা ৪৬ হাজারেরও কিছু কম থেকে ১৯৫৩-তে হয়েছিল ১ লাখ ১৫ হাজার। ১৯৪৭-এ যেখানে খরচ হয়েছিল ২ কোটি টাকা ১৯৫৩-তে সেখানে ৬ কোটি টাকা।

৬

ভারত রিপাব্লিক্-এর শিক্ষা-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার এই হল একটা মোটামুটি পরিচয়। কিন্তু, এ-পরিচয় অপূর্ণ থাকবে যদি ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের কথা কিছু না বলা হয়। কেবল ভারতেই নয়, বর্তমান পৃথিবীতে সর্বত্রই শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির ওপর ঝোঁকটা থাকে বেশি, কল্পনা-অনুভূতির দিকটি হয় অবহেলিত। মানুষের সত্তার দুটো প্রধান ভাগ আছেঃ একটা হৃদয় অর্থাৎ অনুভব-কল্পনার, অপরটা মস্তিষ্ক অর্থাৎ চিন্তা-বিচারের। এই দুটোর সমঞ্জস চর্চা ও সাধনাতেই মানব-সত্তার পূর্ণবিকাশের সম্ভাবনা, অন্তত তাতেই জীবনেব দাঁড়িপাল্লা সমান থাকে। শুধুমাত্র একটা দিকের কৃষ্টিতে আর অপব দিকটার উপেক্ষায় জীবন হয় একঝোঁকা, অসংগত, অস্বচ্ছন্দ; কাজেকাজেই হয় বিকৃত, বিকট। তাতেই ইওরোপ এবং আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তানায়কগণ জীবনকে এই বিপর্যস্তি থেকে বাঁচাবাব জন্যে শিক্ষার কারিক্যুলম্ নতুন করে ঢেলে সাজছেন।

সুখের বিষয়, ভারতের সংস্কৃতির ধারায় অনুভূতি, ইচ্ছা ও বুদ্ধির সমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা থাকায় তাকে তেমন বিকৃতি-সমস্যায় পড়তে হয় নি। তার নানা ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলার অবকাশ ও সুযোগ আছে। মহাকাব্যের আখ্যানগুলি যুগযুগ ধরে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে শীল-পরিশীলনের এবং সৎ ও সুন্দর জীবন-যাপনের। ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় এবং কথকতায় মানুষের বুদ্ধি স্পর্ধিত ও উদ্ধত না হয়ে শমিত-যমিত হয়েছে। লোক-সংগীত, লোক-নাট্য এবং লোক-শিল্পকলার বিচিত্র রূপের মাধ্যমে রীতিপ্রথা, লোকজ্ঞান, প্রবচন, কাহিনী, পুরাণ, শাস্ত্র প্রভৃতির মতো প্রাচীন ভারতীয় জীবন-সাধনার কত জিনিস পুরুষানুক্রমে এসেছে বাহিত হয়ে। এই বিচিত্র, সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিরক্ষর ভারত-বাসীদের ভেতরেও ওতপ্রোত অনুস্যূত হয়ে আছে। তারই নিদর্শন

মেলে পাঁড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলপনা, সীবন-বয়ন ও সাজসজ্জার নানা শিল্প-কাজে; মেলে তথাকথিত-শিক্ষা-না-পাওয়া কত নর-নারীর নাচে, গানে, অভিনয়ে, তাদের ছড়া-কাটায়, রূপকথা বলায়,—জীবন-প্রকাশের এমনি নানান প্রকারে।

প্রাচীন ভারতের এই ধারা বজায় রাখবার জন্যে ভারত সরকার রাষ্ট্রপতির নামে কতকগুলি পারিতোষিক, পুরস্কার, এবং হয় অর্থ-সাহায, না হয় স্বীকৃতি-পত্র দেবার ব্যবস্থা করেছে প্রতিভাশালী সংগীত-সাধক, এবং অন্যান্য শিল্পী ও কলাকারকে। নানা দর্শনীয় কলা-শিল্পের প্রদর্শনী, নর্তকদলের নৃত্যানুষ্ঠান এমনি কত বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে দেশে; শুধু তা-ই নয়, বিদেশেও। পক্ষান্তরে দেশ-বিদেশের শিল্পী ও রূপকারদেব আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, ভারতে অনুষ্ঠান করা হয়েছে নানা ললিত-কলার প্রদর্শনীর।

সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়-কলা-চর্চার উৎসাহ ও লালন দিয়ে দেশের সংস্কৃতিকে ঋদ্ধি দেবার জন্যে ভারত সরকার কতকগুলি জাতীয় আকাদেমি স্থাপন করেছে। নৃত্য, গীত ও নাটকের প্রাচীন সম্পদ এবং ধারা-রক্ষা, আর তার সমৃদ্ধির জন্যে ১৯৫৩ সালে ‘সংগীত নাটক আকাদেমি’ স্থাপিত হল। ১৯৫৪-তে সাহিত্যের জন্যে হল ‘সাহিত্য আকাদেমি’র প্রতিষ্ঠা। ঐ বছরেই উদ্‌ঘাটন হল ‘ললিতকলা আকাদেমি’র। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি চারুকলা এবং অন্যান্য কারুকলা-চর্চা ও গবেষণা-কাজে উৎসাহ আর সহায়তা করাই হচ্ছে এই আকাদেমির লক্ষ্য।

আলোচ্য সাত বছরের ভেতর একটি উল্লেখ্য কাজ হচ্ছে ভারত সরকারের প্রবর্তনায় ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস’ * গ্রন্থের প্রকাশন। অনেক দিক থেকেই কাজটি অনন্য। এই পুস্তকে মানুষের মানসিক সত্তার অভিব্যক্তি-লব্ধ সর্বজনীন সম্পদ-বৈভবের বিষয় নিয়ে দিগ্‌দর্শনী আলোচনা করার পর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

* লণ্ডনের ‘জর্জ এলেন্‌ ও আন্‌উইন্‌’—প্রকাশিত

দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন এই কাজের উদ্যোক্তা। তাঁর এ-প্রচেষ্টার কারণ সম্বন্ধে তিনি যা বলতেন তা এই যে, ইওরোপীয়দের লেখা এইজাতীয় গ্রন্থে যেমন ভারতের সাংস্কৃতিক অবদান-সম্বন্ধে নামমাত্র উল্লেখ থাকে, ভারতীয়দের লেখা বইগুলিতেও তেমনি শুধু ভারতীয় দর্শনের আলোচনাই থাকে। ফল হয় এই যে, সারা দুনিয়ার মানবজাতির চিত্তবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশের বিচিত্র ও সমগ্র রূপটা মানুষ দেখতে পায় না: মানুষের সংস্কৃতি-সাধনার ভাণ্ডারে কোন্ দেশের অবদান যে কী তা জানা যায় না। দর্শন-জগতে ভারতের স্থান যে কোথায় তার নিরূপণ হওয়া দরকার। এ-দরকার শুধু জ্ঞানের জন্যই নয়, আধুনিক পৃথিবীর পটভূমিকায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থকতা ঠিকমতো বোঝবার জন্যেও বটে। ১৯৫২-তে বইটি বেরিয়েছে এবং পাঠক-সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে।

স্বাধীনতার সাত বছরে যে-সব নানা বৃত্তি এবং দেশ-বিদেশের ছাত্রদের গাবেষণিক কাজে অর্থসাহায্য করা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে ভারতীয়দের অন্যান্য দেশকে জানবার এবং অন্যদেশীয় লোকদের ভারতকে জানাবার আগ্রহ কী-পরিমাণ বেড়েছে। সাংস্কৃতিক বৃত্তিদানের পরিকল্পনা অনুসারে ভারত সরকার ফি-বছর ৩৪টি ভিনদেশের মানুষদের একশ-টি বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে। আর-একটি পরিকল্পনা হচ্ছে পারস্পরিক বৃত্তিদান-ব্যবস্থা; অর্থাৎ, যে-সব দেশ ভারতীয়দেয় বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে ভারতও তাদের পাল্টা বৃত্তি দিচ্ছে। আরবি, চীনা, ফরাসী, জার্মান, ইটালিআন্, জাপানী, ফার্সী, রাশিআন্, স্পেনিশ্ এবং টার্কিশ্ ভাষা-শিক্ষায় উৎসাহিত করবার জন্যে বৃত্তি দেবার একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৫০-এ 'সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-সংসদ' (ইন্ডিআন্ কাউন্সিল্ অব্ কাল্চারাল্ রিলেশন্স্) নামে এক স্বয়ং-শাসিত সংস্থা গঠন

করা হয়। উদ্দেশ্য হল অন্যান্য দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার জ্ঞান প্রসারিত এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আবার উজ্জীবিত ও সংহত করা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি-সংস্থার সদস্য হয়ে ভারত ১৯৪৯-এ একটি অস্থায়ী এবং ১৯৫২তে স্থায়ী কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলি সম্মেলন হয়। ১৯৪৯-এ গ্রাম্য বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভা বসে। সারা এশিআর নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের হিসেব করার এবং প্রোগ্রাম করার চেষ্টা এই প্রথম। ১৯৫১-তে 'মানুষের স্বরূপ-পরিচয় এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিক্ষা-দর্শন'-বিষয়ে আলোচনার জন্যে একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসে। জাতিসমূহের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মন-কষাকষির ব্যাপারে শান্তিস্থাপনে গান্ধীয় নীতির প্রয়োগ-বিষয়ে আলোচনার জন্যে ১৯৫৩-তে একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়। ১৯৫৪-র জানুআরিতে 'স্থায়ী ভারতীয় জাতীয় কমিশন'-এর প্রথম সম্মেলনে এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হয়। তাতে আণবিক শক্তির সদ্ব্যবহার, আন্তর্জাতিক অ-বনিবনার সমাধানে গান্ধীয় ভাবধারা, এশিআন্ ও আফ্রিকান সংস্কৃতি-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাবধারা ও ব্যবস্থার সহ-স্থিতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়।

৭

এই ভাবে স্বাধীনতার সাতটি বছর কেটেছে শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষাপ্রচেষ্টায়। স্বাধীনতা পাওয়ায় জাতির সামনে দেখা দিল নতুন লক্ষ্য, মাথায় চাপল নতুন দায়িত্ব। যে-বিবরণ দেয়া হল তা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাবে যে, প্রাক্-স্বরাজ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বহু গলদ দূর করে নবজাগ্রত ভারতের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

এই ক'বছরে শিক্ষা বাবদ যা খরচা হয়েছে তা থেকেই কী করা হয়েছে আর কী করতে হবে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। ১৯৪৬-৪৭-এ শিক্ষায় সরকারের মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। কেন্দ্রীয় বাজেট ছিল ২ কোটি টাকার কিছু কম। ১৯৫১-৫২, ১৯৫২-৫৩, ১৯৫৩-৫৪— এই তিন বছরের বাজেটে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষা বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ, ৮২ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ৯৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। শিক্ষায় সরকারী বে-সরকারী খরচ মিলিয়ে টাকার অঙ্কও বেশ বেড়েছে। ১৯৪৬-৪৭-এ তা হয়েছিল ৪৫ কোটি ১০ লাখ টাকা। ১৯৫২-৫৩-তে তা আরও বেড়ে হল ১৩৫ কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪-তে খরচ হয়েছিল ১৫০ কোটি টাকা। এ থেকে বোঝা যাবে যে, শিক্ষা-খাতে সরকারী খরচ বেড়েছে চারগুণেরও বেশি, কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকে খরচটা এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি।

সে যাই হোক, এসত্ত্বেও অতিসন্তোষের কোন কারণ নেই। এ-বিষয়ে যা করা হয়েছে প্রত্যাশার তুলনায় তা বেশ কম, আর বোধ হয় ভারতবাসীদের সামর্থ্যের মাপেও অল্প। অন্যান্য দেশের অনুরূপ সময় ও অবস্থায় এইজাতীয় তুলনায় ভারতের কাজের এই পরিমাণে লজ্জিত হবার কিছু নেই। তবে একথাও ভুললে চলবে না যে, ভারতের ঐতিহ্য ও প্রত্যাশার উপযুক্ত যথার্থ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে শিক্ষার খরচা বাড়িয়ে প্রায় তিনগুণ করতে হবে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুনিয়াদি শিক্ষার তত্ত্ব ও ব্যবহারের দিক

জাতীয় আদর্শ-ব্যবস্থার প্রতিফলন হয় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়। সাহস করে একথাও বলা যায় যে, দেশের ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন-লক্ষ্যকে রূপ দেয় শিক্ষা, আবার জীবন-লক্ষ্যও গড়ে তোলে শিক্ষা-ব্যবস্থা। এ-কথা যে শুধু মানুষের বেলাতেই খাটে তা নয়, আমরা যাদের নিচু থাকের জীব বলি তাদের বেলাতেও। তির্যক্ প্রাণীদের শাবকেরাও বড়োদের আচার আচরণ অনুকরণ করে ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার জন্যে তৈরী হয়। মানব-শিশুর মানস-গঠনেও অনেকখানি কাজ করে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি; তবে তার অনুকরণ-প্রবৃত্তিতে থাকে সচেতন ইচ্ছাও, শুধুই সহজ আবেগ নয়। এইভাবে শিক্ষা নিয়েই মানুষ বয়স্ক জীবনের দায়-দায়িত্ব-পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়। এখানেই মানব-শিশুর সঙ্গে তির্যক্ জীবদের পার্থক্য; মানুষের সজ্ঞান, সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে পশু-পাখীদের আবেগ ও প্রবৃত্তি-প্রধান শিক্ষাব্যবস্থার তফাৎ।

কোন জীবগোষ্ঠীর ব্যষ্টিবিশেষের টিকে-থাকার জন্যে দরকার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবেরও পরিবর্তন। জীবজগতে এ-ঘটনার বহু নজির আছে যে, যেখানেই কোন জীবগোষ্ঠী পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি সেখান থেকেই তাদের অবলুপ্তির পথ শুরু হয়ে গেছে। পরিবেশ-তৎপরতার অবিরাম প্রয়াসই হচ্ছে বিবর্তনের কথা। মানব-জগতে অবস্থাটা এমন-একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানুষ আর শুধু পরিবেশ-সচেতন হয়েই তুষ্ট থাকতে পারে না; সে এখন চায় পরিবেশকেই নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির কাজে লাগাতে। সজ্ঞান উদ্দেশ্য-বোধের দ্বারা প্রণোদিত তার চির-প্রসারণশীল কর্মক্ষেত্র।

তাই সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে দরকার হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের; আর, তা আসে নিশ্চিত ভাবেই।

অন্য-সব সমাজ-সংস্কারকের মতো মহাত্মা গান্ধীও বুঝেছিলেন শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার না হলে সমাজ-সংস্কারের আশা নেই! কোন সমাজ কী দরের তা বোঝা যায় সেই সমাজের মানুষের গুণাগুণ থেকে। উন্নত ধরনের সমাজ গড়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমাজস্থ ব্যক্তিদের উন্নত করা। এ-কথা এখন বহুবিদিত যে, মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে শৈশব ও কৈশোর। এই সময়টাই খুব নমনীয়, তাই গড়বার ও গড়ে-ওঠবার পক্ষে বিশেষ সুবিধার। গান্ধীজী একথা ভালভাবেই জানতেন। তাই, মানুষের এক সহযোগী, সমবায়ী সমাজ গড়ে-তোলার জন্যে তিনি বুনিয়াদি-শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা করলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর কথা হচ্ছে এই: 'এর মূল লক্ষ্য হল হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুদের দেহ, মন, আত্মার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দেয়া। হাতের কাজের নানা পদ্ধতি-প্রণালী শিক্ষা দিতে-দিতে শিশু-কিশোরদের অস্ফুট শক্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর, তার সঙ্গে-সঙ্গেই শেখাতে হবে ইতিহাস, ভূগোল আর আঁক।'

মানুষ আসলে সামাজিক জীব; সমাজে তাকে বাস করতেই হবে। বুনিয়াদি-শিক্ষায় শিশুকে সহযোগী গোষ্ঠীর একজন বলে মনে করা হয়। এতে বিদ্যালয়কে দেখা হয় সমাজের একটি সংহতরূপে। তার প্রতিটি শ্রেণী হচ্ছে এক-একটি ছোট্ট সমাজ। বিদ্যালয়কে সমাজ-সংস্থা-রূপে গড়লে কী সুবিধা হয়?—এতে নাগরিকতা-শিক্ষার বেশ অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টি হয়। শিশু-কিশোরেরা একই সূত্রে বাঁধা মানুষ বলে মনে করতে শেখে নিজেদের। এতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সহযোগিতা ও কর্তব্য-বোধ গড়ে ওঠে তাদের ভেতর। অপরের কাছে শুধু অধিকার দাবি করলেই তো হয় না, নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব-বিষয়েও সচেতন হতে হয় মানুষকে। আধুনিক যুগের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তি-

স্বাধীনতা। এর নামে মানুষ অনেক সময় পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য-দায়িত্বের কথা ভুলতে বসে। বুনিয়াদি-শিক্ষা এই দোষ সংশোধন করার সংকল্প রাখে। অধিকার-চেতনা যখন উগ্র হয়ে ওঠে তখন মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকৃতি ঘটে। এর ফলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরোধ বিকট হয়ে দেখা দেয়, সমাজে ভাঙন ধরে।

গান্ধীজী মনের গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন এ-কালের এই বৈলক্ষণ্যের বিষয়। তাই স্থির করেছিলেন যে, এমন শিক্ষা দেওয়া চাই যাতে মানুষের জীবন-বোধের এই বৈষম্য শুধ্‌রে গিয়ে সে সুস্থমনা সামাজিক জীব হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। শিশু যে সহযোগী গোষ্ঠীর একজন, তার সব কাজেরই যে এক সামাজিক মূল্য আছে— এই তত্ত্বের স্বীকৃতি হচ্ছে বুনিয়াদি-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য নীতি। শিশুদের মন যাতে এই ভাবে ভাবিত হয়ে গড়ে ওঠে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় এতে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়েব সব কাজকর্মই দল বেঁধে করা হয়; আর সেইরকম কাজই করা হয় যার সামাজিক প্রয়োজন ও ব্যবহারিক মূল্য আছে। যাতে শিশুদের ভেতর এক দায়িত্ব ও সহযোগের ভাব সঞ্চারিত হয় শুরু থেকে তা-ই এর লক্ষ্য।

সব শিক্ষা-মনস্তত্ত্ববিদ্‌ই এ-বিষয়ে একমত যে, শিশুরা শিক্ষকদের মুখ থেকে শুনে যা শেখে সাক্ষাৎ কাজকর্ম করে তার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি শেখে। আসলে শিশুরা কাজকর্ম করতেই ভালবাসে। কর্মতৎপরতা তাদের স্বভাব। তাদের যে চঞ্চলতা তা আর-কিছু নয়, প্রচুর শক্তিরই প্রকাশ। কিন্তু, গতানুগতিক-রীতিতে-চলা বিদ্যালয়গুলোতে কী দেখা যায়?—ঠিক এর উল্‌টোটা। বহুক্ষণ ধরে তাদের আট্‌কে রাখা হয় একটা জায়গায়; মুখ বুঁজে থাকতে বলা হয়। কিন্তু এ তাদের মনের ওপর জবরদস্তি ছাড়া কিছু নয়, তাদের স্বচ্ছন্দ স্বভাবকে দাবিয়ে দিয়ে বড়োদের ইচ্ছা-অভিরুচির বিকট কালোছায়া ফেলা। যে-সময়টায় তারা রূপকথা-উপকথা

শুনতে মশগুল হয় সেই সময়টা ছাড়া তারা নিজেরা কথা কইতে, কি, কাজ করতে ভালোবাসে।

বাস্তবিক, এ-তত্ত্ব যে নতুন-কোন আবিষ্কার তা নয়। মানুষ-সৃষ্টির সেই আদিম যুগ থেকেই শিশুদের শিক্ষার অঙ্গ হচ্ছে কাজকর্ম। শিশু-শিক্ষায় কর্মের তত্ত্ব সম্পর্কে তখন কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নি বটে, কিন্তু, কর্মটা ছিলই। প্রথম সন্তানের মা-ও বুঝতে পারে যে, সন্তানকে ব'গে রাখতে হলে তাকে একটা-না-একটা কাজ দিতে হবে ; কারণ, এতে তার বুদ্ধিও খুলবে, আনন্দও হবে। মায়ের এই যে জ্ঞানটুকু, শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হওয়া দরকার। হয়েছেও, তবে কিছু দেরিতে। অন্তত পক্ষে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইওরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা ক্রমেই কর্মকেন্দ্রিক হওয়ার দিকে ঝুঁকেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিষয়ে তাঁর নতুন চিন্তাধারার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। তাঁর মতে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য ও কর্মব্যাপৃতির সুযোগ রাখা দরকার। এখন যে-বুনিয়াদি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তারও ঝোঁকটা ঐ কাজের দিকে ; কিন্তু, এ-কথা মনে রাখা ঠিক যে, এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল নীতিটি ভারতে নতুন নয়।

সে যাই হোক, শিক্ষাবিষয়ক কর্মসম্বন্ধে একটা নতুন ভাবধারা এনেছে বুনিয়াদি-শিক্ষাব্যবস্থা। বুনিয়াদি-শিক্ষায় শিশুর শিক্ষার জন্যে যে-কর্ম নির্বাচিত করা হয় তা উদ্দেশ্যমূলক, সমাজেরও দরকারী, আবার সৃজনীশক্তি-বিকাশেরও সহায়ক। মা যখন শিশুকে কোন কাজে গতিয়ে দেন তখনও যে তার কোন উদ্দেশ্য থাকে না তা নয় ; তবে সে-সম্বন্ধে শিশু সচেতন থাকে না। আর সে-কাজ যে সব সময়ে ঠিক দরকারী বা সৃজনীশক্তি-বিকাশের সহায়ক হয় তা-ও নয় ইওরোপ এবং আমেরিকার ইস্কুলগুলিতে যে-সব কাজের ব্যবস্থা শিক্ষায় রাখা হয় তাতেও কাজের প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য-মূলকতার

দিকে নজর রাখা হয় না। বুনিয়াদি-শিক্ষায় এই যে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকটি—এতেই এর বৈশিষ্ট্য; অন্যান্য কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার থেকে এখানেই এর পার্থক্য।

সামাজিক প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ওপর এই ঝোঁকটা যে এমনি হঠাৎ এসে গেছে তা নয় কিন্তু। সুগঠিত মানব-সমাজের মেরুদণ্ড হচ্ছে উৎপাদন। সমাজের লোকেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি উৎপাদন করবার সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব। উৎপাদনের হার প্রয়োজনমতো রাখা যেতে পারে সকলের সমবেত চেষ্টায়। বুনিয়াদি-শিক্ষার ঝোঁকটা হচ্ছে সামাজিক দরকারের কাজকর্মের ওপর; এতে শিক্ষাজীবনের গোড়া থেকেই শিশুকে সমাজের একজন বলে মনে করা হয়।

ভারত এবং অপরাপর দেশের শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা যদিও দিন-দিন শিক্ষায় কাজকর্ম ও মুক্তির দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন, তবু, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্তু গ্রন্থকেন্দ্রিকতা বেড়েই চলেছে। এমন-কি, শিশুশিক্ষাতেও বুদ্ধি, ভাব ও চরিত্রের বিকাশের দিকে লক্ষ্য না থেকে আছে স্মৃতিশক্তির কসরৎ করার ব্যবস্থা। আমাদের এখনকার শিক্ষা যে-পরিমাণে হয়েছে পুঁথিগত সেই পরিমাণে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে দূরান্তরিত। এ-শিক্ষা প্রায়ই শিশুদের সরিয়ে নিয়ে যায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে দূরে; এতে তাদের মনে দৈহিক মেহনতের ওপর একটা অস্পৃহা ও ঘৃণা এনে দেয়। এর ফল হয় এই যে, এই গতানুগতিক, চিরাচরিত ধারায় শিক্ষিত শিশুরা শুধু একধরনের কাজ ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। ঐ একটিমাত্র ক্ষেত্রে যদি সুযোগ না মিলল তো তারা নিরুপায় ও নিরাশ হয়ে পড়ে। এই কারণেই, ভারতে একজন মোটামুটি-শিক্ষিত ব্যক্তির আশানুরূপ সাহস ও আত্মবিশ্বাস দেখা যায় না। পরিস্থিতি বদলালে, কি, নতুন রূপ নিলে সে থতোমতো খেয়ে যায়।

ভারতের এই শিক্ষাব্যবস্থা যে জীবন সফল করার অনুকূল

নয়—সে-কথা না হয় না-ই ধরা গেল, শুধুমাত্র শিক্ষার দিক থেকেই কি এ-ব্যবস্থা সন্তোষকর? —না। এর দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের বিভিন্ন সদ্‌বৃত্তির চৌকস বিকাশ ঘটিয়ে গোটা মানুষ করে তোলার চেষ্টা না করে বুদ্ধির দিকটা বেশি অনুশীলন করার ওপর জোর দেয়া হয়। ইচ্ছা ও কল্পনার দিক তো এতে অবহেলিত হয়ই, বুদ্ধিরও কি সবদিক চর্চা করবার সুযোগ আছে? যা আছে তা স্মরণের যতখানি ততখানি নয় মননের, নয় যুক্তি-বিচারের। পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, বুদ্ধিটাও পুরোপুরি সাবালক হতে পারে না। পোড়োরা শুধু কতকগুলো সংবাদ সংগ্রহ করে বটে, পূর্ণ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে পায় না।

গান্ধীজী বিরোধী ছিলেন এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থার, যদিও নিজে তিনি শিক্ষার এই পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। প্রথমে তিনি এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এর শিক্ষা-বিষয়ক অসম্পূর্ণতার জন্যে। পরে যখন তিনি অর্থনীতিক ও সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনা করলেন তখন এর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ আরও দানা বেঁধে উঠল। তাই এখনকার প্রচলিত শিক্ষারীতির সঙ্গে বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রধান পার্থক্য যে কোথায় প্রথমে সেই সম্বন্ধে বলা দরকার। প্রচলিত শিক্ষারীতির মূল গলদটা হচ্ছে এই যে, এতে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকে সুপরিকল্পিত, ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে ধরা হয়েছে উচ্চতর শিক্ষার অধীন একটা অংশরূপে। একহিসেবে হয়তো এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। মাত্র শতখানেক বছর হল মানব-সমাজে রাষ্ট্রের সর্বজনীন শিক্ষার দায়িত্বের কথাটা স্বীকৃত হয়েছে। আপন-আপন জাতীয় সরকারেরই যখন এই অবস্থা তখন বিদেশী সরকার যে এ-বিষয়ে আরও কম-সচেতন থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী? ইস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানি, এবং তারপরে ব্রিটিশ রাজ যে এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার

প্রবর্তন করেছিলেন তা প্রথমত নিজেদের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে। দেশের প্রশাসনের কাজ চালানোর সুবিধার জন্যেই কিছুসংখ্যক ভারতীয়কে ইংরিজী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। একথা অবশ্য সত্য যে, একদল খ্রীষ্টান মিশনারি এবং শিক্ষিত ভারতীয় নেতাদের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। খাস ইংরেজ সরকারের ভেতরেও ছিলেন মেকলে সাহেবের মতো লোক। তিনি বলতেন, প্রতীচ্যের বিজ্ঞান ও রাজনীতিক চিন্তাধারা গ্রহণ করলে ভারত উপকৃত হবে। শিক্ষার আসল লক্ষ্যটা রইল কিন্তু প্রয়োজন-সাধন। এরই ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার কয়েকটা স্তর হিসেবে মনে করা হতে থাকল। এ-অবস্থায় যে গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের গ্রামীণ শিক্ষা নিতান্ত অবহেলিত হবে সে আর বিচিত্র কী। বুনিয়াদি-শিক্ষা এই দুরবস্থার উভয়দিকেরই প্রতিকার করতে কৃতসংকল্প। এই শিক্ষার ঝোঁকটা হল গ্রামীণ প্রয়োজনের দিকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটামুটি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা হয়ে ওঠাই এর উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশ যুগে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আর-একটা দোষ হচ্ছে এর ব্যক্তিতন্ত্রিতা। এক শতাব্দী, কি, তারও কিছু বেশি সময় এই শাসনকালে মানুষে-মানুষে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার ভাবটাই বেশি গড়ে উঠেছিল। অবশ্য, এটা এমন-কিছু আশ্চর্যের ছিল না এইজন্যে যে, উনিশ শতকের ব্রিটেনের শিক্ষাদর্শনের মতোই এখানকারও শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অভিব্যক্তিবাদের ভ্রান্ত উপলব্ধির ওপর স্থাপিত। টিকে-থাকার জন্যে, প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার মূল্য বেশি যদি না-ও হয় তো কম নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের নীতিটাকে ব্যাখ্যা করা হত শুধু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ও দলে-দলে লড়াই করে টিকে-থাকার নীতি বলে। এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখা যায় তারই প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাইতো এখন দেখি যে, সর্বসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মানুষ শুধু আপন

স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যস্ত ও তৎপর। এই নীতির সমর্থকরা মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন-আপন স্বার্থ দেখে তো তাতেই সমষ্টির স্বার্থ রক্ষিত হবে।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে বুনিয়াদি-শিক্ষার আর-একটা তফাত আছে। তা হচ্ছে এই যে, এতে ব্যবহারিক কাজ ও আনন্দের স্থান রাখার ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। মামুলী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বুদ্ধির কসরত, বিশেষ করে তা যখন অযোগ্য শিক্ষকদের হাতে পড়ে। ও-শিক্ষা তত্ত্ব-প্রধান; তাই ওর বিষয়গুলো সহজে বোধগম্য হতে চায় না শিক্ষার্থীদের, কাজেকাজেই থেকে যায় নীরস ও বিরক্তিকর। শিক্ষার বিষয় বুঝতে না পেরে তারা মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রাণ থাকে না; জীবন্ত চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ থাকে না তার। শিক্ষার উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে পারে না শিক্ষার্থীরা, তাই শিক্ষা-গ্রহণে তাদের আগ্রহ দেখা যায় না; জোর করে তাদের বাধ্য করা হয় যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু, এই যে বুনিয়াদি-শিক্ষা—এ হল কর্মকেন্দ্রিক। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানে যে, এতে শিক্ষার্থী তার কাজের ফলাফল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জানতে পারে। এতে করে তার মনে একটা সাফল্য ও প্রাপ্তির তৃপ্তি আসে। কি শিল্পীরা, কি বৈজ্ঞানিকেরা, সকলেই জানেন, স্বনিযুক্ত কর্মের সফল সম্পাদনের চেয়ে আনন্দ তেমন আর-কিছু নেই। শিশুদের এই বুনিয়াদি-শিক্ষা-ব্যবস্থায় সে-আনন্দের সুর একটু নীচু গ্রামে বাঁধা হলেও তার জাতটা একই।

এই বুনিয়াদি-শিক্ষার ঝোঁকটা হল হাতের কাজের ওপর। এর আর-একটা সুবিধা হয়েছে এই যে, এর জন্যে ভারতের বিকৃত-হয়ে-যাওয়া জাতি-ভেদ-প্রথার শোধন-সংস্কারের সুযোগ হচ্ছে। একথা অবশ্য সত্য যে, একদা বৃত্তি ও কর্মের ভিত্তিতে জাতির এই ভেদ-ভাগ করা হয়েছিল, আর তাতে অত কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু,

কিছুকাল পরে এই সহজ ভাব আর রইল না, তাতে এসে গেল পাথুরে কাঠিন্য। বুদ্ধির কাজ আর হাতের কাজের মানুষদের ভেতর একটা কড়াকড়ি ভাগ-ভেদ দাঁড়িয়ে গেল। কালক্রমে হাতের কাজ গণ্য হতে লাগল সামাজিক হীনতার পরিচায়ক বলে। ইংরেজ-শাসনযুগেও এ-মনোভাব গেল না। তখন তাতে আবার ইংরেজদের শ্রেণী-চেতনা যুক্ত হয়ে সমাজের বিভিন্ন থাকের মধ্যে পার্থক্যটা আরও প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গে অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির চাপে সামাজিক বৈষম্যে ভাঙনও দেখা দিতে লাগল। বুদ্ধির কাজের সঙ্গে কিন্তু মর্যাদাবোধের ভাবটা তখনও জড়িয়েই রইল। সে-অবস্থায় যে শিক্ষা মূলত পুঁথিগত ও অব্যবহারিক হবে তা আর এমন কী আশ্চর্যের। ব্যবহারিক কাজ-কর্মের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত করে বুনিয়াদি-শিক্ষা-ব্যবস্থা অনেক উপকার করছে। এই শিক্ষা শ্রম-বিমুখতা দূর করছে, শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে দিচ্ছে শ্রমের মর্যাদা-বোধ।

এই শিক্ষায় সমাজের প্রয়োজনীয় কাজের ওপর জোর দেওয়ায় ফল অন্যান্য দিকেও ভালো হয়েছে। এতে ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ শেখানো হয়; ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হতে থাকে। নিজেদের কাজের ফলাফল তারা সামনা-সামনি দেখতে পায়। এতে তাদের বেশ স্পষ্ট প্রাপ্তির আনন্দ জাগে মনে। ফলে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়তে উৎসাহ পায়। আর, আত্মপ্রত্যয় বাড়লে যে ক্ষমতাও বাড়ে—সে-কথা আর, কে না জানেন? তাছাড়া, একসঙ্গে অনেক জনে মিলে কাজ করার ফলে মনে সহযোগিতার ভাব এবং সামাজিক দায়িত্ব-বোধ জন্মায়। এই দায়িত্ব-বোধ আনে এমন নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা-বোধ যা ওপর থেকে চাপানো নয়, যা গড়ে ওঠে কাজ করতে-করতে। বুনিয়াদি-শিক্ষালয়গুলিতে যে শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি আত্মপ্রত্যয় ও শৃঙ্খলা-বোধের পরিচয় দেয় তা হঠাৎ আসে না। কিন্তু, একথা তো বলা চলে

না যে, এই দু'-রকম শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের সহজাত গুণশক্তির পার্থক্য আছে। এদের প্রায় সকলেরই সামাজিক পরিবেশ মোটামুটি একই রকমের। তফাতটা হয় শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং শিক্ষালয়ের পরিবেশে। একজায়গায়, শিক্ষার্থীদের ওপর-থেকে-চাপিয়ে-দেয়া নিয়ম-নীতি মানতে বাধ্য করা হয়; অন্যটায়, তাদের কাজকর্মের কিছু স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা দেয়া হয়। পুরোনো ধরনের শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা থাকে শুধু গ্রাহকরূপে; সমাজকে যে কিছু তারা দিতেও পারে—এ-মনোভাব তাদের ভেতর জাগাবার ব্যবস্থা রাখা হয় না। কিন্তু, বুনিয়াদি-বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা গড়ে ওঠে উৎপাদকরূপে; এ-বিষয়ে তাদের মন সচেতন হয়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই এই দু'-রকম ইস্কুলের পোড়োদের ভেতর তফাতটা চোখে পড়ে।

শিক্ষাসংস্কারকেরা মামুলী ইস্কুলগুলোর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক দোষ দেখেন। তার একটা হল এই যে, শিক্ষার বিষয়-নির্বাচনে কোন বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায় না; বিষয়গুলোর ভেতর কোন পারস্পরিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায় কোন পোড়ো ইতিহাসও পড়ছে, মেকানিক্স্‌ও পড়ছে, আবার কোন প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যও পড়ছে। কিন্তু, কেন যে পড়া হচ্ছে সে-জ্ঞান পোড়োদের তো দূরের কথা শিক্ষকদেরই নেই। এই যে গলদ —তা দূর করাই হচ্ছে বুনিয়াদি-শিক্ষার লক্ষ্য। পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা, কারিগরি-শিক্ষার সম্পর্ক কী তা জেনে তাদের ভেতর তা সংহত করার চেষ্টাই বুনিয়াদি-শিক্ষা-পদ্ধতির লক্ষ্য। অবশ্য, পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এই চেতনা যে একেবারে নতুন তা নয়। মানসিক জীবনের ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাবিষয়ের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন বিভিন্ন মতের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা। নানা কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব ও দাবি-দাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়াই হচ্ছে জীবন। বিভিন্ন কাজকর্মের ভেতর ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে না-পারলে এই খাপ-খাওয়ানো সম্ভব

হয় না। শৈশব থেকেই যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজকর্মের ভেতর সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও সামঞ্জস্য করে চলতে শেখে তার ব্যবস্থা রাখা একান্ত কর্তব্য। বুনিয়াদি-শিক্ষায় এই নীতি অনুসৃত হয়।

বুনিয়াদি-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় অনেক কথা বলা গেলেও একটা সাবধান-বাণীও শোনাতে হয়। এই শিক্ষায় বুদ্ধিগত বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ খুব ভালো কথা। কিন্তু এ-নীতির বাড়াবাড়ি তো ভালো নয়। যে-কোন বিষয়ের প্রথম প্রচেষ্টায় যে-উদ্দাম উচ্ছ্বাস থাকে এতেও তা থাকা অসম্ভব নয়। এমন অনেক বুনিয়াদি-শিক্ষা-সমর্থক আছেন যাঁরা মনে করেন অতিসামান্য বিষয় থেকে কঠিন বিজ্ঞানের বিষয় পর্যন্ত সব-কিছুই হাতের কাজের ভেতর দিয়ে শেখানো যায়। কিন্তু, এ অতি-উৎসাহী ধারণা ছাড়া আর কী? এই শিক্ষা-পদ্ধতিরও যে ক্ষমতার সীমা আছে—সেকথা মনে রাখাই ভালো। দার্শনিক হেগেলের অবশ্য একটা মত আছে যে, প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু, এর কিছু সত্যতা মানলেও একথা বলা কি হাস্যকর হবে না যে, কোন ব্যক্তি একটুখানি হাঁচলে কি কাশলে সর্বাধীশের স্বভাব তাতে বদলাবে; তেমনি, এই বুনিয়াদি-শিক্ষা-প্রবর্তনের সময় সেই সীমা-বোধ না থাকলেও অমনি হাস্যকর বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনা।

সহযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের এই নীতি শিক্ষালয়ের স্থানীয় সমাজেও প্রযুক্ত হওয়া দরকার। বুনিয়াদি-শিক্ষায় সমাজ-জীবনের প্রতিফলন হবার কথা; সুতরাং স্থানীয় সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখেই শিক্ষালয়ে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। মনে হতে পারে এই তো স্বাভাবিক, এ আর বলবার দরকার কী? তবু, জোর দিয়ে বলতে হয় এইজন্যে যে, স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার যোগ না থেকে যায় যদি তো বুনিয়াদি-শিক্ষার মুখ্য সুবিধা-সুযোগগুলো অলব্ধ থেকে যাবে। ক্রমপর্যায়ের

ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যবহারিক কাজকর্ম-সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সদ্বৃত্তি ও শক্তিসমূহকে ফুটিয়ে তোলাই বুনিয়াদি-শিক্ষার লক্ষ্য। তাই, কোন কাজ বা শিক্ষার বিষয় যদি পরিচিত না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের তা গ্রহণ ও আয়ত্ত করতে বেগ পেতে হয়; অর্থাৎ, সহজ আগ্রহ ও আকর্ষণ তাতে আসে না। সেই-জন্যেই, শিক্ষার বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশের সহজ সম্পর্ক না থাকলে তাতে ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য না হয়ে এক নতুন ব্যবধান-বাধার সৃষ্টি হয়।

পরিচিত কোন হাতের কাজ শেখানোর আর-একটা জোরালো যুক্তি আছে। পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের প্রায়ই একটা দূরত্ব রচিত হয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি-বিষয়ে। বহু নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের সাহিত্যে এই দুইপুরুষের দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব খুব বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, যেখানে প্রাচীনদের ভেতর অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি। আবার, সে-দেশে যদি আধুনিক রীতি-নীতির দ্রুত প্রচলন হতে থাকে তো মুশকিল আরও কঠিন আকারের হয়। এ-পরিবেশে তরুণদের মনে একটা বড়ামির ভাব আসে। ওদিকে প্রবীণদের মনে একটা অদ্ভুত ভাবদ্বৈত-সৃষ্টি হয়ঃ একদিকে সে-মনে থাকে নতুনের ওপর সংশয়, অপরদিকে, না-বোঝা জিনিস সম্বন্ধে মুগ্ধ প্রশংসা। শিক্ষিত তরুণদের কাছ থেকে অনেক-কিছু পাবার প্রত্যাশা জন্মে জ্যেষ্ঠদের মনে। শিল্পকর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষাধারার মূল নীতিটা হচ্ছে এই যে, এতে প্রবীণ ও নবীন পুরুষের দ্বন্দ্ব-ব্যবধান যতখানি সম্ভব কমিয়ে-আনার উপায় থাকে।

বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে শিল্পকর্মশিক্ষা থাকলেই হল না; তার বাছাই করার প্রশ্নও আছে। এখানে শিক্ষাটাই হল শিল্পকর্মকেন্দ্রিক। তাই এই শিল্পকর্মের নির্বাচনের ওপরই এ-শিক্ষার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। আগেই বলেছি যে, আপন-পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার ওপরই শিল্পকর্ম বা বৃত্তিশিক্ষার মূল্য নির্ধারিত হবে। কিন্তু, এখানে

আর-একটা কথা বলে রাখতে হচ্ছে। সেটা এই যে, শুধুমাত্র একটি কর্মশিক্ষার ওপরই জোর দিলে ভুল হবে। বুনিয়াদি-শিক্ষা যে শুধু মানুষকে ভাবী নাগরিক হয়ে-ওঠার জন্যেই তৈরি করে তা নয়, তাকে জীবনের বাস্তব ব্যাপারসমূহের কাছাকাছি রাখবারও চেষ্টা করে। সেইজন্যেই দরকার হচ্ছে, বুনিয়াদি-শিক্ষায় সামাজিক জীবনের রূপ ফুটে-ওঠার। একটিমাত্র বৃত্তিকর্ম অবলম্বন করে কোন সমাজই টিকে থাকতে পারে না, উন্নতি করা তো দূরের কথা। তাই, কোন বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে শিক্ষা যদি একটি বৃত্তিকর্মকে কেন্দ্র করে থাকে তো তাতে সমাজ-পরিবেশের বিচিত্র রূপের প্রকাশ হতে পারে না। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র সুতো-কাটাই ও বোনাইকেই বুনিয়াদি-বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিকর্মশিক্ষার বিষয় করে রাখা হয়েছে। এ-কাজের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য অস্বীকার করা হচ্ছে না, কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আরও নানা প্রয়োজনীয় বৃত্তিকর্ম-শিক্ষা বাদ দিয়ে শুধু একটির ওপর ঝোঁক দিলে বুনিয়াদি-শিক্ষার মৌল নীতিটাই হবে লঙ্ঘিত।

আর-একটি দিক থেকেও বৃত্তিকর্মশিক্ষার এক-কেন্দ্রিকতা বুনিয়াদি-শিক্ষার ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। গ্রন্থ-প্রধান, অ-ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্ধারণ থাকে বাঁধাধরা। তাতে শিক্ষার্থীদের ভাবী নাগরিক করে-তোলার দিকে তত দৃষ্টি থাকে না যত থাকে পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করার দিকে। বুনিয়াদি-শিক্ষার দাবি এই যে, কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষায়—কি শিক্ষক কি শিক্ষার্থী—উভয়েরই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। কিন্তু, বৃত্তিকর্মশিক্ষার বৈচিত্র্য না থাকলে তো সে-স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পায় না। একটিমাত্র বৃত্তিকর্ম-শিক্ষার সীমায় সবাইকে ধরে রাখবার চেষ্টা মানেই অনেকের বিভিন্ন ইচ্ছা, শক্তি ও রুচিকে বেঁধে রাখা, তাদের স্বাতন্ত্র্য-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করা। তাই বিভিন্ন বৃত্তিকর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা একান্ত দরকার; দরকার তিনটি কারণে,—তাতে বহু বৃত্তিকর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনের

বৈচিত্র্য প্রকাশ পাবার সুযোগ হয়; ভিন্ন ক্ষমতার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটে; আর, শিক্ষার্থীদের পছন্দ-অনুযায়ী শিক্ষা নেবার উপায়ও থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, শুধুমাত্র শিক্ষার প্রয়োজনের বিচারেই সব বিদ্যালয়কে ক্রমে-ক্রমে বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার যুক্তি আছে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মনে রাখলে তো এর আবশ্যকতা আরও জরুরী বলে বোধ হবে। গান্ধীজী এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কেননা, তিনি বুঝেছিলেন, এর যেমন শিক্ষামূল্য আছে তেমনি আছে শিক্ষাকে সবজনলভ্য করে তোলারও ক্ষমতা। আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনেক পিছিয়ে আছি তা অস্বীকার করা যায় না। অন্যরকম শিক্ষা-ব্যবস্থা যত বাঞ্ছনীয় বলেই মনে হোক না, তা যদি ব্যয়বহুল হয় তো এখনকার পরিস্থিতিতে তার প্রবর্তনের ইচ্ছা চেপে রাখতে হবে।

বৃত্তিকর্মশিক্ষার প্রাধান্য থাকায় বুনিয়াদি-শিক্ষার অন্তত আংশিক-ভাবে স্ব-নির্ভর হয়ে থাকার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কর্ম-শিক্ষার ফলে উৎপাদিত সামগ্রীসমূহের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে: তাই, সে-সব জিনিসকে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে খাপিয়ে নেয়া যায়। এসব সামগ্রীর অনেকগুলোই বিদ্যালয়ের কাজে লাগানো যেতে পারে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের কাজ থেকে তৈরী জিনিসগুলোর উপায় দিয়ে যদি তাঁদের অন্নবসনের প্রয়োজন মেটানো যায় তাহলে তো শিক্ষাখাতের মস্ত বড়ো খরচের ভাবনা চুকে যায়। তা ছাড়া, এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শ্রমের ফল তাঁদের নিজেদেরই কাজে লাগছে এ জেনে তাঁরা বেশ একটা প্রসাদ অনুভব করবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটানোর পরও যদি কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে তো তা দিয়ে বিদ্যালয়ের খুব জরুরী কতকগুলো দরকারও মেটানো যেতে পারে।

বুনিয়াদি-শিক্ষার অর্থনীতি খুব সাবধানে নির্ধারণ করতে হবে;

দেখতে হবে সে-নীতি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সহায়ক কিনা দেখতে হবে এ-ও যে, তাতে যেন শিক্ষার লক্ষ্যটা ভ্রষ্ট না হয় কেননা, সে-রকমটা হবার ভয় আছে। বৃত্তিকর্মশিক্ষায় উৎপাদনের ওপর ঝোঁক পড়তে-পড়তে এমন অবস্থা এসে পড়তে পারে যাতে এ-ধরনের বিদ্যালয় নাবালক মজুরদের খাটুনি-দিয়ে-গড়া কারখানা হয়ে উঠবে। এ-বিপত্তির শঙ্কা আরও বেশি এই কারণে যে, সাধারণ বিদ্যালয় থেকে এ-রকম বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের খাটুনি অনেক বেশি। আগেই বলা হয়েছে, বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকায় পোড়োদের অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ আছে ; আর, উৎপাদনকাজ থাকায় শুধু লেখা আর পড়ার একঘেয়েমি থেকেও মুক্তি পাবার সুযোগ হয়। কিন্তু এতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সহযোগ ও সামঞ্জস্য স্থাপন করার দায়িত্ব ও ভার পড়ে শিক্ষকদের ওপর। ফলে, তাঁদের ওপর চাপ পড়ে বেশ, কেননা, ওর জন্যে যে-সব সমস্যা গজিয়ে ওঠে তার সমাধান করতে হয় তাঁদের। সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রুটিন-মাফিক কাজ করেই রেহাই পান, কিন্তু বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তার উপায় নেই। বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যেখানে নিষ্ঠাবান উদ্যোক্তা ও পাকাপোক্ত সেখানে কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সে-কারণ দেখা দেয় তখনই যখন বিদ্যালয়ের প্রসারের ফলে শুধুমাত্র পেশাদার মানুষের আমদানি করতে হয় শেখানোর জন্যে। তখন যথার্থ বিপত্তিটা এই দাঁড়ায় যে, বুনিয়াদি-শিক্ষার যে-দিকটার সাফল্য-বৈফল্য সহজেই ধরা যায়—শুধু সেই দিকটার ওপরই জোর দিতে পারেন। শিক্ষার যে-দিকটা সৃজনী শক্তির উন্মেষক সেটা তত ধরাছোঁওয়ার বিষয় হয়ে ওঠে না ; তাই তার ফলাফল-নিরূপণও হয় না তেমন সহজ। এই কারণেই এখানে শিক্ষকদের দৃষ্টি কেন্দ্রিত হতে পারে উৎপাদনমূলক শিল্পের দিকে। বিদ্যালয়ে নির্ধারিতপরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হল কিনা তা নিরূপণ করা কঠিন নয়, কিন্তু, সেখানে শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব,

তাদের জীবনের মূল্যবোধ গড়ে উঠল কিনা তার হিসেব করা সহজ নয়।

একথা সহজেই বোঝা যায় যে, প্রথম দু'-তিন বছর কিশোর ছাত্রেরা যে-সব জিনিস উৎপাদন করে তার তেমন-কোন অর্থনীতিক মূল্য থাকে না। তার পর তাদের বয়স ও দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত হওয়া উচিত। শিক্ষার অঙ্গ-হিসেবে ধরা দরকার এই মানকে। শিক্ষার্থীদের যদি ঠিকমতো শেখানো হয়, আর তারা যদি মন দিয়ে, আগ্রহ নিয়ে কাজ করে তো তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত না হবার কোন কারণ নেই। কোন কাজ যদি করতেই হয় তো বেশ ভালো করে করাই উচিত। যেমন-তেমন করে খেয়াল-খুশিতে কাজ করার কোনই মানে হয় না। অতএব, একথা মনে রাখা বিধেয় যে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় ভালো জিনিসের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

এই কথাটা কি আর বিশেষ করে বলে দিতে হবে যে, বিদ্যালয় হচ্ছে ভাবী নাগরিক গড়ে তোলার কেন্দ্র, সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর সামগ্রী তৈরির কারখানা নয়। যে-বৃত্তিকর্ম শেখানো হবে তার মাধ্যমে যেন শিশুদের শক্তিসামর্থ্যের স্ফুরণ হয়, তা দিয়ে যেন সমাজবোধ, বাস্তববোধ জাগে। শিশুদের তৈরী কতকগুলো জিনিস নিশ্চয়ই বেচতে পারা যাবে, বেচতে হবেও, কিন্তু, তাই বলে এই বিক্রিটাকেই যেন তাদের কাজের একমাত্র পরিমাপক না করে তোলা হয়। একথা মনে রাখতে হবে চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর-কিশোরীরাও শিক্ষানবিশ। তাদের যদি পাকা কারিগর করে তুলতে হয় তো কাজের মানকে খুব উঁচু করে ধরলে চলবে না। সমাজের দিক থেকে দেখলেও, কিশোরদের নীচু মানের পুরো কারিগর হয়ে ওঠার চেয়ে এখন-কিছুকিছু জানা কিন্তু ভবিষ্যতে পাকা কর্মী হয়ে-ওঠার সম্ভাবনা থাকা ঢের ভালো।

এই বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলা

দরকার। লক্ষ্য-অনুযায়ী শিক্ষায় থাকবে পার্থক্য। উৎপাদন বাড়ানো যদি লক্ষ্য হয় তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পটুতা বাড়াবার দিকে দৃষ্টি দেবেন। আর, এ করতে হলে উৎপাদনের কাজকে ভাগ করে নিতে হবে কয়েকটা স্তরে : এক-এক স্তরের কাজে এক-এক দলকে করতে হবে বিশেষবিদ্। কিন্তু লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষা, তবে শিক্ষার্থী যেই একটা বিষয়ে বেশ পটু হয়ে উঠবে অমনি তাকে কাজের অন্য-একটা স্তরে নিযুক্ত করতে হবে। এতে অবশ্য উৎপাদন-নৈপুণ্যে কিছুটা বাধা হবে, কিন্তু সে-বাধার ক্ষতি পূরিয়ে যাবে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি ও জ্ঞানপ্রসারের ফলে। একথা বলাই বাহুল্য যে, বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে উৎপাদন-ব্যাপারটা হল গৌণ। এথেকে কিছু আয় যদি আসে তো আসুক, কিন্তু এই যেন মুখ্য লক্ষ্য না হয়ে বসে।

বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হলে বহু বৃত্তিশিক্ষক চাই, এবং শিক্ষক খুব উৎসাহী ও কর্মরত হওয়া চাই। কিন্তু, তেমন শিক্ষক বেশি মেলা তো কঠিন। তাই এমন-সব শিক্ষক এসে যেতে পারেন যাঁদের এই শিক্ষায় তেমন নিষ্ঠা ও আদর্শবোধ নেই। তাঁদের হাতে পড়ে, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে শিক্ষার্থীদের খাটুনি ভাঙিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করার উপায় হিসেবে এ-শিক্ষা গৃহীত হতে পারে। তাই, এ-বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষকের মানস শক্তি যদি উন্নত ধরনের হয় তো শিক্ষার্থীকে দিয়ে ভালো ভালো কাজ করিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু মামুলী শিক্ষক হলে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য-অসামর্থ্য না বুঝেই তিনি জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারেন। এই নাবালক শিক্ষার্থীদের কাজের মোটামুটি পরিমাণ ঠিক করে দেওয়া দরকার। কিন্তু তা করতে হলে এ-বিষয়ে বেশ সযত্ন ও ব্যাপক পরীক্ষণ আবশ্যক। আর, বিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষার প্রকারভেদে এই পরিমাণ কমবেশি হতে পারে—সেটা মনে রাখা চাই।

বুনিয়াদি-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের কেউ-কেউ বলেন যে, বিদ্যালয়ের বৃত্তিশিক্ষায় যে-সব জিনিস লাগে তার

দাম উঠে গেলেই যথেষ্ট হল। এখনও পর্যন্ত যা দেখা যায়, বুনিয়াদি-শিক্ষার সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে বিহার-রাজ্যে। সেখানে কোন-কোন বিদ্যালয় সমস্ত খরচের অর্ধেক কি তারও কিছু বেশি টাকা তুলে নিয়েছে তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বেচে। কিন্তু এ-রকমটা অন্যত্রও হতে পারবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। ওখানকার কোন-কোন বিদ্যালয় বৃত্তিশিক্ষার জন্যে দরকারী কাঁচামাল যে-দরে কিনেছে টাকা উপায় করেছে তার দু'গুণ। এ নিন্দের কিছু হয় নি, বরং ঠিকই হয়েছে। এ-কথা বোধ করি বলা যেতে পারে যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচার দ্বিগুণ আর যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মেরামতি বাবদ কিছু খরচার টাকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বেচে তোলা অন্যায় কিছু হবে না। এ না হলে শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। এ যেমন গেল সম্ভাব্য নিম্নমানের সীমার কথা, তেমনি আবার উচ্চ-মানের সীমাটাও মোটামুটি ঠিক করা যেতে পারে। সেটা হবে বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচার শতকরা বিশ থেকে ত্রিশ হারের সংখ্যা। বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দিয়ে টাকা রোজগার এর চেয়ে বেশি হলে নির্ঘাত মনে হবে যে, শিক্ষকরা শিক্ষণ ও শিক্ষার দিকের চেয়ে উৎপাদনের দিকেই ঝুঁকেছেন বেশি।

শিক্ষাবিষয়ের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষৎ ব্যাপারটি বিশদ ভাবেই আলোচনা করেছে। যাঁরা প্রথম থেকে দাবি করেছিলেন যে, বুনিয়াদি-বিদ্যালয় হবে স্বনির্ভর এই পর্ষৎ তাঁদের কথা শুনেছে। শেষ পর্যন্ত পর্ষৎ ঠিক করেছে যে, বিদ্যালয়ের পোড়োরা যদি সব বিষয়ে আত্মনির্ভর হতে শেখে তো সে-ই যথেষ্ট। বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর, পর্ষৎ বিদ্যালয়ের অর্থার্জনের কোন নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিতে চায় নি। পর্ষৎ শুধু এইটুকু বলে ছেড়ে দিয়েছে যে, বুনিয়াদি-শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষা ও উৎপাদন—এই উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি রাখতে হবে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, বৃত্তিকর্মশিক্ষায় উৎপাদনের দিকে বেশি ঝোঁক পড়লে মুশকিল হবে। কিন্তু, এই মুশকিলের ভয় থাকার জন্যে তো আর এই শিক্ষাধারাকে দোষী করা যায় না। সে-কথা বলতে গেলে তো কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই দোষ-ধরার থেকে বাদ যায় না। বহু রকমের বৃত্তিকর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকার সুবিধা এই যে, তাতে কি শিক্ষক, কি শিক্ষার্থী—দুইয়েরই বৈচিত্র্যের সুযোগ থাকে। এতে অর্থনীতিক দিকের চেয়ে শিক্ষার দিকে বেশি ঝোঁক থাকার উপায় থাকে। আবার দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এতে হয়। ভারতের মতো গরিব দেশে বৃত্তিকর্মের বৈচিত্র্য থাকা একান্ত দরকার। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির ভিত গড়া হবে এই বহু-বৃত্তিক বুনিয়াদি-বিদ্যালয়গুলোতে। সোভিয়েট রাশিআর প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এ-ভরসা আমরা করতে পারি। রাশিআয় শিক্ষাকে যখন বৃত্তিকর্মকেন্দ্রিক করা হল তখনই সর্বজনীন শিক্ষার কাজ খুব জোর পেল। শিশু ও কিশোরদের সুযোগ দেওয়া হল কর্মশক্তি ও অর্জন-ক্ষমতা বাড়াবার। বিদ্যালয়গুলিকে বহু-বৃত্তিক বা 'পলিটেক্‌নিক্' করে তোলার এই হল প্রথম ধাপ। আর, এর ফলে সোভিয়েট রাশিআর ভবিষ্যৎ শিল্পায়ন ও উন্নয়ন-পরিকল্পনার কাজের ভিত্তি রচিত হল এখানে। ভারতেও বুনিয়াদি-শিক্ষার বিকিরণ নানা ধরনের কারিগরি-শিক্ষার সূচনা করতে পারে।

স্বাধীনতা ও সংগঠন: সমাজের উন্নতির জন্যেই নয় শুধু, নিছক বেঁচে থাকার জন্যেই দরকার এই দুটি জিনিসের। শিশুদের জীবনবোধের সুরু থেকেই তাদের মনে জাগাতে হবে স্বাধীনতাবোধ আর সাংগঠনিক শক্তি। এই উদ্দেশ্যেই বুনিয়াদি-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য বলে ধরা হয়েছে সহজাত শক্তির সমাজবোধের বিকাশকে। শিশুদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সহজতা ও মুক্তি থাকলে কী হয়?—তাতে তাদের সত্তার তলায় থিতিয়ে-থাকা সব চিদ্‌বৃত্তির মুঞ্জরণ-প্রস্ফুটন। সমাজ-বোধের শিক্ষা তাদের ভেতর জাগায় সমাজ-বিষয়ে দায়িত্ব-বোধ,

তাতে তারা সমাজের সহযোগী কর্মী হিসেবে নিজেদের দেখতে শেখে। দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে-দিতে তাদের মাথা খাটিয়ে কাজ করার ও দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। দল বেঁধে কাজ করার সুবিধা আছে; তাতে সহযোগিতা-বোধ আসে। এতে করে শিক্ষা-ব্যাপারটা গতানুগতিক, যান্ত্রিক থাকে না, জীবন্ত হয়ে ওঠে; শিক্ষার্থীরা মনে করতে সুযোগ পায় যে, তারা এক বৃহত্তর সমাজের অংশ। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সমাজ-সম্পর্কে কিছু জানতে হলে জানিয়ে দিতে হয় কথা বলে; কিন্তু, বুনিয়াদি-শিক্ষায় তা হয় না। তাতে সে সমাজের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে। প্রথমটা হচ্ছে বাচনিক বা গ্রন্থগত জ্ঞান, সুতরাং, সাক্ষাৎ জীবন থেকে দূরায়িত। আর, দ্বিতীয়টা সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে নাগরিকতা-শিক্ষার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ।

এ থেকে বোধ করি বোঝা যাচ্ছে বুনিয়াদি-বিদ্যালয় হবে গণতন্ত্র-নীতির সক্রিয় প্রকাশের দৃষ্টান্তস্থল। এই নীতির সাফল্য আসবে কি আসবে না তা নির্ভর করবে শিক্ষকের যোগ্যতার ওপর। অন্য-সব ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এখানেও বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক নীতি ও ক্রিয়ার সাফল্য দেখা দেবে যদি নেতৃত্বে থাকে যথার্থ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা। আগেই বলা হয়েছে, গ্রন্থ-নির্বাচন ও পাঠনির্দেশ-বিষয়ে এখানে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকায় শিক্ষকদের প্রভূত যোগ্যতার দরকার হয়। যে-কোন ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই অবশ্য শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তা, কর্মতৎপরতা ও লক্ষ্যবোধ প্রভৃতি গুণই মূলধন। তবে বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি।

মানুষের সব কাজেরই লক্ষ্য হল সুখলাভ। কোন-কোন মনোবিদ্ তো বলেছেন, কর্মসম্পাদনে যে তুষ্টি তা-ই হচ্ছে সুখ। শুধু গাদাখানেক বই-এর বোঝা চাপিয়ে নিষ্প্রাণ রুটিনের জাঁতাকলে ফেলে শিক্ষার্থীদের মনকে কেবল পেষাই করাই হয়। তাতে তাদের কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা আসবার কথা নয়। বুনিয়াদি-শিক্ষা-ব্যবস্থা

এই-সব অসুবিধা সরিয়ে ফেলতে চায়। এইজন্যেই এতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতা নিয়ে দয়কারী কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই শিক্ষায় বৃত্তিকর্মশিক্ষার সুযোগ থাকায় বুনিয়াদি-বিদ্যালয় হয় প্রাণবন্ত; এ শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ও অব্যবহারিক বিদ্যার নিরানন্দ প্রাণহীন, একঘেয়ে একটা জায়গা হয়ে ওঠে না। কিন্তু, এখানে যদি বৃত্তিকর্মশিক্ষার ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে ওঠে তবে এখানকার শিক্ষাও হয়ে দাঁড়াবে বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর।

প্রায় সব দেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষা-লাভকে আনন্দময় বলে অনুভব করবার ব্যবস্থা রাখা হয়। শিক্ষার্থীদের যাতে কোন ক্লান্তি ও বিরক্তি না আসে, যাতে বরং তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেয় তারই চেষ্টা করা হয়। ভারতেও এই সুস্থ ও প্রসন্নকর নীতির অনুসরণ ও অবলম্বন সর্বতোভাবে হওয়া উচিত। ভারতে এর ওপর বেশি করে ঝোঁক দেয়া উচিত এইজন্যে যে, এখানে দুঃখ-দুর্ভোগের স্তুতিগান করার একটা ভাব প্রায়ই দেখা যায়। বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতে সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের একটা ধারা চলে আসছে। আদর্শবাদী, ভাববাদী কোন-কোন মানুষের ধারণা সাধ্য লক্ষ্যবস্তুর প্রাপ্তির জন্যে আমোদ-আহ্লাদ বর্জনীয়। একথা অবশ্য ঠিক যে, মহৎ আদর্শের জন্যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করায় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু, শুধু-শুধু কষ্ট করা বা দুঃখ পোহানোর কোন মানে হয় না। বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের কোন-কোন শিক্ষকের এই অকারণে দুঃখকষ্ট ভোগ করার প্রবৃত্তিটাকে বড়ো করে দেখতে দেখা যায়। এই প্রবৃত্তির রাশ টেনে ধরতে না পারলে বুনিয়াদি-শিক্ষা অমিতানন্দ, প্রাণপ্রচুর কিশোর-কিশোরীদের জীবনীশক্তির বিকাশের উপায় না হয়ে হবে প্রতিবন্ধক।

যথার্থ বুনিয়াদি-শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার যোগসাধন করে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে একঘেয়েমি ও বিরক্তির হাত থেকে। এ-শিক্ষা বৃত্তিকর্মশিক্ষা থেকে উদ্‌ভাবন করে জ্ঞানের বিষয়। বিদ্যালয়ে

একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের পরিবেশ গড়ে তোলে এই শিক্ষা। স্ব-নির্বাচিত ও স্ব-প্রণোদিত কাজের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় বলে এই শিক্ষাই শিশুদের পক্ষে ভালো। আর, শিশুদের পক্ষে যা ভালো তা নিশ্চয়ই সমাজের পক্ষেও ভালো। সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষার ব্যয় অন্তত অংশত এ থেকে আসে বলে শিক্ষাকে সর্বলভ্য করে তুলতে সাহায্য করে এই বুনিয়াদি-শিক্ষা। এর সামাজিক উপযোগিতা থাকায় মানবিক সব কাজকর্মকে যাঁরা সামাজিক উপযোগিতার মাপে বিচার করেন তাঁরাও একে সমর্থন জানান। সব শিক্ষাই হয়তো শেষ পর্যন্ত উপযোগী; কিন্তু, মুশকিলটা হয় তার ফল পেতে দেরি হওয়ার জন্যে। অর্থের অভাবে অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কাজে ফলানো যায় না। বুনিয়াদি-শিক্ষায় এই অর্থাভাবের মুশকিলের কথাটা ওঠে না, কেননা, এর দাম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ও সোজাসুজি পাওয়া যায়।

এ-বিষয়ের উপসংহার করার আগে একটা প্রণিধেয় কথা বলে নিতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, চিরাচরিত শিক্ষাধারার জায়গায় বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রবর্তন-প্রচলন ক্রমশ হওয়া ভালো। দু'লক্ষের ওপর বিদ্যালয়ের রূপান্তর এবং দশলক্ষ শিক্ষকের নব-শিক্ষণ-লাভ হতে সময় কিছু লাগবে বৈকি। ক্রান্তিকালে এই দু'টো ধারাই থাকবে পাশাপাশি। দেখতে হবে, এ-দু'য়ের ভেতর বিরোধ না বাধে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন যেন প্রাচীন ধারার আকস্মিক উচ্ছেদ না ঘটায়। বরং, এই ভাবটাই মনে রাখা দরকার যে, অনেক বিস্মৃত বা উপেক্ষিত ব্যাপার পুনরুজ্জীবিত হবে এ-ব্যবস্থায়। কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা,— নানা বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও যোগাযোগ স্থাপন করা, শিক্ষাকে উদ্দেশ্য-মূলক করে তোলা হবে এ-শিক্ষার লক্ষ্য। এ-বিষয়ে তত্ত্ব ও নীতি নির্ধারণ না করলেও প্রায় সব নামী শিক্ষাবিদ্‌ই

এইরকম শিক্ষার সার্থকতা স্বীকার করেছেন। যা-ই হোক, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি-শিক্ষায় পরিণত করে শিক্ষায় উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন আনতে হলে এই নীতির স্বীকৃতি ও অবলম্বন যথেষ্ট দরকার।

সেপ্‌টেম্বর ১৯৫৩।

তৃতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার

মাঝে-মাঝে এমন কথা শোনা যায় যে, জাতির জীবনে শিক্ষার আসল সমস্যাগুলো হচ্ছে প্রাথমিক অথবা বয়স্ক-শিক্ষা বিষয়ে। প্রাথমিক ও বয়স্ক-শিক্ষা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এই-ই একমাত্র বলে গ্রাহ্য হবার নয়। শিক্ষার নানা স্তরের কথা স্বীকার করতেই হয়। এই-সব স্তরের বিভাগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যায় না; এই স্তরগুলি যে পরস্পরের সঙ্গে সংপৃক্ত সেকথা না মেনে উপায় নেই। আর-একটা যুক্তি এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকরা মাধ্যমিক শিক্ষাধারা থেকে শিক্ষা পেয়ে গড়ে ওঠেন। বয়স্ক-শিক্ষার শিক্ষকরাও তাই। সুতরাং যুক্তিযুক্ত ভাবেই মানতে হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষার যথোচিত প্রসার ও সংস্কার না হলে প্রাথমিক বা বয়স্ক-শিক্ষার প্রসার ও সংস্কার হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, রাষ্ট্রের রীতি-নীতি ও কর্মব্যবস্থা নিরূপণ করেন দেশের নেতারা। তাঁদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত হলে উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট সুফল-লাভ অসম্ভব।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেই প্রাথমিক ও বয়স্ক-শিক্ষার শিক্ষক তৈরী হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি হয়। তাছাড়া, এই স্তরেই সব দেশে বেশির ভাগ লোকের শিক্ষা শেষ হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষা পোক্ত না হলে উচ্চতর শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ-গ্রহণ ঠিকমত হতে পারে না। অন্য কোন কারণের জন্যে হোক আর না হোক, উল্লিখিত যুক্তিগুলির দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতম মান-প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে একান্ত দরকার।

আর-একটা কারণেও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত হওয়া উচিত : যে-কোন দেশেই অধিকাংশ লোক প্রাথমিক শিক্ষার পরই বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেন। যে-অল্পসংখ্যক লোক মাধ্যমিক শিক্ষার পর উচ্চতর শিক্ষা পাবার সৌভাগ্য পান তাঁদের ভেতর থেকেই নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তির উদ্ভব হয়। এই নেতাদের চিন্তাকল্পনার যদি ব্যবহারিক কাজে পরিণত হতে হয় তো তার জন্যে চাই বহু যথাযোগ্য শিক্ষিত লোক। কারণ, শুধু নেতাদের দিয়ে তো আর সব কাজ হতে পারে না। নেতারা পরিকল্পনা করবেন, পথনির্দেশ দেবেন, কিন্তু সে-সব পরিকল্পনা ও নীতিকে কাজে ফলিয়ে তুলবেন মধ্যস্তরের মানুষেরা। আর এই-সব মানুষের এমন জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা চাই যাতে তাঁরা নেতাদের পরিকল্পনা, নীতি ও উদ্দেশ্যের বিষয় বুঝতে পারেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা অমনি-সব মধ্যস্তরের মানুষদের শিক্ষার সুযোগ দেবে, দেয়া উচিত। উচ্চস্তরে যে-সব পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারিত হবে সেগুলোকে কাজে রূপ দেবেন মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। এই স্তরে যাঁদের শিক্ষা শেষ হবে তাঁদের শিক্ষা হতে এমন জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জিত হওয়া চাই যাতে তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। তাঁদের ভেতর থেকে কাউকে-কাউকে এগিয়ে আসতে হবে নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করবার জন্যে, আর বাকী সবাই কাজ করবেন মধ্যস্থ ব্যক্তি হয়ে; নেতাদের পরিকল্পনা ও নীতির কথা তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন সাধারণ মানুষকে।

একথা সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাকে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যে নায়কস্থানীয় লোক তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষা হতে লাভ হয় জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় কতকগুলো স্থূল জ্ঞান; তাতে শুধু শিক্ষার বুনিয়াদটা তৈরী হয়। উচ্চশিক্ষায় জ্ঞানের সীমানা হয় প্রসারিত; এ-শিক্ষা অনেকটা আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যেকার যোগসূত্র।

একথা বোঝাবার দরকার হয় না যে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে হলে শিক্ষার প্রসার হতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র শিক্ষার সংখ্যাগত বৃদ্ধি হওয়াই যথেষ্ট হবে না। শিক্ষার গুণগত উন্নতি না হয়ে শুধু সাক্ষরতা-বৃদ্ধিতে সমস্যার সমাধান তো হবেই না, বরং বেড়েই চলবে। এইজাতীয় শিক্ষার সুযোগ-বৃদ্ধিতে সারা পৃথিবীতে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাতে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা উদ্‌বিগ্ন না হয়ে পারেন নি। শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে গুণগত দিকের অবনমন হবার ভয় থাকে। শিক্ষার মান উন্নত না হলে শিক্ষাপ্রসারের এই আশঙ্কা থাকে যে, তাতে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিগুলোর উদ্দীপন হয়। মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ ছিল সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার। প্রাচীন যুগে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও উপায় ছিল সীমাবদ্ধ; তাই তাদের প্রয়োগে ক্ষয়-ক্ষতির শঙ্কাও ছিল সীমিত। কিন্তু বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সুযোগ বেড়ে গেছে বিস্তর; তাই তার প্রয়োগে সর্বনাশা ক্ষতির ভয় রয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত না হলে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সুযোগের অপপ্রয়োগ হওয়া খুবই সম্ভব। সুতরাং এখন শিক্ষার মান যথার্থ উন্নত হওয়া বিশেষ দরকার। শিক্ষা-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার মান যেন নেমে না যায়। দেখতে হবে যে, মানুষের মধ্যে যেন স্বাধীন সৃজনী শক্তির উন্মেষ হয়, যেন মানবসমাজের নানা পরিবেশের সংস্কৃতির মূল্যবোধ মানুষের হয়। অতীতে এই-সব সংস্কৃতির সম্পদগুলি রক্ষার ভার ছিল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির ওপর। এখন শিক্ষার প্রসারের ফলে তা বর্তেছে প্রায় সকলের ওপর; তাই তাতে সংস্কৃতির মূল্যবোধের মান নেমে যাওয়ার ভয়ও আছে।

আর-একটা বিপদ-সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে আমাদের।

সেটা হচ্ছে শিক্ষাকে ছাঁচে-ঢালাই জিনিসের মতো করে তোলা। প্রায়ই দেখা যায়, যেই বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের পরিকল্পনা-ব্যবস্থা হয় অমনি তাতে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা এসে পড়ে; বহুজনের বহুরকমের বুদ্ধি-প্রতিভা ও রুচিপ্রবৃত্তির বাছবিচার না করে সকলের জন্যেই একরকম শিক্ষাধারার ঢালাও বরাদ্দ হয়ে যায়। কিন্তু এভাবে শিক্ষার চরম সুফল পাওয়া যায় না। তা পেতে হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানতে হবে; প্রত্যেককে তার নিজের শক্তি-রুচি-প্রবণতার পথে চলতে দিতে হবে। কোন জাতিকে যখন শিক্ষাপ্রসারের নেশায় পেয়ে বসে তখন তার এই চেতনাটা প্রায়ই থাকে না; তখন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জায়গায় শিক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধিকেই বড়ো-করে দেখার ভ্রান্তি ঘটে। ছাঁচে-ঢালা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরে তত হানিকর হয় না। হয় না তিনটি কারণে। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মন নমনীয় থাকলেও তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা করার ক্ষমতাও কিছু কম থাকে না। তাদের এই স্ব-ভাবে ফিরে আসবার সহজাত শক্তি তাদের রক্ষা করে ছাঁচে-ঢালা, বৈচিত্র্যহীন শিক্ষা-ব্যবস্থার মারের হাত থেকে। তাছাড়া, এইরকম শিক্ষার হাত থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড়ো রক্ষাকবচ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার কালপর্বের অল্পস্থায়িতা। এই শিক্ষার ছাপ বড়ো-হওয়া পর্যন্ত বড়ো-একটা থাকে না; বয়স্ক-জীবনের প্রয়োজনে ও-শিক্ষার মূল্যও তেমন-কিছু নয়। শিক্ষার স্থূল বুনিয়াদ তৈরি-করা হচ্ছে এই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই সে-শিক্ষা বরং ঐ-ধরনের হওয়াই দরকার। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের পরে অমন ছাঁচে-ঢালা শিক্ষা ক্ষতিকরই হয়ে থাকে। তাতে বিপদ দেখা দেবে বুদ্ধি-প্রতিভার তারতম্য-অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবের। শুধু কি তাই?—তাতে ভবিষ্যতে আপন-আপন বৃত্তিনির্বাচন করাও হবে আরও কঠিন। এর শোচনীয়তর কুফল হয় এই যে, এতে সমাজে এক অদ্ভুত মনোভাব

তৈরী হয়; তাতে উপস্থিত বিষয়সমূহ হয় নির্বিচারে গৃহীত, নয় বর্জিত হয়।

২

গণতান্ত্রিক দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান যে কোথায় তা ওপরের আলোচনা থেকে বোধ করি বোঝা যাবে। দুঃখের বিষয়, ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই শিক্ষা যে উচ্চ-শিক্ষার সহায়ক হয় না তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভিযোগ থেকে বোঝা যায়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কি প্রাথমিক, কি সামাজিক কোন শিক্ষা দেবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না তা শিক্ষাদফ্‌তরের পরিচালক অধিকর্তাদের মতামত থেকে জানতে পারা যায়। জন-সাধারণেরও ধারণা এই যে, এ-শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যেকার নেতৃত্বগুণের উন্মেষণ করে না, অথচ এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী ঐ-গুণের বিকাশ-সাধন করা। মাধ্যমিক শিক্ষা যথোপযুক্ত প্রয়োজন-সংগত না হওয়ায় প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সামাজিক জীবন ও শিল্প-বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাধারার ত্রুটিগুলি সহজেই বুঝতে পারা যায়। ভারতে নেতা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান যে কতখানি তা বুঝতে পারা গিয়েছিল ভারত-বিভাগের পর জনজীবনের বিশৃঙ্খলায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভারতে বৈজ্ঞানিক, ইন্‌জিনিঅর এবং নির্মাণ-বিজ্ঞানীর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমাদের দেশে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যাদের ভেতর কর্মপ্রতিভা আছে সুপ্ত হয়ে, যা শুধু তেমন শিক্ষার অপেক্ষায় আছে। এই কর্মশক্তি ইউরোপ বা আমেরিকার কর্মশক্তির চেয়ে কিছু হীন নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে ভারতীয় কর্মীদের উৎপাদন-শক্তি সাধারণত কম। এর কারণ কেবলমাত্র আমাদের

যান্ত্রিকীকরণের অল্পতা নয়। কেননা, একই ধরনের যন্ত্রে কাজ-করা ভারতীয়দের উৎপাদন-শক্তি কম। এর একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ হচ্ছে ফোরম্যান, চার্জম্যান্-ধরনের সুদক্ষ কর্মজ্ঞ মধ্যস্থ কর্মীর অভাব।

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে, এর কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নেই লক্ষ্য ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্ধারণ। সাধারণত এই স্তরের শিক্ষাকে হয় প্রাথমিক শিক্ষারই অনুক্রমণ বা বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রস্তুতি বলে মনে করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা যে মাধ্যমিক শিক্ষা নিতে আসে সে তাদের যোগ্যতা-বিচারে নয়, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই ব্যাপ্তি বলে, আর তাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে বলে। তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররাও উচ্চশিক্ষা নিতে আসে তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে বলে নয়, অর্থসাচ্ছল্য আছে বলে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে রূপান্বিত না করার দরুন এই শিক্ষাধারাটি নিতান্তই অস্পষ্ট হয়ে আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও অধিকারের বিষয় অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট থাকার ঐতিহাসিক কারণ আছে। অতীত যুগে শিক্ষায় ছিল অল্প-সংখ্যক মানুষের একান্ত অধিকার। তাঁদের সুযোগ-সুবিধা ছিল যতখুশি জ্ঞান অর্জন করার। অতীতের মনীষীদের শুধু নয়, রাজকুমার এবং আরামে-বিরামে সময়-কাটানো অন্যান্য মানুষের নানা বিষয়ের জ্ঞানের কথা জানলে সত্যই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করবার দরকার হত না তাঁদের। তাই তাঁরা নির্বিচারে নানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে প্রবৃত্ত হতেন। তখন শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল অন্যরকম। শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা কী বা কতখানি সে-ভাবনা না করে শিক্ষাকে মনে করা হত শুধু সত্যসন্ধান বলে। যে-অল্পসংখ্যক লোক এই সত্যসন্ধানে ব্রতী হতেন তাঁরা সন্ধেয় বস্তুর কোন সীমা আছে বলে মনে করতেন না। এ ছাড়া বাকী

অসংখ্য লোক নিজেদের বৃত্তির জন্যে দরকারী কর্মনৈপুণ্য আয়ত্ত করেই তুষ্ট থাকত। একে কিন্তু শিক্ষা বলে মনে করা হত না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বলে এই যে শিক্ষার স্তরবিভাগ—এ খুব প্রাচীনকালে ছিল না; এটা আধুনিক ব্যাপার। এ থেকেই বোঝা যায় কেন প্রায় সব দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষার সীমানা সুনির্দিষ্ট নয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও অধিকার নিয়ে তুমুল তর্ক চলেছে। কেউ বলছেন, এ-শিক্ষা হবে প্রধানত ব্যবহারিক; এর উদ্দেশ্য হবে জীবিকা-অর্জনে সাহায্য করা। আবার কেউ বলছেন, এ-শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো-ভালো মানুষ গড়ে তোলা।

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও অধিকার আরও অনির্দিষ্ট। তার অবশ্য কতকগুলো বিশেষ কারণ আছে। এখনও অবধি ভারতে যে-শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা প্রবর্তিত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম দিকে। তার উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। তখন এমন কয়েকজন ব্রিটিশ শিক্ষোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা মনে করতেন প্রতীচ্যের বিজ্ঞান ও রাজনীতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলে ভারতীয় সমাজে নবজীবন সঞ্চারিত হবে। আর, অপরদিকে ছিলেন বহু প্রশাসক যাঁদের লক্ষ্য ছিল এদেশীয় লোকদের ব্রিটিশ ভাবধারায় শিক্ষিত করে রাজ্যশাসন-পরিচালন করা। কেননা, রাজ্যশাসন-পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যার সব লোক তো আর ব্রিটেন থেকে আনা সম্ভব ছিল না। শাসনযন্ত্রের ওপরতলার কাজগুলো অবশ্যই ছিল ইংরেজদের হাতে, কিন্তু তাতে করে তো আর সব কাজ চলে না। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শাসনকাজ চালাবার জন্যে দরকার ছিল আরও বহুলোকের। ভারতীয়দের দ্বারা পূরণ করা হত সেই স্থান। যে-দুই শ্রেণীর ইংরেজের কথা বলা হল তাঁদের উদ্দেশ্য যে ছিল ভিন্ন তা বোধ হয় বোঝা গেল; কিন্তু একটা বিষয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে মিল ছিল: সেটা হচ্ছে এই

যে, দুইয়েরই লক্ষ্য ছিল ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত ও প্রসারিত করা। অন্যদিকে, ভারতীয় নেতারা ভেবেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন-প্রসারণে ভারতের নবজাগরণ ও মুক্তির উপায় হবে সহজ। এতে ইংরেজরা আনুকূল্যই পেয়েছিলেন তাঁদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা-প্রতিষ্ঠায়।

এঁদের সকলের উদ্দেশ্যের পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্যে ছিল ঐক্য। সকলেই এঁরা ছিলেন শিক্ষার 'সঞ্চারণ-নীতি'তে বিশ্বাসী। তাঁদের ধারণা এই ছিল যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত হলে তাঁদের অনুসরণে আরও অনেক লোক নবীন ধারার শিক্ষার আদর্শ-গ্রহণে উৎসাহিত হবে। সেইভাবে আধুনিক শিক্ষা সমাজের ওপরতলা থেকে সঞ্চারিত হয়ে সারা সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়বে। তখন মেকলে সাহেব সরকারের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির একটি খসড়া রচনা করেছিলেন; সেই অনুসারে সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মহান্ লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতীয় জনগণের মধ্যে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার; আর শিক্ষাখাতে যে-অর্থব্যয় করতে হবে তার সদ্ব্যবহার হবে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্যে ব্যয়ে।' উল্লিখিত প্রস্তাবে একথাও ছিল যে, যেখানে দেশীয় ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানেও স্কুল-কলেজের শিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ-পথে কাজ খুব বেশিদূর এগোয় নি। ইংরেজী শিক্ষালয়গুলির শিক্ষা সরকারী ও সদাগরী কাজের ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়াল; দেখতে দেখতে ঐসব কাজের প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। তার ফল এই হল যে, ঐ-নবশিক্ষিত ভারতীয়েরা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ওপর মেকলে-প্রকাশিত অবজ্ঞা পোষণ করতে লাগলেন।

সরকারী প্রচেষ্টার দিক থেকে বিচার করলে একথা বলতে হয় যে, ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র না

এলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে না বলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হল, এবং তার সংখ্যা পরপর বেড়ে চলতে থাকল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্যে আবার দরকার হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের; তারও প্রসার হতে থাকল। এ থেকে মনে হয় যে, 'সঞ্চারণ-নীতি' প্রত্যাশিত ফলের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল শিক্ষাকে।

এই ধারার শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য করছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যে ছাত্র তৈরি করে পাঠাবার দিকেই দৃষ্টি রাখছিল। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ছিল বিদেশী ভাষা, স্বদেশী ভাষা হয়েছিল উপেক্ষিত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। শিক্ষা হয়ে পড়ল পুঁথিগত; চলমান জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রইল না কোন, কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বৃত্তি ও কারিগরি-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুত প্রবেশিকা পরীক্ষা-সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির ওপর নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ওপরও আধিপত্য চালিয়ে যেতে লাগল। তখন ভালো চাকরির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রায় অব্যর্থ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আধিপত্য হয়েছিল মোক্ষম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্যের ফলে ইস্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অযথা ধীশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। তা-ও আবার বুদ্ধিশক্তির সমগ্রতার ওপর নয়। ঝোঁকটা ছিল বুদ্ধির একটা অংশ স্মৃতিশক্তির ওপর, আর ছিল ভাষাশিক্ষার ওপর। ইস্কুলে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তা নানা প্রকৃতির ছাত্রদের রুচি-ক্ষমতার উপযোগী নয়। এতে শিশু-কিশোরদের কল্পনাশক্তির স্ফুরণ এবং নানা স্তরের ব্যবহারিক কর্মপ্রতিভা-বিকাশের দিক হয়েছে অবহেলিত। ভাষা-শিক্ষায় পটু অল্পসংখ্যক ছাত্র ছাড়া ইস্কুলের শিক্ষা বেশির ভাগ ছাত্রের কাছেই প্রাণহীন, যান্ত্রিক বলে অনুভূত হয়; তাতে আনন্দ-উদ্দীপনা

ও সৃজন-প্রেরণা তারা বিশেষ কিছু পায় না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, ইস্কুলের শিক্ষা ছাত্রদের অন্তর্নিহিত শক্তিবৃত্তির স্ফুরণে অপারগ। ছাত্ররা ইস্কুলে পড়ে বটে, কিন্তু যে-সীমিত সুযোগ সেখানে আছে তারও পূর্ণ সুযোগ তারা নেয় না।

যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন তাই এ-শিক্ষা ছাত্রদের বাস্তব পৃথিবী প্রাত্যহিক জীবন-সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত করে না। ইস্কুল থেকে বেরোনোর পর তারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না; বিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে তারা বৃহত্তর সমাজে মিশতে পারে না। বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষার এই বিচ্ছেদের পরিণাম হয়েছে শোচনীয়; তাতে ব্যক্তি-মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেছে পরিবেশ থেকে। এর ফলে কৃত্রিম এক বাধার সৃষ্টি হয়ে এই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে আলাদা করে দিয়েছে সমাজের আর-সব মানুষের কাছ থেকে। এতে নষ্ট হয়েছে সমাজ-বোধ, সমাজ-সংহতি বিপর্যস্ত হয়ে সমাজ ভেঙে গেছে টুকরো-টুকরো হয়ে। অথচ সমাজ তো চাই, আর তার রক্ষার জন্যে চাই সমাজ-বোধও; চাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের উদ্‌বর্তনের জন্যই। যে-ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি তৈরী সেই ব্যষ্টিদেরই যদি সমাজ-বোধ না থাকে তো কেমন করে টিকবে সে-সমাজ বা দল? সমাজ-বোধ দরকার ব্যষ্টিজীবনের উন্নতির জন্যেও। সমষ্টির সহায়তা না পেলে ব্যক্তি-জীবন হবে নিঃসঙ্গ-নিঃসহায়; তাতে জীবন হয়ে পড়বে বিষণ্ণ-বিপন্ন। শেষ পর্যন্ত সমাজের সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে ব্যক্তিজীবনেও ধরবে ভাঙন।

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলির লম্বা ফিরিস্তি দেবার দরকার নেই। এর বেশির ভাগই অনেকের জানা, কেননা, বহু বক্তা বহুবার বক্তৃতায় ভাষণে সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তবে এই কথাটাও এখানে বলে রাখা দরকার যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিস্তর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এই শিক্ষায় শিক্ষিত বহু লোকের মধ্যে

থেকেই অনেক আদর্শ শিক্ষক ও রত্নবিশেষ ছাত্রও বেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে নিরঙ্কুশভাবে নিন্দা করা উচিত হয় না। তবে এ-ও ঠিক যে, এই ব্যবস্থার সংস্কার করা একান্ত দরকার। কিন্তু সংস্কার করা সহজ নয়; তা করতে হলে ধৈর্য ধরে দোষ-ত্রুটিগুলি বার করে তাদের অপসারণ করতে হবে। রাতারাতি এই-সব দোষ-ত্রুটির সংশোধন করে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা যাবে না—একথা মনে রাখা দরকার। তবে কাজ একটু একটু করে শুরু করে দেওয়া চাই। তাতেই দেখতে-দেখতে বেশ ভালো কাজ হয়ে উঠবে, এমন-কি কিছুকাল পরে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল রূপবদল হয়ে যাবে।

৩

এখন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ কতকগুলো সমস্যার কথা বলি। এগুলির জন্যেই সংস্কার আরও বেশি-করে হওয়া দরকার, আর এগুলির জন্যেই সংস্কার হওয়াও কঠিন। প্রথমটি হল প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্কের লক্ষণ ও লক্ষ্য-নির্ণয়। সর্বত্রই এই সমস্যা কঠিন সমস্যা। গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যে এখনও তর্কবিতর্ক শেষ হয়ে নিশ্চিত ভাবে নির্ধারিত হয় নি, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দিকটা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরস্পর জড়িত থাকবে, না, নিজস্ব খাতে বইবে তার স্রোতধারা। একসময়ে শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীরা ঠিক করেছিলেন যে, এগারো বছর পেরোলেই ছাত্রদের ভাগ করে নিতে হবে—কারা উচ্চশিক্ষার অধিকারী হবে, কারা হবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, এই মোটা হিসেবটা চোখ বুঁজে নেবার নয়। বুদ্ধি-পরিমাপের হিসেবকে এখন আর অভ্রান্ত বলে মনে করা হয় না। তাই এখন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় যাবার বয়স সম্বন্ধে অত কড়াকড়ি যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত হয় না।

ভারতে বয়সের এই সীমারেখার নির্ণয় খুবই দরকার; তার কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বুনিয়াদি-শিক্ষা দেওয়া স্থির হয়েছে। বুনিয়াদি-শিক্ষাধারায় শিক্ষা দেওয়া হয় শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে। এ-ব্যবস্থা সংগতই, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে যত সংগতই হোক, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পুঁথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয়ের সময় এর জন্যে সমস্যার উদ্‌ভব না হয়ে পারবে না। তাছাড়া, বুনিয়াদি-শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দিকটার সঙ্গে জড়িত; আর তখনই স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শিক্ষায় ভাবতত্ত্বের নীতির অবতারণা হয়। বুনিয়াদি-শিক্ষাকে যদি উদার ও মুক্ত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে ওসব সমস্যার সমাধান হবে অনেকখানি। বুনিয়াদি-শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের সঙ্গে সংগত হওয়া। জীবনে কী দেখা যায়?—দেখা যায় যে, নানা ভিন্ন পদার্থ তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আছে যেমন, তেমনি আবার এক হয়ে আছে জ্ঞানের ঐক্যে বিধৃত হয়ে। বুনিয়াদি-শিক্ষা যদি যথার্থই জীবন-সংগত হয় তো তা বাস্তবিক জগতের বৈচিত্র্য যে কোথায় তা দেখিয়ে দেবে, এবং তা করে মাধ্যমিক স্তরে যাবার পথকে করবে সুগম।

এক সম্প্রদায়ের মত হচ্ছে এই যে, শিক্ষার প্রথম আট বছর থাকবে মৌল নীতির শিক্ষা নিয়ে ব্যাপৃত, আর শিক্ষা হবে একধারার। এর পর তিন বা চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। আর-এক সম্প্রদায়ের মত হচ্ছে: প্রথম পাঁচটা বছরের শিক্ষা একধারার হওয়া দরকার। তারপর ছাত্রদের মোটামুটি দু'দলে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যারা উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক হবে তারা তিন বছর পড়বে জুনিঅর সেকেন্‌ডারি বা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক স্তরেই যাদের শিক্ষা শেষ হতে হবে তারা তিন বছরের জন্যে সিনিঅর বেসিক্ বা উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষা নেবে। তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের মত হল এই যে, এ ছাড়া ছাত্রদের আর-একটা থাক করা উচিত। এই দলের ছাত্ররা চোদ্দ

বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করবে না, তবে তারা উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার দিকে না গিয়ে যাবে দু'-তিন বছরের বৃত্তিশিক্ষা নেবার দিকে।

একমাত্র নিরাপদ নীতি হচ্ছে এই বিকল্প ধারাগুলোর সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি না রাখা। চোদ্দ বছর পর্যন্ত সকল ছাত্রই একধারার শিক্ষা নেবে—এ-নিয়ম সংগত নয়। দেখা গেছে যে, এগারো বছরে পড়বার সময় কি তারও আগে কোন কোন ছাত্রের বিশেষ প্রবৃত্তি-প্রবণতা গড়ে উঠেছে। আর, এগারো বছরের সময়ই যে বুদ্ধিমান ও অল্পবুদ্ধি ছাত্রদের আলাদা করে দিতে হবে—একথাও সংগত নয়। এগারো বছরের পরও বিভিন্ন রকমের শিক্ষাধারার ব্যবস্থা রাখা বিধেয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষের দিকে গ্রন্থগত শিক্ষা, কারিগরি অথবা বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা পাশাপাশি রাখতে হবে। এগারো থেকে চোদ্দ বছরের ভেতর একটা ধারা থেকে অন্য ধারায় যাবার পূর্ণ স্বাধীনতাও রাখতে হবে। একথাও বলা যায় যে, কোন ছাত্রের যদি চোদ্দ বছরের পরও নতুন করে কোন প্রবণতা বিশিষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে তো তখনও তার একধারার শিক্ষা থেকে অন্য ধারার শিক্ষায় যাবার বাধা থাকা ঠিক নয়।

বুনিয়াদী আর মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্কটা নির্ধারিত হলে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার সম্পর্কটাও নির্ণয় করা শক্ত হবে না। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া চাই। এই শিক্ষাধারাটিকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও বৃত্তিগত শিক্ষা ছাড়া এ-শিক্ষা জীবনের সব-রকম বৃত্তির প্রস্তুতিপর্ব হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষার মানসাম্যও থাকা চাই, যাতে ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকলে, ছাত্ররা এক পাঠধারা থেকে অন্য পাঠধারায় অথবা সংশ্লিষ্ট কোন উচ্চ-শিক্ষায় যেতে পারে।

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার আর এক সমস্যা হচ্ছে ভাষার পার্থক্য নিয়ে। এই কিছুকাল আগেও এই শিক্ষার অন্যতম প্রধান গলদ

ছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যম। এতে করে বেশির ভাগ ছাত্রের ওপর এক অযথা ভার চাপিয়ে দেয়া হত। তার ফলে অনেকেরই পূর্ণ বিকাশ হতে পেত না। তাছাড়া, এর জন্যে আর একটা দোষ ঘটেছিল : এ এক নতুন জাতিভেদের সৃষ্টি করেছিল—ইংরেজী-জানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আর ইংরেজী-না-জানা অগণিত দেশবাসী. শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়।

এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে সুরু হয়েছে ভারতীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে স্বীকার করা ; তারপর ক্রমেই এই নীতির পুষ্টি ঘটেছে। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মুক্তির পর এ-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এখন প্রায় সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে মাতৃভাষাই হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম বা মিডিঅম্। এর জন্যে আবার দু'টো নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যদিচ শিক্ষার ভাষামাধ্যম হয়েছে মাতৃভাষা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে কিন্তু রয়ে গেছে ইংরেজী ভাষা। ছাত্রেরা আপন ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে যখন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায় তখন সহসা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিতে তারা বাধ্য হয়। এতে কিছুটা অসুবিধা হয় বৈকি। অনেক ক্ষেত্রেই তারা অধ্যাপকদের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, কাজেকাজেই তাঁর সাহায্য ও উপকার-লাভ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নামিয়ে দিতে হয়েছে। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, তার অন্যতম কারণ হল, যে-লেকচার তারা শুনতে বাধ্য হয় তা বুঝতে না-পারা।

অন্যতর সমস্যা হচ্ছে ভারতের ভাষার বহুলতা। ভারতের সংবিধানে চোদ্দটি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে। তার মধ্যে তেরোটি ভাষা বলে লক্ষ লক্ষ লোকে, আর তাদের আছে সমৃদ্ধ সাহিত্য-সম্পদ। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য হবার দাবি এ-ভাষাগুলির নিশ্চয় আছে। এদেশে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে নেবার যেমন

সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধা আছে এখানে নানা ভাষা থাকার জন্যে। এই ভাষার বহুতা ভারতের জাতীয় ঐক্যকে করতে পারে শিথিল; সংহতি-বোধের অন্তরায় হতে পারে ভাষাভেদ। দেশের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে শিক্ষক ও ছাত্রদের চলাফেরা সহজ হয় না এর দরুন। ইংরেজী ভাষা বিদেশী বলে তার যত ত্রুটিই থাকুক সে ভারতে দু'টি পরম উপকার-সাধন করেছে। এ-ভাষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ঐক্যের সূত্রে গেঁথেছে এবং জাতীয়তা-বোধ জাগিয়েছে। এরই কল্যাণে শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধা হয়েছে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করার।

ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশেষ বিচার দিয়ে বিবেচনা করেছেন ভাষাসমস্যার বিষয়টি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও এ-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছেন। এ-নিয়ে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনাও কম হয় নি। সে-সবের সারমর্ম হচ্ছে এই: মাতৃভাষাকে যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মাধ্যম করতে হবে সে-বিষয়ে কোন মতান্তর নেই। মতান্তর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার স্তরে ভাষা-মাধ্যমের কথা নিয়ে। তবে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষাকে সে-হিসেবে নেবার দাবি সমর্থিত হচ্ছে। হিন্দি ভাষা ভারত-রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা বলে গৃহীত হয়েছে। ভারতের ঐক্য বজায় রাখার জন্যে এই ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে নিম্ন-বুনিয়াদি-শিক্ষার পরের স্তরে, আর তখন থেকে অন্যূন তিন বছর ধরে সে-ভাষা আবশ্যিক ভাষা-হিসেবে শিখতে হবে। এই স্তরের পরেও এ-ভাষা শেখবার সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। ইংরেজী হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা; আধুনিক বৈজ্ঞানিক চর্চা, গবেষণা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার এই ভাষা। সুতরাং এ-ভাষা শেখার সুযোগ-সুবিধাও রাখতে হবে, তবে তা রাখা যেতে পারে নিম্ন-বুনিয়াদি-শিক্ষাস্তরের পরে। সেক্ষেত্রে এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, একই বছরে যেন দু'টো ভাষার প্রবর্তন না করা

হয়। যে-সব ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার পরের ধাপে উঠতে চাইবে তাদের জন্যে হিন্দি ও ইংরেজী অবশ্য-শিক্ষণীয় পাঠ্যবিষয়-রূপে ধার্য করতে হবে। তাছাড়া, ভাষা-শিক্ষায় যাদের ঝোঁক বা অনুরাগ থাকবে তাদের জন্যে প্রাচীন ভাষা শেখারও সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে।

ভাষা-শিক্ষার এই ব্যবস্থার ফলে যে-নক্‌শাটা দাঁড়াবে তার একটু পরিচয় দেওয়া ভালো। যারা প্রাথমিক শিক্ষার পর আর এগোবে না, তারা শুধু মাতৃভাষা শিখবে। যারা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত কি তারও পর এগোবে তারা আরও দু'টি ভাষা শিখবে। তাদের মাতৃভাষা হিন্দি না হলে শিখবে হিন্দি এবং ইংরেজী ভাষা। মাতৃভাষা হিন্দি হলে অপর একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজী। ভাষা-শিক্ষায় যাদের বিশেষ ঝোঁক আছে তারা ইচ্ছা অনুসারে অতিরিক্ত ভাষা শিখতে পারে। মনে হতে পারে মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে তিনটি ভাষা শিক্ষা করা অযথা ভারস্বরূপ হয়ে উঠবে। এই তিনটি ভাষার সাহিত্য পড়তে হয় যদি তো সে হবে ভীষণ আপত্তিকর। বেশির ভাগ ছাত্রের জন্যে ব্যবস্থা হবে এই যে, দুটো ভাষা মোটামুটি কাজ চালাবার মতো শিখলেই চলবে। ভারতের এই ভাষা-সমস্যার ক্ষেত্রে এ ছাড়া কোন সমাধান মেলা ভার। বেলজিঅম্, ফ্রান্স্, সুইজারল্যাণ্ড্, রাশিআ প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার কথা জানলে বোঝা যাবে যে, ঠিক পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করতে পারলে তিনটি ভাষা শেখা কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার আর-একটি সমস্যা হচ্ছে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় কারিগরি ও বৃত্তি-শিক্ষার স্থান-নির্ণয়। শিক্ষায় ভারতের চিরাচরিত ধারা হচ্ছে ভাবপ্রধান, তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষার প্রাধান্য, ব্যবহারিক বিষয়ের নয়। জাতিবিভাগই তার প্রধান প্রমাণ: তাতে ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। শারীরিক শ্রমের কাজ

ভারতে তেমন মানমর্যাদা পায় নি। ব্রিটিশ আমলের শ্রেণীবিভাগেও সেই প্রাচীন ধারার সংশোধন হয় নি। একদা ভদ্রলোক বলতে সেই লোককে বোঝাত যিনি শারীরিক শ্রমের কাজ করেন না। ব্রিটিশ আমলে যে-শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হল তাতেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ারে-বসা কাজ ছাড়া শারীরিক শ্রমের কাজ করার ব্যবস্থা হল না। এতে করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের শারীরিক শ্রমের ওপর বিমুখতা আরও বাড়ল। এই অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা হয়েছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার-সাধনে কারিগরি ও বৃত্তি-শিক্ষার কথা যেন বাদ না পড়ে।

উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের মধ্যে থেকে বাছাই করার দরকার হয়। তার কতকগুলি নীতি আছে। এই নীতিগুলি বিশেষ বিচার-বিবেচনাব বিষয়। গ্রেট ব্রিটেনের ছাত্ররা এগারো বছর পেরোলেই তাদের বিভিন্ন থাকে ভাগ করে নেওয়া হয়। ভারতে এখনও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অতিশয় কম। এখানে ছাত্রদের অমনি থাকে ভাগ করে-নেয়ার বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া চাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একহিসেবে সুবিধার অধিকারী; দেখতে হবে এই অধিকার যেন যোগ্যতার মাপে দেয়া হয়। এই ধরনের বিদ্যালয়ে স্থানের অভাব; অতএব, মনে রাখতে হবে যে, যোগ্য ছাত্ররা যেন সুযোগ-বঞ্চিত না হয়, আর, অযোগ্যেরা অযথা জায়গা দখল না করে বসে।

একথা মানতে হবে যে, এখনও অবধি ভারতে ঠিকমতো ঐ-ধারার ছাত্র-বাছাই-এর কাজ হয় নি। এখানে মাধ্যমিক ইস্কুলে বেশির ভাগ পোড়ো ভর্তি হয়েছে এই স্তরে তাদের পড়বার যোগ্যতা আছে বলে নয়, তাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে বলে। আর, সামর্থ্যের অভাবে অনেক যোগ্য পোড়ো এই স্তরে পড়তে পায় নি। এর ফল কী হয়েছে?—নিশ্চয় দেশ সেই-সব যোগ্য পোড়ার সম্ভাব্য অবদানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে; আর, অপেক্ষাকৃত

অযোগ্য, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাদের জায়গা জুড়ে আছে। অবস্থা শোচনীয়তর হয় এই জন্যে যে, ভালো বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেশে খুবই কম; আর যা-ও বা আছে তাতে শুধু ধনিসন্তানরাই প্রবেশ-লাভের অধিকার পায়, তা তাদের যোগ্যতা থাক আর না থাক। এতে জাতির ক্ষতি হয় দু'দিক থেকে। একদিকে ধীমানদের ধীশক্তি-বিকাশের সুযোগ না-হওয়ার দরুন ক্ষতি, অপর দিকে সামান্য-প্রাপ্য সুযোগের অপব্যবহারের ক্ষতি। হাল আমলে যোগ্যতা যাতে বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা হতে শুরু হয়েছে।

৪

যত দিন যাচ্ছে ততই ধারণা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা যথার্থ হবার জন্যে তার সংস্কার-সংশোধন কত দরকার। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টার প্রধান পুরোহিত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। নবীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি তাই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করলেন নবীন পদ্ধতিতে শিক্ষাধারা ও শিক্ষায়তন গড়ে। তার ফলে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হল। শিশু-কিশোরদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা যাতে সৃজনী শক্তিতে ফুটে উঠতে পারে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে তারই ব্যবস্থা এখানে তিনি করলেন। এখানে বিভিন্ন প্রবৃত্তি-প্রকৃতির পোড়োদের জন্যে শিক্ষা-বিষয়ের বৈচিত্র্য রাখা হল। তখন অবধি শিক্ষা ছিল গ্রন্থকেন্দ্রিক, ভাবতত্ত্ব-ধর্মী; রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাকে করে তুললেন জীবন-সম্পৃক্ত, প্রকৃতি-সন্নিহিত। বিদ্যালয়ের কড়াকড়ি-বাঁধাবাঁধি তিনি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিলেন। শিশু-কিশোরেরা যাতে আপন-আপন পথে বাড়তে পায় তার মতো পরিবেশ গড়ে তুললেন। শান্তিনিকেতন ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর

স্থাপিত হলেও তা বর্তমান যুগের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে নি। প্রথমে শান্তিনিকেতন, পরে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনতীর্থ-রূপে। এখানে একথা বলা সংগত হবে যে, আধুনিক ভারতের যে-কোন রকমের শিক্ষা-সংস্কার-প্রচেষ্টার ওপর অল্পবিস্তর প্রভাব পড়েছে শান্তিনিকেতনের আদর্শের।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি-শিক্ষার উদারভিত্তিক পরিকল্পনা-পরীক্ষণাও ভারতের শিক্ষাধারায় এক নতুন আলো ফেলেছে। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ভাবধারা-বিষয়ে ভারতীয়দেব ধারণার রূপান্তর ঘটেছে। গান্ধীজীর মতে শিক্ষা হচ্ছে সেই জিনিস যা যথার্থ মুক্তি দেয়: ভয় আব অভাব থেকে মুক্তি। তাঁর মতে মৌল মুক্তি হচ্ছে ভয়-মুক্তি; কিন্তু অভাব-মুক্তি না হলে ভয়-মুক্তি হতে পারে না। বুনিয়াদি-শিক্ষাব লক্ষ্য হল সব মানুষকে এই মুক্তি দেয়া। এর জন্যে মানুষকে জীবনের জরুরী অভাব-দৈন্য মোচন করবার শিক্ষা ও সামর্থ্য দিতে হবে, আব তাদের মনে সঞ্চারিত করতে হবে এক নতুন সমাজ-সংস্থা-সংগঠনের সংকল্প। বুনিয়াদি-শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিক্ষিতেরা অর্জন করবে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম-পরিচালনার ক্ষমতা এবং আত্মনির্ভরতা, আর সহযোগের মনোভাব। কিন্তু বুনিয়াদি-শিক্ষা সমাপ্ত হবার কথা চোদ্দ বছর বয়সে; তাই জীবনের বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপার বুনিয়াদি-শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় দেয়া যায় না। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝবার মতো শক্তি চোদ্দ বছরের পোড়োদের হয় না। তাছাড়া, ঐ-বয়সে যে-জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জিত হয় তা এত নতুন থাকে যে, জীবনসত্তার সঙ্গে তা ওতপ্রোত ভাবে মিশে যায় না।

বুনিয়াদি-শিক্ষার পরবর্তী স্তরের লক্ষ্য হচ্ছে যুবক-যুবতীদের সুনাগরিক ও দায়িত্বশীল জনক-জননী করে তোলার প্রস্তুতি। এই

ধারার শিক্ষায় বৃত্তিশিল্পকর্মের শিক্ষা প্রসারিত হয় মাধ্যমিক স্তর অবধি; তাতে একদিকে ব্যবহারিক ও গ্রন্থকেন্দ্রিক শিক্ষার ভেদরেখাটা তুলে দেয়া হয়, অপরদিকে শিক্ষাকে অর্থনীতিক ভিত্তিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হয়। এতে আগাগোড়া জোর দেয়া হয় সামাজিক সম্পর্কের ওপর। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন-আপন কাজের মধ্যে দিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং নন্দন-তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ব্যক্তির মধ্যে সহযোগের মনোভাব গড়ে-তোলা।

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে শিক্ষাসংস্কারের কাজ সর্বস্তরেই নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগোতে থাকে। তখন থেকে, বিশেষ করে ১৯৪৭-এর পর থেকে, রাজ্য-সরকারগুলি শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গের সংস্কারে সাগ্রহে কাজে লাগে। অনেক রাজ্যে স্বকীয় কমিটি নিযুক্ত হয়; কমিটিগুলি মাধ্যমিক শিক্ষার বিবিধ সংস্কার ও উন্নতির উপায় নির্দেশ করে। কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার-কল্পে নানা পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা ও হিসেব-নিকেশ হলেও ১৯৫৩-র লক্ষ্মণ কমিশনের রিপোর্ট দেবার আগে সবভারতীয় দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার-পরিবর্তনের প্রয়াস দেখা যায় নি।

এই কমিশন অনেকগুলি উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছিল। তার ভেতর সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে বহুবৃত্তিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার-ব্যাপারে এই নির্দেশের উপযোগিতার কথা বলে শেষ করা যায় না। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের রকমারি না থাকলে এই শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান দোষ হচ্ছে বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা। এখন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পোড়োদের অল্পবিস্তর একই ধারার শিক্ষা নিতে বাধ্য হতে হয়। এতে তাদের বিচিত্র বিকাশের পথে বাধা না হয়েই পারে না, কেননা, একই ধারা নানা জনের রুচি-প্রবৃত্তির উপযোগী

হতে পারে না। পোড়োদের মোটামুটি এই দু'টো ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ এক, যাদের ঝোঁক হচ্ছে বাস্তবিক-ব্যবহারিক কাজকর্মের দিকে, যারা গণিত, বিজ্ঞান বা কোন-একটি ললিত কলা শিখতে আগ্রহী; আর দুই, যারা কলাবিদ্যা বা আর্টস্-সংক্রান্ত বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে ইচ্ছুক। কি ভারতে, কি অন্যান্য দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারটা হচ্ছে সবার জন্যে কতকগুলো শিক্ষণীয় বিষয়ে ঐক্য রেখে বিচিত্র বিষয় শেখার সুযোগ রাখা।

ছেলেমেয়েরা যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেয় প্রায় তখনই তারা মাধ্যমিক শিক্ষা নেয়। যৌবনের বেশি অংশটাই কাটে এই মাধ্যমিক শিক্ষা নেয়ায়। শৈশব-কৈশোরের সঙ্গে যৌবনের বেশ পার্থক্য আছে। শৈশব-কৈশোরের লক্ষণগুলি মোটামুটি সুনির্দিষ্ট এবং একধারার। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে খুব মুশকিলে পড়তে হয় না। কতকগুলো বিষয়ে তাদের কৌতূহল-নিবৃত্ত-করা জ্ঞান দিতে পারলে এবং কতকগুলো চিন্তা ও কর্মের ধারায় শিক্ষিত করতে পারলেই যথেষ্ট হয়। বয়স্কদের রীতি-প্রকৃতি অনেকখানি বাঁধাধরা পথে চলে বলে তাঁদের সঙ্গেও কমবেশি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহার চলে। কিন্তু তরুণেরা না শিশু, না বয়স্ক। আরও মুশকিলের ব্যাপার এই যে, তাদের মতিগতি, প্রকৃতি-প্রবৃত্তির পরিবর্তন হয় খুব দ্রুত গতিতে। দেহ-মন-ভাবের ওপর দিয়ে তখন তাদের যে-পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলে ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার ক্রিয়া সামান্য নয়। তাই তাদের সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা, সহানুভূতি এবং বুদ্ধিতৎপরতা রাখা দরকার। সেইজন্যেই তাদের কিশোর মনে করে প্রাথমিক শিক্ষাধারারই অনুবৃত্তি করে-চলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাধারার আগাম আমদানি করা—এই দু'টোই বিপত্তিকর।

যৌবনের সূচনা থেকে মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হতে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষার গ্রাহক হচ্ছে এই তরুণরা

সুতরাং এই শিক্ষায় তাদের বিচিত্র রুচি-প্রবৃত্তির স্ফুরণের অনুকূল ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রাথমিক শিক্ষায় একই ধারার শিক্ষা দেয়ার তবু কিছু মানে হয়, কেননা, শিশুদের মনে কতকগুলো দরকারী মৌল ধারণা-অনুমান-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। আর, তাদের রুচি-প্রবৃত্তিও তখন তেমন বিশিষ্ট হয়ে ফুটে-ওঠে না। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই ভাবের আমুল পরিবর্ত্তন ঘটে। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাদের নিহিত বিচিত্র রুচি-প্রবৃত্তির স্ফুটনের পরিবেশ করে-রাখা বিধেয়। তার জন্যে বিভিন্ন বিষয় শেখবার সুযোগ-সুবিধা রাখা একান্ত দরকার।

তরুণদের এই রুচি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের খিদে মেটাবার উদ্দেশ্যেই বহুবৃত্তিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন এমনিতেই দরকার হত; কিন্তু দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত-হিসেবে বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ার জন্যে তার প্রয়োজন হয়েছে আরও বেশি। এই শিক্ষার মূল্যবত্তা হচ্ছে মাধ্যমিক এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজকর্মের মাপে। মাধ্যমিক শিক্ষা যদি পুরোপুরি গ্রন্থগত হয় তো বুনিয়াদি-শিক্ষার পোড়োরা তা নিতে পারবে না, কেননা, তাদের শিক্ষা হয়েছে অন্যধারার। তাদের মনে এই আশা ও ধারণা থাকবে যে, প্রাথমিক স্তরে তারা যা শিখেছে তার সার্থকতা তারা খুঁজে পাবে সংলগ্ন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে। তা যদি না পায় তো তারা আশাহত হবে; একটা ব্যর্থতার আঘাতে তাদের মনের শক্তি ক্ষয়িষ্ণু হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে তারা আপন-আপন ইচ্ছা ও শক্তি-অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় বেছে নিতে পারবে—সেখানে থাকবে নির্বাচনের যথেষ্ট সুযোগ—এই-ই নিতান্ত প্রত্যাশিত। এই ব্যবস্থাই পরবর্তী স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ী এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষার বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিভূমি রচনা করবে।

তরুণদের বিভিন্ন রুচি-প্রবৃত্তির সহায়তা করার জন্যে কোন-কোন দেশে নানা ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা

অবশ্য বলা চলে না যে, এই বিষয়ে পরীক্ষণা পরিপূর্ণ সাফল্য পেয়েছে, এমন-কি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শ্রমমর্যাদা-সচেতন দেশেও। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কারিগরি ও বৃত্তি-শিক্ষাকে কখন-কখন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ভারতে চিরাচরিত নীতি হচ্ছে বৃত্তিশিক্ষার চেয়ে বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষার বেশি মূল্য দেয়া; এখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা রাখলে বৃত্তিশিক্ষার ওপর উপেক্ষা-অবজ্ঞা হত আরও দৃঢ়মূল। তাই এখানে দরকার একই মাধ্যমিক বিদ্যালেয়ে কারিগরি, কৃষি বা অন্যান্য বৃত্তির শিক্ষা-ব্যবস্থা পাশাপাশি রাখা। তাতে সব শিক্ষার প্রতি মূল্যবোধ হবে একই রকমের; কারিগরি, কৃষি ও বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার ওপর থেকে শিক্ষার্থীদের বৈমুখ্য-বৈরূপ্য যাবে কেটে।

এ থেকে বোঝা যাবে যে, বহুবৃত্তিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করবে। এক, এতে বিভিন্ন রুচি-প্রবৃত্তির পোড়োদের নিহিত শক্তিবৃত্তির স্ফুরণের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। দুই, জাতির কৃষি, বাণিজ্য-শিল্প এবং নির্মাণ-ব্যাপারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজে লোক জোগাবে এই বিদ্যালয়গুলো। তিন, দেশের শ্রম-বিষয়ক মনোভাবের বিলক্ষণ পরিবর্তন আনবে; তার ফলে যে-কোন রকমের শ্রম যথোচিত মর্যাদা পাবে।

বহুবৃত্তিক বিদ্যালয়গুলো মাধ্যমিক শিক্ষাকে করবে নবীন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত, বিভিন্ন রুচি-প্রবৃত্তির শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি-প্রতিভাকে করে দেবে বিকাশের পথ—এ আশা বাড়াবাড়ি নয়। এই জাতের বিদ্যালয়ে নানা বিষয়-শিক্ষার সুযোগ থাকায় একটার সঙ্গে আর-একটা বিষয়ও শিখতে পারবে ইচ্ছুক পোড়োরা; গ্রন্থপ্রধান জ্ঞান-অর্জনের সঙ্গে ব্যবহারিক কাজকর্ম শেখার সুবিধাও হবে। এই শিক্ষা-স্বাধীনতার সুযোগের ফলে অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের উদ্‌বৃত্ত জীবনীশক্তি পাবে প্রকাশের পথ। বিশেষ-বিশেষ শিল্পকর্ম শিক্ষা দেবার কেন্দ্রও হবে এই বিদ্যালয়গুলি। নানাবিষয়ক

শিক্ষাসুযোগে তরুণদের চরিত্রশক্তি ও নেতৃত্বগুণের পরিস্ফুটনও হয়। নানাভাবে এই ধরনের বিদ্যালয় নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। পোড়োদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখনই যখন তাদের অতিরিক্ত প্রাণশক্তিকে কর্মে ব্যাপৃত করবার ব্যবস্থা থাকে না।

বহুবৃত্তিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হচ্ছে শারীরিক শ্রমের কাজ সম্বন্ধে দেশের মানুষদের মনোভাব বদ্‌লানো। পাঠ্যসূচীতে একটি শিল্পকর্ম-শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় বলে ভুক্ত করার উদ্দেশ্যও তাই। তরুণদের মন থেকে যাতে শারীরিক শ্রমের কাজ সম্বন্ধে বিরূপতা ঘুচে যায়, যাতে তাদের ভেতর শ্রমমর্যাদাবোধ জাগে তারই জন্যে শিল্পকর্ম-শিক্ষার ওপর জোর দেয়া। কি শিক্ষা-মূল্য, কি জীবন-গঠনের সহায়ক হিসেবে শিল্পকর্ম-শিক্ষার গুরুত্ব স্মরণীয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিল্পকর্ম-শিক্ষা দেয়া হয় কিশোরদের স্নায়বিক ও বোধ-শক্তি জাগ্রত ও পুষ্ট করার জন্যে। এ-স্তরে তাদের কাজের যে কোন অর্থমূল্য আছে তা নয়। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মের আয় থেকে যাতে তাদের কিছুটা প্রয়োজন মেটে, যাতে সে-কাজ সমাজের কিছু চাহিদা মেটায় তা দেখা দরকার। মাধ্যমিক স্তরে শিল্পকর্ম-শিক্ষা দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেঃ এক, এতে পোড়োদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়; দুই, এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, কেননা, তারা বুঝতে শেখে যে, দরকার হলে তারা শিল্পকর্ম নিয়ে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে।

উক্ত কমিশনের অন্যান্য উল্লেখ্য নির্দেশের ভেতর আছে—লাইব্রেরির উন্নতি, শিক্ষাদানে দৃষ্টি ও শ্রুতি-সহায়ক উপকরণের ব্যবহার, পরীক্ষা-প্রথার সংস্কার এবং বেশি করে ক্রিয়া-পদ্ধতির অবলম্বন সম্বন্ধে নির্দেশ। গ্রন্থাগারকে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করতে হবে। পোড়োরা যাতে সাধারণ বিষয়সমূহের জ্ঞান-অর্জনের জন্যে গ্রন্থপাঠের অভ্যাস

করতে পারে—সেই ভাবে ব্যবস্থিত করতে হবে গ্রন্থাগারকে। দৃষ্টি-শ্রুতি-সহায়ক উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার বিষয় হবে স্পষ্ট ও রোচনীয়তর; তাতে শিক্ষক ও ছাত্রদেব স্বকীয় শক্তির হবে উদ্বোধন। এই-সব উপকরণকে যে বিদেশ থেকে আমদানি-করা বহুমূল্য জিনিস হতে হবে তার কোন কথা নেই। ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাধারাতেও ব্যাপকভাবে এই দৃষ্টি-শ্রুতি-সহায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান-রীতি চলে আসছে। সুতরাং সেদিক থেকে কোন বাধা নেই। তবে সে-রীতিগুলোকে কিছু যুগোপযোগী করে নেয়া চাই। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারকল্পে ঐ-কমিশন এই নির্দেশ দিয়েছে যে, কতকগুলো নির্বাচিত বিদ্যালয়কে নিজেদের পাঠ্যতালিকা এবং পঠন-পাঠন-পদ্ধতি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুবিষয়ক পাঠ্যসূচীব জন্যে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের পরিমাণ যাবে বেড়ে। শিক্ষার বিষয় ও কাজকর্মের ব্যাপারে পোড়োদের স্বাধীনতা দিতে হবে; পাঠকক্ষেব কাজে তারা নিজেরা যাতে অংশ নেয় তা করতে হবে। উঁচু শ্রেণীর পোড়োদের পড়াতে দিতে হবে নিচু শ্রেণীর পোড়োদের। তাতে ছ'টো কাজ হবে: বিদ্যালয়ের কাজ সবার পক্ষে আনন্দদায়ক হবে, আর, ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক-সংখ্যা বাড়বে।

লক্ষ্মণ কমিশনের বিস্তর নির্দেশের মধ্যে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে অতিরিক্ত আর একটি বছর যুক্ত করার কথা। এর তাৎপর্য হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তার মান উন্নত করা। অধিকাংশের পক্ষে এই স্তরটিই হচ্ছে শেষ ধাপ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট করে-তোলায় কোন কার্পণ্য থাকা ঠিক নয়। অতিরিক্ত বছরটি তরুণদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতির সুযোগ দেবে। বিবিধ উচ্চতর বৃত্তিতে প্রবেশের পক্ষেও এই বছরের শিক্ষা ও জ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করবে।

৫

একথা বলাই বাহুল্য যে, মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার রাতারাতি হতে পারে না। একান্ত সদিচ্ছা থাকলেও এখনি আরও ভালো এবং বিচিত্র বিষয়-শিক্ষার বিদ্যালয় খোলা সম্ভব নয়। ভারতে এখন ১৮,০০০ বিদ্যালয় আছে; তার মধ্যে ১০,০০০ হচ্ছে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এগুলির প্রায় সর্বত্রই আসবাবপত্র আর স্থানের অভাব: পাঠকক্ষে স্বচ্ছন্দে বসবার জায়গা নেই, নেই খেলাধুলোর জন্যে মাঠময়দান। এই-সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দক্ষিণা পান যৎকিঞ্চিৎ; প্রয়োজনীয় শিক্ষণে শিক্ষিত বা জ্ঞানের অধিকারী তাঁদের বেশির ভাগই নন। এই সংখ্যার শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় মানে উন্নীত করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ; সেই অর্থ-সামর্থ্য এদেশের এখন নেই বললেই হয়। অর্থব্যয়ের কথাটা বাদ দিলেও, উপযুক্ত মানের যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক পাওয়া দুর্ঘট। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাজ চালিয়ে না গেলে এত শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক মেলা অসম্ভব।

কিন্তু যেহেতু একই সঙ্গে সব বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন সম্ভব নয় তাই প্রত্যেক প্রদেশে কতকগুলো করে বিদ্যালয় উন্নত মানের করে-তোলা দরকার। গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশে, যেখানে সকলের জন্যে সুযোগ-সাম্যের নীতি স্বীকৃত, সেখানে শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি হলেই ঐ-নীতি ন্যায়ানুমোদিত বিবেচিত হবে। সাধারণত যা দেখা যায় তা এই যে, প্রায় সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই মোটামুটি বিদ্যালয়ী শিক্ষার শেষ হয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, রাশিআর মতো দেশগুলিতে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা দেয়া হয়। আর, মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হয় তখন থেকে। ভারতীয় সংবিধানে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা দেবার বিধান গৃহীত হয়েছে। অবশ্য, এখনও অবধি এই নীতি কাজে রূপায়িত করা যায়

নি। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও অল্পসংখ্যক মানুষের বিশেষ অধিকার হয়ে আছে। এ-ক্ষেত্রে সারা দেশের উন্নতিমূলক কাজের সুবিধা করবার জন্যে যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মান উন্নত করা হয় তবেই তা সমর্থনীয় হবে।

সম্প্রতি ভারত সরকার বাছা-বাছা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন-সাধনে সচেতন হবার বিষয় উপলব্ধি করেছে। ঠিক করা হয়েছিল যে, দেশের দশহাজার বিদ্যালয়ের ভেতর অন্তত পাঁচশো বিদ্যালয়কে ১৯৫৬ সালের জুলাই-এর মধ্যে বহুবৃত্তিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবেই। এর জন্যে চাই বহু শিক্ষক, আরও ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র। এতে নতুন পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তনা হবে; সুতরাং বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলিকেও করতে হবে সমৃদ্ধ। আরও দেড়হাজার বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটারির ব্যবস্থা করে বিজ্ঞান ও অন্যান্য ব্যবহারিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে-তোলার কথাও হয়েছে।

উত্তর-বুনিয়াদি-বিদ্যালয়গুলির স্থাপনেও সমগ্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার মান-উন্নয়নে সাহায্য হবে। এইজাতীয় বিদ্যালয়গুলি নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। শিক্ষার মহান্ আদর্শে যাঁরা ব্রতী তাঁরাই এগুলির ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। আদর্শের অনুপ্রাণনা এই বিদ্যালয়গুলির পরিবেশে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে পোড়োদের মনে। উত্তর-বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লে মাধ্যমিক শিক্ষার নগর-কেন্দ্রিকতা আসবে কমে এবং পল্লীমনা মানুষ গড়ে-ওঠার পরিমণ্ডল হবে তৈরী।

ভারত সরকারের আর-একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে কতকগুলি পাবলিক ইস্কুল স্থাপন করে চালিয়ে-যাওয়া। পাবলিক ইস্কুল—সে আবার কেমনতরো বিদ্যালয়?—এ-জাতীয় বিদ্যালয় নামে পাবলিক বা সরকারী হলেও আসলে একরকম প্রাইভেট বা বে-সরকারী বিদ্যালয়। মারকিন লেখকেরা সেইজন্যে বলেছেন, এ-নামটা দেয়া ভুল হয়েছে। সাধারণত কোন ব্যক্তি বা সংস্থাই এই ধরনের

বিদ্যালয় স্থাপন করে থাকেন। এই বিদ্যালয়গুলি আবাসিক। সচ্ছল অবস্থার লোকদের সন্তানরাই এখানে পড়তে পারে। এই বিদ্যালয়গুলোর অর্থসাচ্ছল্য থাকে ; তাই থাকে শিক্ষার্থীদের নিহিত শক্তিবৃত্তির বিকাশের নানা সুযোগ। শিক্ষার্থীদের ভেতর যাতে নেতৃত্বের গুণগুলি ফুটে ওঠে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয় এখানে। এই-সব সুবিধা থাকে বলে এই শিক্ষায়তনগুলিও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-কেন্দ্র বলে গণ্য হয়ে থাকে।

কিছুকাল আগে ভারত সরকার ভারতের উত্তর-অঞ্চলে একটি আর দক্ষিণ-অঞ্চলে একটি—এই দু'টি পাবলিক ইস্কুল স্থাপন করতে মনস্থ করেছিলেন। তখন এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন অনেকে, এমনকি, শিক্ষিত ব্যক্তিরাও। সমালোচকদের যুক্তি ছিল এই যে, এতে বৈষম্য-নীতি প্রকাশ পাবে: অথচ ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করা। এই ধরনের বিদ্যালয়-স্থাপন সংবিধান-বিরোধী হবে। সরকার কিন্তু এই সমালোচনার যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারে নি। সরকারের যুক্তি ছিল এই: অনতিবিলম্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করা যখন সম্ভব হবে না তখন যতগুলি সম্ভব উচ্চমানের বিদ্যাকেন্দ্র খোলা তবু ভালো। পুরানো ধরনের বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় এগুলি আদর্শস্বরূপ হয়ে প্রকারান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার মান-উন্নয়নে আনুকূল্য করবে।

তবে এই-সব বিদ্যালয়ে প্রবেশের মানদণ্ড হবে পোড়োদের যোগ্যতা, অর্থসামর্থ্য নয়—এ-নীতি স্বীকৃত হল। এ-নীতি যে ন্যায়সম্মত তাতে আর সন্দেহ কী? এই নীতিই তো দেশের সব পাবলিক ইস্কুলে পালিত হওয়া উচিত। একথা অবশ্য ঠিক যে, সঙ্গে-সঙ্গেই এই নীতি অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হবার কিছু-কিছু বাধা আছে। অর্থসামর্থ্যের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র যোগ্যতা-বিচারও সহজ নয়, বিশেষত কতকগুলো ক্ষেত্রে। সে যাই হোক, একটা

রীতি-পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে নিঃসন্দেহে ভালো পোড়োরা ঠাঁই পায়, আর মন্দরা না পায়। পাবলিক ইস্কুলে যোগ্যতার জন্যে কতকগুলো বৃত্তি থাকলে এই সুবিধা হয় যে, যোগ্য শিক্ষার্থীরা অর্থের অভাবে এইজাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না।

পাবলিক ইস্কুলগুলির বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, এখানে শিক্ষা হয় ব্যয়বহুল, সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে তা নয়। পাবলিক ইস্কুলে এক নতুন অনুগৃহীত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ভারতের মতো গরিব দেশে পাবলিক ইস্কুলের মতো শিক্ষানিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও পোষণ তবেই সমর্থিত হতে পারে যদি তা সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে উন্নত মান ও আদর্শের চরিত্র গড়ে তুলতে পারে পোড়োদের মধ্যে। একথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে, এই বিদ্যালয়গুলো যেন এক সুযোগ-ভোগী শ্রেণী সৃষ্টি না করে। যোগ্যতা ও প্রতিভার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কিছু মন্দ কথা নয়, কিন্তু পাবলিক ইস্কুলগুলো যদি শুধু ধনীর সন্তানদেরই লালনক্ষেত্র হয়ে ওঠে তো সংগত অভিযোগের কারণ নিশ্চয় থাকবে।

পাবলিক ইস্কুলে ব্যয়বহুলতা প্রায় অপরিহার্য। ভারতের সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো প্রকৃতপক্ষে মানসই নয়। এগুলোতে সব বিষয়েরই সংকোচ ও দৈন্য। সেখানে স্থানের অকুলোনঃ পোড়োরা পাঠকক্ষে স্বচ্ছন্দে বসতে পায় না। অথচ এই বয়সের কিশোররা যেখানে থাকবে সেখানে জায়গা সুপরিসর হওয়া দরকার। সেখানে খেলাধুলো বিরাম-বিশ্রাম করার জায়গা প্রায় ইস্কুলেই নেই। বিদ্যালয় তো শুধু পুঁথিপাঠের জন্যেই নয় পোড়োদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে সেখানে পাঠ্যবিষয়-বহির্ভূত নানা স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক কাজকর্ম এবং অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। একহিসেবে গ্রন্থজ্ঞানের চেয়ে এগুলো আরও বেশি উপকারী ও দরকারী। ক্রীড়াকৌতুক, অভিনয়,

বিতর্ক ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের নাগরিকতার শিক্ষা হয়। এর জন্যে বিদ্যালয়ে থাকা চাই যথেষ্ট স্থান, এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যার শিক্ষক। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই সাধারণ বিদ্যালয়-গুলোকে উন্নত করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ।

পাবলিক ইস্কুলে অবশ্য খরচ আরও বেশি হয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, এগুলো আবাসিক। এই আবাসিক হওয়ার ফলে পাবলিক ইস্কুলগুলো সাধারণ বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হয়। এখানে পোড়োরা শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ-দান নয়; শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। মনে হয় পাবলিক বিদ্যালয়ে আবাসের এই সুযোগই এখানকার শিক্ষাকে করে উন্নত মানের। কিন্তু এর জন্যে তো এগুলো ব্যয়বহুল হবেই।

শিক্ষাস্থানে বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা ভারত অতি প্রাচীন কালেই বুঝেছিল। পুরাকালে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বাস করত। এই ধারারই এক বিবর্তন নয় কি একালের আবাসিক বিদ্যালয়? কালক্রমে এই প্রথা উঠে যায়। কিন্তু গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় তার কিছু থেকে গিয়েছিল। এই কিছুকাল আগেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কম; তাছাড়া, তাদের আয়তন ছিল ছোট। এগুলোর বেশির ভাগ ছিল ছোটোছোটো শহরে। তাই সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে প্রায়ই ছেদ ঘটত না। সব পোড়োকেই চিনতেন সব গুরুমশায়। এমনকি, বড়ো-বড়ো শহরেও বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, ছিল না এখনকার মতো এমন বড়ো-বড়োও। বিদ্যালয়ের আয়তনের এই অল্পতার দরুন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পরিচয়ে বাধা হত না। এখন কিন্তু এসবের রদবদল হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তাদের আকার-আয়তনও তেমনি। আর-একটি লক্ষণ হচ্ছে বড়ো-বড়ো শহরে বিদ্যালয়গুলো জড়ো হওয়ার রীতি। এখনকার বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে

শিক্ষার বিপণির মতো; শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন পরিচয় নেই বললেই হয়।

সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এখনকার আর্থিক অবস্থায় ভারতের পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার সব পোড়োর জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশি সংখ্যাটাই এখন থাকবে অনাবাসিক হয়ে, তবে পাবলিক ইস্কুলের কতকগুলো ভালো-ভালো জিনিসের প্রবর্তন করা যেতে পারে এখানে। এই জন্যে কতকগুলো পরিবর্তনের পরীক্ষণ-কেন্দ্র করে পাবলিক ইস্কুলগুলো রাখার দরকার আছে।

ভারতের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাবলিক ইস্কুলগুলো যদি কিছু আনুকূল্য করে তো এদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যদি এই-সব বিদ্যালয় মনে রাখে তো এদের উঠে যাবার কোন কারণ ঘটবে না:

(১) বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি; তাই হওয়া উচিতও। সুতরাং ভারতীয় পাবলিক ইস্কুলগুলোরও ভারতীয় জীবনচর্যার অনুগত হওয়া দরকার। এই জন্যে এদের ভাবভঙ্গী ও রীতিনীতির পরিবর্তন হতে হবে। চালচলন অনেক সরলীকৃত হওয়া চাই।

(২) আপন বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে দেশের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এখনও পর্যন্ত এগুলোর ধারাধরণ হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে চলার। বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য-ধর্মিতা ভালো, কিন্তু, তাই বলে দেশের শিক্ষাধারা ও সমাজ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা কোনমতেই সংগত নয়।

(৩) পাবলিক ইস্কুলগুলোর খরচও সম্ভবমতো কমাতে হবে, অবশ্য, তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলো বজায় রেখে। সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে এদের খরচ কিছু বেশি হবেই,

তবু, এই ছু'রকম বিদ্যালয়ের ব্যয়ের তারতম্য কমিয়ে-ফেলার যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে। চালচলন সাদাসিধে করলে কিছু খরচ কমবে; অন্যদিকে আয় বাড়াবারও উপায় দেখতে হবে। কিন্তু এর জন্যে পোড়োদের বেতন বৃদ্ধি করা চলবে না, কেননা, এমনিতেই এদের বেতন খুব বেশি; এর জন্যে অনেকেই এখানে পড়তে পারে না। সরকার থেকে অবশ্য কিছু-কিছু অর্থসাহায্য মিলতে পারে, কিন্তু বুনিয়াদি-বিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার্থীদের বৃত্তিকর্মের আয়ের কথাও ভাবতে হবে। পাবলিক ইস্কুলে তো এর সুবিধা আরও বেশি আছে। পোড়োদের কাজকর্মের অল্পস্বল্প এই খাতে বইয়ে দিতে হবে। তাছাড়া, আর-একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এখানকার ছাত্রেরা বয়সে কিছু বড়োই হয়ে থাকে। কাজেকাজেই তাদের দিয়ে ভালোভাবেই বৃত্তিকর্ম করিয়ে আয় বাড়ানোর পথ সুগম হতে পারে।

(৪) সব বিদ্যালয়ের, বিশেষ করে পাবলিক ইস্কুলের আদর্শ হওয়া উচিত সুযোগ-সাম্যের ব্যবস্থা। একথা তো বলা হয়ে থাকে যে, শিশুরা হচ্ছে জাতির সম্পদ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমাজের যথেষ্ট উপকারে যেন লাগে এই সম্পদ। তার জন্যে সব ছেলেমেয়ের ক্ষমতা-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগ রাখতে হবে। এ ছাড়া, অন্য কোন উপায়ে মানব-সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার হতে পারে না। এতে যে নির্বিশেষে সাম্য এনে ফেলা হবে তা নয়। এ-ধরনের সাম্য-প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের লক্ষ্যও হতে পারে না। কেননা, তাদের রুচি-প্রবৃত্তি আর যোগ্যতার পার্থক্য থাকবেই। সমাজে সুযোগ-সাম্যের ব্যবস্থা রেখে গণতান্ত্রিক সংহতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের কাজ।

৬

ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতিতে দু'টি প্রধান বাধা হচ্ছে অর্থ এবং গুণী শিক্ষকের অভাব। এইজন্যেই এখানে শিক্ষা-সংস্কারের বিষয়টি আরও বেশি করে সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার। এই-সব সমস্যার বিচার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তিপর্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা করে এই পর্ষৎ-এ একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে:

(ক) প্রথম ডিগ্রি কোর্স বা উপাধি-অধিকারের পাঠকাল হবে তিন বছরের। ১৭ বছর বয়স পেরোলে যোগ্যতা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের।

(খ) ১৭ বছর বয়সের পূর্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ ধাপে পৌঁছলে শিক্ষারও মোটামুটি শেষ হয়ে সংসারযাত্রার জন্যে তৈরি করে-তোলা চাই। আর, ইচ্ছুক পোড়োরা যাতে তিন বছরের উপাধি-পাঠ গ্রহণ করার যথেষ্ট যোগ্য হয় তার মানও নির্ধারণ করবে এই মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) ঐ-লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে ইস্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক অন্ত্যপরীক্ষার সিলেবাস তৈরি করার জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করার অনুরোধ করা হোক ভারত সরকারকে।

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণীটির নাম হবে একাদশ শ্রেণী। দশ বছরের কম বিদ্যালয়ী শিক্ষা হলে এই শ্রেণীতে পড়তে দেয়া হবে না। বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যালয়ী শিক্ষার কালপর্ব রাজ্য সরকারগুলি ঠিক করতে পারবে।

প্রায় অনুরূপ অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর প্রধানেরা দিল্লীতে এক সম্মেলনে সমবেত হয়ে এক

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে পাটনায় আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষৎ-এর এক অধিবেশনে ঐ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বলা যেতে পারে যে, প্রায় ৪০ বছর পর মাধ্যমিক শিক্ষার মোটমাট ছক আর তিন বছরের উপাধি-পাঠ-বিষয়ে কর্তাব্যক্তিদের মতের ঐক্য দেখা গেল।

রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎগুলি যে-ছক শেষ পর্যন্ত নিয়েছে তা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার জন্য নিযুক্ত রাধাকৃষ্ণন কমিশন অথবা লক্ষ্মণস্বামী কমিশনের নির্দেশিত ছক থেকে কিছু আলাদা। মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার জন্যে নিযুক্ত রাধাকৃষ্ণন কমিশন এখনকার ইন্‌টারমিডিএট্ পরীক্ষার পর পাঠ্য তিন বছরের উপাধি-পাঠের নির্দেশ দিয়েছিল। আর, লক্ষ্মণস্বামী কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল ইন্‌টারমিডিএট্ পরীক্ষা তুলে দিয়ে তিন বছরের উপাধি-পাঠের আগে বার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে।

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের নির্দেশ ছিল উপাধি-পাঠের জন্যে ইন্‌টারমিডিএট্ স্তরটি রাখার। কিন্তু এ-নির্দেশ গৃহীত হয় নি, তার কারণ, এটি রাখলে মাত্র দু'বছরের ভেতর দু'টি পরীক্ষা দিতে হয়; তাতে অসুবিধা হয় খুব। তাই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষৎ এটি গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। একথা প্রায় সকলেরই জানা যে, পরীক্ষার দু'-তিন মাস আগে থেকে পোড়োরা বিদ্যাভবনের নিয়মিত কাজকর্মে শৈথিল্য করে, সব উদ্যম আর সময় ঢেলে দেয় পরীক্ষার পাঠ-প্রস্তুতিতে। তাদেব পরীক্ষার পড়া যাতে ভালো ভাবে হয় তার জন্যে অনেক শিক্ষায়তনে তাদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়া হয়। তার পর পরীক্ষা শেষ হলে তার ফল বেরোবার অপেক্ষায় কাটে আরও ৩-৪ মাস। ফল বেরোলে ভর্তি হবার চেষ্টায় আর পড়াশোনা শুরু হতেও অন্তত আর-এক মাস যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটা পাবলিক পরীক্ষায় ছ'-সাত মাস নষ্ট হয়।

তাছাড়া, এইরকম পরীক্ষায় পোড়োদের শ্রম ও উদ্‌বেগে যে-শক্তিক্ষয় হয় তার কথাও ভুললে চলবে না। ইন্‌টারমিডিএট্‌ স্তরটি রাখার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ছিল এই যে, শিক্ষাধারায় এর কোন বৈশিষ্ট্য বা সার্থকতা স্বীকৃত হয় নি; জাতির দিক থেকে একে অপচয় বলেই মনে করা হয়েছিল।

লক্ষ্মণস্বামী কমিশনের চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ক নির্দেশটিও গৃহীত হয় নি। তার কারণ এই: ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে যে, সব ছেলেমেয়ের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। তার পর চার বছরের একটা ধারাবাহিক মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থাকলে ইস্কুল ছাড়ার বয়স দাঁড়ায় ১৮; আর, ২১ বছরের আগে উপাধি নেয়া হয় না। লক্ষ্মণ কমিশনেই স্বীকৃত হয়েছে যে, পোড়োদের অভিভাবক ও শিক্ষকেরা ইস্কুল ছাড়ার বয়স ১৭ কি তার একটু কিছু বেশির পর আর বাড়াতে দিতে চান না। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ-এর আলোচনা-সভায় উপস্থিত রাজ্য-সরকারগুলির প্রতিনিধিরাও এই বয়স ১৮ হতে দিতে রাজী হন নি। এমনকি, ১৭ কি তার কিছু ওপর হলেও আর্থিক ও অন্যান্য নানা অসুবিধা দেখা দেবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর শেষ হবার আগে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কালপর্ব সম্বন্ধে লক্ষ্মণস্বামী কমিশনের বিবরণে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এই কমিশনের একটা নির্দেশ ছিল এই যে, আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষার পর চার বছরের একটা শিক্ষার স্তর থাকবে। তার পর আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার স্তর; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার আগে শিক্ষার কালপর্বটা হবে বারো বছরের। এর আর-একটা নির্দেশ এই ছিল যে, যে-সব রাজ্যে ইস্কুল-ছাড়ার সার্টিফিকেট্‌ নেবার সময় হচ্ছে দশ বছরের শেষে সেখানে শিক্ষাস্তরটিকে আর-একটা বছর বাড়িয়ে দিতে হবে। তার মানে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা নেবার আগে শিক্ষার কালপর্বটা হবে এগারো বছরের। অবশ্য,

বিভিন্ন রাজ্যে বিত্থালয়ী শিক্ষার গঠনব্যবস্থার পার্থক্যের জন্যে এই কমিশনকে অমন ছু'রকম নির্দেশ দিতে হয়েছে। কোন-কোন রাজ্যে ছিল চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, কোন-কোনটায় পাঁচ বছরের। কোন-কোন রাজ্যে মাঝের স্তরটা ছিল তিন, কোথাও চার, কোথাও পাঁচ বছরের। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটির পার্থক্য ছিল রাজ্যে-রাজ্যে।

এই পার্থক্য চলতে থাকলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ঐক্য বা সাদৃশ্য আনা খুবই কঠিন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার বয়স ও সেই শিক্ষার মান নির্ধারণ করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে বিবেচিত হল। ইওরোপে অনেক দেশে ১৮ বছর বয়সটাই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার কাল। ভারতে এটা গ্রহণ করার অসুবিধা আছে। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া, ভারতীয়দের আয়ু অপেক্ষাকৃত কম, তবে তাদের বুদ্ধি-পরিণতিও হয় ইওরোপীয়দের চেয়ে কিছু আগে। সুতরাং ১৭ কি তার কিঞ্চিদূর্ধ্ব বয়সকেই এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ কালসীমা বলে ধরা ভালো। এতে সব রাজ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষাব স্তরে পোড়োরা এখনও অবধি যে-সময় পায় তার চেয়ে বেশি সময় পাবে।

অর্থাভাবের যুক্তিতে কেউ-কেউ এতে আপত্তি করেন। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র বিশ্ববিত্থালয়ী শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব না হয়ে যদি মোটামুটি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ পেতে হয় তো ঐ-সময়েই তার পরিণাম-সীমা নিরূপিত হওয়া শ্রেয়। ঐ-শিক্ষা পেয়ে যাতে ছেলেমেয়েদের বেশির ভাগ কাজে লেগে যেতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যথাযোগ্য দায়িত্বের অংশ নিতে পারে তারই ব্যবস্থা হওয়া সংগত। মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের পরিণাম-সীমা ১৭ বছর কি তার কিছু বেশিতে না ধরা হলে একদিকে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রার জন্যে তৈরি করে দেওয়া, আর, অন্যদিকে অল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে গড়ে-তোলা—মাধ্যমিক শিক্ষার এই ছু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

যে-সব রাজ্যে ইস্কুলে এগারো বছরের পাঠকাল নির্ধারিত আছে সেখান থেকে এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছিল। বলা হয়েছিল এই যে, এই-সব জায়গায় বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালের বিস্তৃতি হবে না। আরও যুক্তি ছিল এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার আগে ইন্টারমিডিএট্ পড়তে হয়, তাই সেখানে এটা তুলে দিলে মান নীচে নেমে যাবে, ওঠা তো দূরের কথা। কিন্তু এ-আপত্তি-যুক্তি শক্ত নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ ইচ্ছে করেই জোর দিয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার বয়সটার ওপর। যে-সব রাজ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে এগারো বছর পড়তে হয় সে-সব জায়গাতেও পোড়োদের বয়স থাকে পনেরো থেকে ষোলোর ভেতর। এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ-একই অবস্থায় তাদের বয়স ১৭ কি তার কিছু বেশি হলে শিক্ষার মান নিশ্চয় উন্নততর হবে। তাছাড়া, আর-একটা পাবলিক পরীক্ষা থাকবে না বলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষার কালটা আরও অন্তত মাস ছয় বেশি পাওয়া যাবে। আর, পাঠ্যবিষয়সূচীকে যদি অদলবদল করে গুছিয়ে নেয়া যায়, মাতৃভাষাকে করা যায় শিক্ষার মাধ্যম তাহলে শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে। এইভাবে ইস্কুল-ছাড়াব বয়স-সীমা বাড়িয়ে দিলে শিক্ষার্থীরা তখন শরীরে-মনে পরিণত হয়ে কলেজী শিক্ষা নেবার যথার্থ উপযুক্ত হবে।

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের ইন্টার্মিডিএট্ স্তরটি রাখা এবং লক্ষ্মণস্বামী কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষার কাল-পরিমাণ-বিষয়ে নির্দেশ-গ্রহণে ভারতসরকারের যে অস্বীকৃতি তা কিন্তু বাহ্য। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের ইন্টার্মিডিএট্ পরীক্ষার স্তরটি রাখার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে শিক্ষার মান না নেমে-যেতে দেয়া। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ-এ এখনকার ইন্টার্মিডিএট্ স্তর শেষ করার বয়সটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স বলে ধার্য করা হয়েছে; কিন্তু তার সঙ্গেও এ-ও দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে যে, ঐ-একই সময়ে

সিলেবাসের এবং শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যাতে ঐ একই সময়ে শিক্ষার মান ওঠানো যায়। একথা এখানে মনে রাখা ভালো যে, ইওরোপে বা যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিত্থালয়ে প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদের মান আমাদের ইন্‌টার্‌মিডিএট্‌ স্তরের মানের চেয়ে উঁচু। কিন্তু একথা মনে করবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই যে, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ও-সব দেশের শিক্ষার্থীদের চেয়ে কম বুদ্ধিমন্ত। তাহলে এটা সপ্রত্যয়ে আশা করা যায় যে, আমাদের সিলেবাস আর শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারসাধন করলে এদেশের পোড়োরাও পাশ্চাত্ত্য দেশের পোড়োদের মতোই উন্নত মানে পৌঁছবে।

লক্ষ্মণস্বামী কমিশনের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার পর চার বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার একটা স্তর থাকবে; এই চার বছরের ভেতর প্রথম বছরটা হবে সূচনার: শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি-নিরূপণেই তা কেটে যাবে। কিন্তু এটা তো আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষার শেষের দিকে কি তার কিছু আগেও হতে পারে। আমার মত হচ্ছে এই যে, এ-বিষয়ে যথেষ্ট ছাড় থাকা ভালো, যেন শিক্ষার্থীরা ইস্কুলে যে-কোন সময়ে এক ধারার পাঠ-থেকে অন্য ধারার পাঠের বিষয় বদলাতে পারে। বেশির ভাগ পোড়োর পক্ষে ১৩-১৪ বছর বয়সটাই হবে এই পরিবর্তনের সময়। তাতে এই সুবিধা হবে যে, যারা মাধ্যমিক শিক্ষা নেবে তারা পছন্দমতো বিষয় চার-পাঁচ বছর ধরে শেখবার সুযোগ পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে যে-সব পোড়োকে বাছাই করে নেয়া হবে তারা সংখ্যায় হবে খুব কম।

এই কারণেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের শেষ সীমা ধার্য করেছে কিঞ্চিদধিক ১৭ বছর। পর্ষৎ-এর নির্দেশ হচ্ছে এই যে, সব রাজ্যেই প্রাক্‌-বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষা হবে এগারো বছরের। কোন্‌ রাজ্যে বিত্থালয়-শিক্ষার এই কালব্যাপ্তিটা ঠিক কী হবে তা ঠিক করবে রাজ্যগুলি। যদি কোন বিত্থালয়

একাদশ শ্রেণীর আগে এগারো বছরের বিদ্যালয়-শিক্ষা রাখতে চায় তবে তা করতে পারে পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যালয়-শিক্ষা সুরু করে। তবে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার বয়স এবং শিক্ষার মান হবে এক। শিক্ষাধারার সংস্কারের ক্রান্তিকালে এইরকম ব্যবস্থাই সুবিধাজনক; কেননা, তাতে বর্তমান ব্যবস্থার রদবদল করতে হবে খুব কম। সারা ভারতে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাধারার মান যাতে একরকম হয় তার জন্যে এই উপদেষ্টা পর্ষৎ নির্দেশ দিয়েছে যে, একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে তাকে দিয়ে এমন-একটি সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ সিলেবাস তৈরি করাতে হবে যা সর্বত্র প্রযোজ্য ও কার্যকর হয়। একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, অঞ্চলভেদে ভারতের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি-প্রতিভার তারতম্য হয়। তাই সর্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের একই শেষসীমা নির্ধারিত করে দিলে শিক্ষাও একই রকমের হওয়া স্বাভাবিক। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠন-ব্যাপার একটা বিরাট কাজ। প্রধানত এর দায়িত্ব সরকারের হলেও এ-বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ-অনুরাগও খুব দরকার। এখনকার দু'হাজার বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা আগে বলা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলো মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে উন্নীত হলেও বেশির ভাগ বিদ্যালয় থাকবে অনুন্নীত। ক্রান্তিকালে অবশ্য দু'রকমের বিদ্যালয় পাশাপাশি না থেকে পারে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সোজা গিয়ে ভর্তি হতে পারবে তিন বছরের উপাধিপাঠের জন্যে। আর, এখনকার বিদ্যালয়-গুলোর ছাত্রদের তার জন্যে আর-একটা বছরের পড়া পড়তে হবে। বর্তমান ব্যবস্থার রদবদল যাতে যতটা সম্ভব কম হয় তার জন্যে কলেজে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার জন্যে একটা বছর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; পরিবর্তন হবে শুধু এইটুকু যে, আগেকার কলেজীয় শিক্ষার ২+২=৪ বছরের জায়গায় হবে ১+৩=৪ বছর। যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের উপাধি-পাঠ আছে সেখানেও ইস্কুলের সঙ্গে এক বছর জুড়ে দেওয়ার চেয়ে কলেজের সঙ্গে দেওয়াই ভালো।

এ-সম্পর্কে আর একটি মত হচ্ছে এই যে, এই অতিরিক্ত বছরটি ইস্কুলে থাকাই ভালো; কারণ, এই বছরের শিক্ষাটি ইস্কুলের শিক্ষাধারারই অনুযায়ী হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অধ্যাপক একশো কি তারও বেশি পোড়োর অধ্যাপনা করতে পারেন; সেখানে তারা আপন-আপন বুদ্ধিমতে প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করতে পারে তা থেকে। ইস্কুলে কিন্তু তা হবার নয়। সেখানে শিক্ষক প্রত্যেকটি পোড়োর ওপর স্বতন্ত্র দৃষ্টি রাখবেন এবং প্রত্যেককে ঠিক-ঠিক পথে পরিচালিত করবেন এটাই প্রত্যাশিত। এইজন্যেই ইস্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৩০ থেকে ৪০-এর বেশি থাকবার কথা নয়, কিন্তু কলেজে তার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ ছাত্রসংখ্যা থাকতে পারে। এই বছরটি ইস্কুলে রাখার আর একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর বছর হওয়ায় সেখানে এটি যে যত্ন পাবে কলেজে তা কখনও পেতে পাবে না। তাছাড়া, এই বছরটি ইস্কুলে কাটলে পোড়োদের ভেতর নেতৃত্ব-গুণ-বিকাশের যে-সুযোগ হতে পারবে কলেজে তা হওয়া সম্ভব নয়। এ-বিষয়টা রাজ্যসরকারগুলোর হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। সেই সরকারগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পরামর্শ করে পরিস্থিতি বুঝে ঠিক করতে পারবে কোথায় ঐ-বছরটি রাখা ভালো হবে।

৭

শিক্ষার সব স্তরেই শিক্ষকদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে তা আরও বেশি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁদের দায়িত্ব অনেক; কেননা, তাঁরাই শিশুদের নিহিত শক্তিকে ভাবী বিকাশের পথে চালিত করবেন। শৈশবেই মোটের ওপর মানুষ বেশি বশ্য ও সত্যনিষ্ঠ থাকে। শিক্ষকরা যে-নিয়ম-নীতি শিশুদের পালনের জন্যে প্রবর্তন করেন তারা তা প্রায়ই মেনে চলে। পক্ষান্তরে উচ্চতর শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমেই শিক্ষার্থীরা

স্বাতন্ত্র্যধর্মী হয়ে ওঠে। তখন তারা নিজেরাই পড়ে নেয়, শুধু মোটামুটি কতকগুলো হদিস পাবার বেলায় অধ্যাপকদের সাহায্য-প্রার্থী হয়। তাছাড়া, তখন তো তারা বড়োও হয়; তাই সর্বদাই তাদের ওপর লক্ষ্য রাখবার দরকার করে না। মাধ্যমিক স্তরের পোড়োদের প্রাথমিক শিক্ষার পোড়োদের মতো নির্ভরতা-বশ্যতাও থাকে না, আবার, কলেজের পোড়োদের মতো বুদ্ধির পরিণতি ও ব্যক্তিত্ববোধও হয় না। তাদের মতিগতি হয় উদ্দাম উচ্ছল। প্রাচীন বিষয়ের ওপর তাদের মনে জন্মায় অবিশ্বাস ও তুচ্ছতা-বোধ। তারুণ্যের উজ্জীবন্ত আদর্শের অনুপ্রাণনায় তারা পুরোনোকে ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায় মনের মতো করে। সেইজন্যেই এই স্তরে শিক্ষকদের যতখানি ধৈর্য, জ্ঞান ও বুদ্ধির দরকার, তত বোধ হয় আর কোন স্তরে নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারে প্রধানশিক্ষকের স্থানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল এবং ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনার স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে তাঁর ওপর। প্রধানশিক্ষক যদি তৎপর, ত্বরিতকর্মা, সহানুভূতিশীল হন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও মান উন্নত না হয়ে পারে না। আর তা না হলে ভালো-ভালো শিক্ষক থাকলেও তাঁরা কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা পান না। দেখা যায় অনেক প্রধানশিক্ষক প্রথমটায় কাজ বেশ ভালো করেই শুরু করেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থাপনার নানা অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন, আর রুটিন-বাঁধা কাজের গতানুগতিকতা থাকার জন্যে তাঁদের উদ্যম-উৎসাহ আসে ঝিমিয়ে। তখন তাঁরা ধরাবাঁধা নিয়মে যান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয়ের কাজ চালিয়ে যান।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই-সব বাধাবিপত্তি ছাড়া আছে পাঠন-বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে তবু বিষয়ের পরিধি ও প্রকারকে বাড়িয়ে নেবার সুযোগ থাকে। বিদ্যালয়ে তার সুযোগ নেই বললেই হয়। মামুলী জ্ঞানের বিষয়ই সাধারণত শেখানো

হয় সেখানে। শিক্ষকের পক্ষে নতুন-নতুন বিষয়ের অবতারণার সুযোগ থাকে না বললেই হয়ঃ তাই তাঁদের মনের সজীবতাও যায় শুকিয়ে, তাঁদের কাজে এসে পড়ে নিষ্প্রাণ একঘেয়েমি। শিক্ষকের মন যদি হারিয়ে ফেলে কাজের উৎসাহ-আগ্রহ তবে পোড়োদের মনে সে-মন উৎসাহসঞ্চার করবে কেমন করে! সুতরাং সবার আগে শিক্ষকদের মনে যাতে কোনরকমে ছকবাঁধা কাজের একঘেয়েমির জন্যে অনুৎসাহ ও বিরক্তি না আসে, বরং যাতে আসে নবনব জ্ঞান ও আনন্দ-লাভের প্রেরণা, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভারতে এ-বিষয়ে হালে একটা চেষ্টা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা হল ২,০০,০০০। এত এত শিক্ষকের কাজের একঘেয়েমি ঘোচাবার জন্যে জীবনে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ আনাব যথেষ্ট ব্যবস্থা করা সোজা কথা নয়। কিন্তু এ-কাজ কোথাও শুরু না করলে তো নয়। তাই প্রথমে প্রধানশিক্ষকদের নিয়েই এই অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের প্রধানশিক্ষকদের মিলিত হয়ে নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ দেবার জন্যে ১৯৫৬ সালে গ্রীষ্ম-অবকাশে সিমলায় এক শিবিরের অধিবেশন হয়। এতে তাঁদের গতানুগতিক কাজের খাঁচা থেকে নতুন পরিবেশে ছাড়া পাবার সুযোগ হয়েছিল। শিক্ষকদের আথিক অবস্থা এমন সচ্ছল নয় যে, তাঁরা প্রায়ই ভ্রমণে বেরোতে পারেন। এমন প্রধানশিক্ষকও খুব কম আছেন যাঁরা আপন প্রদেশের বাইরে যাবার সুযোগ করে নিতে পারেন; আর কিছুদিনের জন্যেও শৈলাবাসে বাস করা—সে এক সুদূরপরাহত কল্পনা। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এইরকম সুযোগ-সুবিধা হলে তাঁদের কাজকর্মে উৎসাহ-আগ্রহ বাড়া, পরিকল্পনা-চেষ্টায় উদ্‌বোধিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রধানশিক্ষকরা যদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে মাঝে মাঝে সমবেত হতে পারেন তো তাতে জাতীয়তার ভাবও

সংসক্ত হবে। সারা ভারতে শিক্ষার তত্ত্ব, আদর্শ ও কাজকর্ম-বিষয়ে একটা মোটামুটি ঐক্য আনতেও সাহায্য করবে প্রধান-শিক্ষকদের এই সম্মেলন।

এইরকম আলোচনা-শিবির খোলার আরও কারণ আছে। সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতে হয় যে, বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কোন কোন প্রধানশিক্ষক অঞ্চলে-অঞ্চলে যথার্থই ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের সেই কাজের কথা তাঁদের নিকট প্রতিবেশের লোক ছাড়া বেশি কেউ বড়ো-একটা জানেন না। এইরকম ধারার মানুষেরা যদি একত্রিত হন তো অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ফলে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতর ও বিস্তৃততর হবে। এই আলোচনা-শিবিরে কয়েকজন করে শ্রেষ্ঠ প্রধানশিক্ষককে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল রাজ্যসরকারগুলিকে। এর জন্যে রাজ্যসরকারের যে বেছে-নেয়া তা যোগ্যতারই একরকম স্বীকৃতি। এতে আরও অনেক প্রধানশিক্ষক নিজেদের বিদ্যালয়ের মান উন্নত করতে উৎসাহিত হবেন।

এই আলোচনা-শিবির খোলায় যথেষ্ট সুফল ফলেছিল। তাই একে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের একটি অঙ্গ বলে ধরে-নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯৫৪-তে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দশটি আন্তঃরাজ্য শিবির খোলা হয়েছিল, ১৯৫৫-তে আরও দশটি খোলার কথা। রাজ্যসরকারগুলিও এইরকম আলোচনা-শিবির খোলার কাজ শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, পরবর্তী পাঁচ বছরের ভেতর তিন থেকে চারহাজার প্রধানশিক্ষক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার-ব্যবস্থাপিত আলোচনা-শিবিরে যেতে পারবেন।

প্রধানশিক্ষকদের এই সমাবেশ যে বেশ সুফলদায়ী তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এখন এই কথাটাও বোঝা যাচ্ছে যে, এর পূর্ণ সাফল্যের জন্যে সরকারের শিক্ষা-বিভাগের আধিকারিক ও পরিদর্শকদেরও যোগ থাকা দরকার এর সঙ্গে। প্রধান-

শিক্ষকরা না-হয় পরিবর্তন ও পরীক্ষণার প্রস্তাব করতে পারেন, কিন্তু সরকারের শিক্ষাধিকার এবং বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ যদি তা গ্রহণ না করেন তবে প্রধানশিক্ষকদের নৈরাশ্য আসতে বাধ্য। তাই এই-সব শিবিরে শিক্ষা-বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতি দরকার। সিমলায় অনুষ্ঠিত প্রথম আলোচনা-শিবিরে রাজ্যসরকারগুলির শিক্ষাধিকারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল অন্তত কিছুটা সময় উপস্থিত থাকবার জন্যে। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫-র আঞ্চলিক আলোচনা-শিবিরে বিশেষ করে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সরকারী শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শকদের। রাজ্যসরকারগুলিও এমন ব্যবস্থা করছে যাতে এঁরা সেখানে যেতে পারেন। তাছাড়া, এই আলোচনা-শিবিরগুলিতে শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য প্রভৃতির মতো শিক্ষাজগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও গিয়েছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি বেশি সময়ের জন্যে না হলেও তাতেই প্রধানশিক্ষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

ট্রেনিং কলেজ বা শিক্ষণ-শিক্ষায়তনগুলির অধ্যক্ষদেরও আলোচনা-সম্মেলনের ব্যবস্থা এবং কাজ শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়ে সম্মেলন-শিবির খোলা সম্ভব হয়নি। তার কারণ আগেই বলা হয়েছে। তবে একই দিকের কাছাকাছি বিদ্যালয়গুলির একই বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে সপ্তাহান্তিক আলোচনা করার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ভারতের মতো বহুপ্রদেশ-সমন্বিত বিশাল দেশে এ-বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করতে সময় লাগবে। এইজন্যেই এখন শিক্ষণ-নিকেতনগুলির দিকেই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এই-সব শিক্ষণ-নিকেতনের অধ্যক্ষরা যদি প্রধানশিক্ষকদের শিবিরে যান এবং নিজেদেরও বিশেষ অধিবেশন করেন তবে তাঁরা প্রধানশিক্ষকদের অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির কথা ঠিক বুঝতে পারবেন; এতে শিক্ষণ-নিকেতনগুলির বাতাবরণের পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করবেন।

শিক্ষণ-নিকেতনগুলিকে সার্থকতর করে তোলবার জন্যে আর-একটা উল্লেখ্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বাছা-বাছা কতকগুলো শিক্ষণ-নিকেতনে শিক্ষণ-প্রসারের কাজ করাব প্রস্তাব হয়েছে। এই প্রস্তাব-অনুযায়ী ব্যবস্থা এই হবে যে, শিক্ষণ-নিকেতনগুলি আপন-আপন এলাকার বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এতে করে দুটো কাজ হবে। এখনও অবধি এই নিকেতনগুলিতে বিদ্যালয়ের কোন-কোন শিক্ষক বা শিক্ষকতাবৃত্তি-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা শিক্ষণ নিতে আসেন। কিন্তু এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেকটি শিক্ষণ-নিকেতন এলাকার সব বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। তাতে বিদ্যালয়সমূহের সব শিক্ষকই শিক্ষণ পাবেন; অর্থাৎ, তাতে শিক্ষণ-নিকেতনগুলিই প্রসারিত হবে বিদ্যালয়ে। তাতে শিক্ষাপদ্ধতির অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা-জগতে এক নীরব বিপ্লব ঘটে যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক শিক্ষার কথা

শিক্ষার অধিকার যে সকলেরই অধিকার, আর সে-অধিকার দেওয়া যে রাষ্ট্রের কর্তব্য—এই নীতিটি মাত্র এই সাম্প্রতিক কালে স্বীকৃত হয়েছে। এটা সত্যিই খুব লজ্জার বিষয় যে, এই নীতিকে স্বীকৃতি দিতে মানবসমাজের এত বিলম্ব ঘটেছে। সারা সৃষ্টিতে মানুষের স্থান কোথায়? শারীরিক শক্তিতে সে মোটেই অসাধারণ নয়; অনেক পশুই তাতে অনেক বেশি ওপরে। তবে সে যে আজ সবার ওপর আধিপত্য করছে—তা কিসের কল্যাণে?—সে কেবল তার একটা বিশেষ ক্ষমতার। তা হল তার অভিজ্ঞতা আহরণ করার ক্ষমতা: অন্যের থেকে, অতীত থেকে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন করার শক্তি। এই তো শিক্ষা। কেননা, আদিম যুগ থেকে ব্যক্তি ও সমাজের অভিজ্ঞতা-বিস্তারের যে প্রক্রিয়া তাকেই তো বলে শিক্ষা।

এই অর্থে শিক্ষা মানবসমাজের প্রগতি, চাই কি, উদ্‌বর্তনের নির্ভর। এই কথাটি কিন্তু অতীতে তেমন স্বীকৃতি পায় নি। পায় নি, তার কারণ—অতীতে মানবসমাজের গঠন অধিকাংশেই ছিল বিভিন্ন বিষম থাকে সাজানো। অতীতের মানবসমাজ ছিল কোথাও একরাজতন্ত্রী, কোথাও অভিজাত-তন্ত্রী, কোথাও সংখ্যাল্প-শাসন-তন্ত্রী। কিন্তু এর সর্বত্রই ছিল স্তরবিন্যাস, শ্রেণীবিভাগ। সমাজের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করতেন অল্পসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এমন সমাজে সকল লোকের কাছে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার বিষয় না পৌঁছলেও হয়তো তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু, এখন আর সে-অবস্থা নেই। অবশ্য, এখনও সেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, যাঁরা প্রধান ও অগ্রণী, তাঁরাই বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি রচনা করেন: তাহলেও এখন তাঁদের নির্ভর করতে হয় জনসাধারণের

সম্মতির ওপর। খুব জবরদস্ত ডিক্টেটরও এখন আর জনমতের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পান না। এ হয়তো হতে পারে যে, বিশেষ কোন ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত কখন-সখন গৃহীত হল, কিন্তু রাষ্ট্রের স্থায়ী ও মৌল নীতি-বিষয়ে জনগণের সম্মতি-সমর্থনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

অর্থাৎ, কথাটা এই যে, গণশিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। শিক্ষা সারা সমাজে বিকীর্ণ না হলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। ভারত এখন গণতন্ত্রী দেশ। তাই এখানে এখন শিক্ষার অধিকার হওয়া চাই সর্বজনীন। সমাজের সব মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানকে যে বিশিষ্ট হতে হবে বা তা যে হতে পারবে তা নয়, তবে প্রায় সকলেরই এমন সাধারণ শিক্ষা থাকা দরকার যাতে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল সমস্যাগুলো তাঁরা বুঝতে পারেন। বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকারী যাঁরা তাঁরা না-হয় আপন-আপন পদাধিকার-অনুযায়ী তার ব্যবহার করবেন। কিন্তু আধুনিক যুগের দাবীতে বিশেষ ও সাধারণ—এই উভয়প্রকার জ্ঞানেরই খুব দরকার। বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন অভিজ্ঞতার দিগন্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ,—স্থানের দূরত্ব গেছে কমে: সারা পৃথিবীর মানব-সমাজ হয়েছে যেন এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ যেমন বিজ্ঞানের শুভের দিক তেমনি আছে অশুভেরও: মানুষের হাতে যে এখন এসে পড়েছে নানা মারণাস্ত্র—সে-ও তো বিজ্ঞানের দান। দূর পৃথিবীর মানব-সমাজের কাছে-আসা সত্তাকে যে সহজে অল্পকালেই শূন্যে মিলিয়ে দিতে পারে এই বিজ্ঞান। তাই তো এখন তার সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। শিক্ষাই দিতে পারে সেই সদ্ব্যবহারের বুদ্ধি। তাই করাল প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে এবং বেঁচে মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ-সর্বজনীন উন্নতি-সমৃদ্ধি আনতে হলে চাই সর্বজনীন শিক্ষা। ভারতের জনগণের দায়িত্ব কিছু কম নয়। তাই এখানেও চাই সর্বজনীন শিক্ষা। ভারতের গণতন্ত্রকে যদি সফল

হতে হয় তবে ভারত ও পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতীয়দের অর্জন করতেই হবে।

গণতন্ত্রী সমাজে বিভিন্ন বিষম স্তরের স্থান নেই যদিও, তবু একথা বলা চলে না যে, এতে সকলেই সাক্ষাৎ ভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালন করেন। তবে আসল কথাটা এই যে, এতে সকলের তা করার সুযোগ আছে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন, রাষ্ট্রের বিধি-বিধান ও নীতি-নিয়ম প্রণয়ন করে থাকেন। কিন্তু এতে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মতো এই ক্ষমতার অধিকার কৌলিক নয়, যোগ্যতা-ভিত্তিক। এতে থাকে সকলেরই সুযোগ-ব্যবস্থা। সুযোগ-সাম্যই গণতন্ত্রী সমাজের যথার্থ মূলনীতি।

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক দেশে সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত। শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে তাকে করতে হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। গণতন্ত্রের সার্থকতার উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রের সর্বজনীন শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের শিক্ষা-ব্যবস্থা তো করতেই হয়, করতে হয় বয়স্কদেরও। কেননা, শিশু-কিশোরদের শিক্ষা পেয়ে বড়ো হতে তো সময় নেবে, কিন্তু, বড়োদের শিক্ষা ও জ্ঞান না হলে গণতন্ত্রের উপস্থিত সার্থক কাজ হবে কেমন করে? তাই যে-সব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ নেই শিক্ষার প্রসার সেখানে বয়স্কদের নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা ঘোচাবার জন্যে করা হয়েছে পরিকল্পনা ও কার্যব্যবস্থা। একমাত্র এইভাবেই অতীতের শিক্ষা-সুযোগের অভাবের দোষক্ষালন করা যায়।

বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়ার আর-একটা কারণ আছে। ছেলেমেয়েদের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা সফল হতে পারে না বয়স্কদের সমর্থন না থাকলে। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্যে সরকার বিধান অনুমোদন করলেও জনসমর্থন না পেলে তাকে

কার্যকরী করা সম্ভব বা সহজ হয় না, সামরিক বা পুলিশী শক্তির জোরেও না। আর-একটা কথাঃ শিক্ষায় অনগ্রসর দেশ বৈষয়িক সমৃদ্ধিতেও পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিশ্চয়ই কিছুটা ব্যয়সাধ্য। এর জন্যে সংসারে স্বেচ্ছায় কিছু স্বার্থত্যাগ করতেই হয়। এই ত্যাগ-সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্যেও বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার।

২

১৯৪৭ সালে ভারত রাষ্ট্রনীতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করল। তখন ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৫ জন। কিন্তু শুধুমাত্র বয়স্কদের গণনা করলে শিক্ষিতের হার হয় আরও কম, শতকরা দশেরও কম। আর গণতান্ত্রিক সরকার-পরিচালন-ব্যাপারে এঁদের কথাই তো ধর্তব্য। একশো জনের ভেতর যদি নব্বই জন অশিক্ষিত হয়, অর্থাৎ দেশের সামাজিক-অর্থনীতিক অবস্থার কথা বুঝতে অসমর্থ হয় তবে তাঁদের নিয়ে গণতন্ত্র কেমন করে সফল হতে পারে? একটা কথা আছে, দেশের সরকার হয় অধিবাসীদের যোগ্যতা অনুসারে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য মহান্, তার দায়িত্ব বিস্তর: সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা তার লক্ষ্য, সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার-রক্ষার দায়িত্ব তার। সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার, সেই দায়-দায়িত্ব পালন করার ব্রত নিয়েছে ভারত, কেননা, গণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে সে। কিন্তু শতকরা নব্বইজন নিরক্ষর লোক নিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করার উদ্যোগ কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

তবে এর যে কোন যুক্তি নেই তা নয়। ভারতের জনসাধারণের বেশির ভাগই নিরক্ষর হলেও তারা নিরেট অজ্ঞান নয়। সাধারণ শিক্ষা তাদের আছে। সে-শিক্ষা তারা পেয়ে আসছে মুখে-মুখে। বহু বিদেশী ব্যক্তি ভারতের নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে শীল ও আচরণের

শালীনতা, সভ্যতা-ভব্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। প্রথম দর্শনে নিরক্ষরতার সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এখানে সেই সম্পর্কটা দেখতে পেলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এই অসম্ভবটা এখানে সম্ভব হল কেমন করে?—হয়েছে ভারতের চিরাচরিত মৌখিক শিক্ষাধারার কল্যাণে। লোককথা, রীতিপ্রথা, প্রবচন, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে মুখে-মুখে। এতেই অক্ষর-জ্ঞানের অভাব দূরিত হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরনের শিক্ষা এখন যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। এককালে যখন পৃথিবী ছিল নানা ব্যবধানে খণ্ডিত, মানব-জাতি ছিল ছাড়া-ছাড়া, ছড়ানো, পথঘাট ও যানবাহনের ছিল অত্যন্ত অভাব তখন এই ধারার শিক্ষারীতি হয়তো ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এখন?—এখন তো আর এই-সব বাধাবিপত্তি নেই, নেই অমন পরিবেশও। ছোটো সীমানার মানব-সমাজের সংস্কার-ঐতিহ্য, রীতি-নীতির অনেককিছুই এখন অকেজো অচল বলে বিবেচিত হচ্ছে। বৃহত্তর পৃথিবীর প্রশস্ততর মানব-সমাজের দাবি-দাওয়া মিটতে পারে না প্রাচীন সমাজের বদ্ধ সংকীর্ণ সংস্কারে ও খণ্ডিত মূল্যবোধে। নবযুগের পরিস্থিতি-পরিবেশের জন্যে চাই নতুন-নতুন ধ্যান-ধারণা এবং সংকল্প-পরিকল্পনা। তাই সাধারণ মানুষের ভেতর এখন জাগিয়ে তুলতে হবে বিচার-বুদ্ধিকে, যাতে তাঁরা বর্জন করতে পারেন জীর্ণ অ-যুগোপযোগী কুসংস্কারগুলোকে, বৃহত্তর মানব-সমাজ-গঠনের বিরোধী সংকীর্ণ ভাবধারাকে। এর জন্যে এখন আর শুধু মৌখিক শিক্ষায় সব প্রয়োজন মিটতে পারে না, অক্ষর-জ্ঞানেরও প্রয়োজন অনেক। এখন শিক্ষণীয় বিষয় বেড়ে গেছে সংখ্যায় এবং আয়তনে। মৌখিক শিক্ষার বাহন যে-স্মৃতি তার এখনকার বিবিধ-বিচিত্র বিষয় আয়ত্ত করে-রাখা সম্ভব নয়। তাই অক্ষর-শিক্ষার সুযোগ-সাহায্য মানুষের না নিলেই নয়।

আধুনিক যুগের নানা সমস্যার সমাধান-কল্পে দেশ-বিদেশের শুভংকর জ্ঞানের বিষয়গুলি গ্রহণ করবার জন্যেও লিপিবদ্ধ জ্ঞান-সংগ্রহ অপরিহার্য।

ভারতের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখানে শিক্ষাপ্রসারের অনুকূল হয়ে আছে সামাজিক পরিবেশ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিলেন আসলে শিক্ষক ; সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁদের আসন ছিল সকলের আগে। মধ্যযুগে মুসলিম ধর্মজ্ঞেরাও অনুরূপ শ্রদ্ধা পেতেন। ব্রাহ্মণদের সেই সর্বাগ্রগণ্যতা আর রইল না, তবে সমাজের অপরাপর শ্রেণী থেকে তাঁদের সম্মান বেশিই থাকল। আধুনিক ভারতে শিক্ষার আগ্রহ মোটের ওপর নিশ্চয় বেড়েছে। বয়স্কদের ভেতর যাঁরা নিরক্ষর তাঁরাও এখন সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার জন্যে আগ্রহী হয়েছেন। এ বেশ ভালো লক্ষণ। এতে শিক্ষা-প্রসারের সরকারী কর্মীদের কাজের সুবিধা হয় যথেষ্ট। সত্যি বলতে কি, ভারতে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহটা এখন এত বেড়েছে যে, সেই পরিমাণে তা দেবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ নয় সরকার।

ভারতে রাষ্ট্রনীতিক চেতনার প্রসার এবং ক্ষমতা-লাভের সঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষার উন্নতির চাহিদাও বেড়েছে সমান পরিমাণে। সর্ব-স্তরের শিক্ষার চাহিদাই বেড়েছে। তবে, বয়স্ক-শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে আরও বেশি। ১৯৩৭ সাল থেকে বয়স্কদের নিরক্ষরতা-দূরীকরণের চেষ্টা হচ্ছে। তখন অবশ্য কাজ হচ্ছিল অল্পবিস্তর প্রাদেশিক ভিত্তিতে। ১৯৪৮-এর পর থেকে এই কাজ হচ্ছে সারা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনায়। ভারতে একথা এখন স্বীকৃত হয়ে চলছে যে, দেশের অভাব-দারিদ্র্যের অন্যতম মুখ্য হেতু হচ্ছে অশিক্ষা। আসলে ধনী বা দরিদ্র বলে কোন দেশ নেই : দেশ ধনী বা দরিদ্র হয় তার মানুষের জন্যে। দেশের মানুষ যদি কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয় তো দৈন্যদশা ঘোচাতে পারে তার অধিবাসীরা। জাপানে তো প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন কিছু নেই, কিন্তু তবু তো জাপানীরা তাঁদের

কর্মজ্ঞানের সাহায্যে দেশকে পৃথিবীর অন্যতম শিল্পায়িত ও সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে গড়ে তুলেছেন। পক্ষান্তরে, এশিআ ও আফ্রিকায় প্রভূত-প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই মহাদেশ-ছ'টির আদিবাসীদের দৈন্য-দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই। দেশের অর্থনীতিক সাচ্ছল্য-সমৃদ্ধির জন্যে যে শিক্ষার একান্ত দরকার—সেকথা এখন ভারতবাসীরা বুঝছেন।

১৯৩৭ সাল থেকে ভারতে বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার সফলতা-বিফলতার একটা সংক্ষিপ্ত হিসেব-নিকেশ করা যাক। ঐ-সালে ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। তখন বহু মানুষের ভোটাধিকারও স্বীকৃত হল পল্লী-অঞ্চলে এই অধিকার প্রসারিত হওয়ার দরুন। তাতে করে বয়স্কদের ভেতর শিক্ষালাভের উৎসাহ দেখা দিল। অবশ্য, এই উৎসাহ খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তার কারণ ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাসমরের আরম্ভ। আর-একটা জোরদার কারণ বয়স্ক-শিক্ষা-বিষয়ে সুচিন্তিত ধারণার অভাব। তখনকার ঝোঁকটা ছিল সাধারণ ভাবে শিক্ষার ওপর; বয়স্ক ও শিশু-শিক্ষার পার্থক্য-বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হয় নি। তার ফল হয়েছিল এই যে, শিশু-কিশোরদের শিক্ষণীয় পাঠ্যগ্রন্থে বয়স্কদের মন আকৃষ্ট ও নিবিষ্ট হতে পারে নি। এ থেকে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মূল্যবোধ কমে গেল। শিক্ষা-বিকিরণের কতকগুলো প্রোগ্রামে লেখা ও পড়ার মাধ্যম বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে, এরকম প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য আনতে পারে না। অক্ষর-পরিচয়হীন শিক্ষা অতীতের সেই সরল পরিবেশে চলতে পারত, কিন্তু এখনকার জটিল পরিস্থিতিতে সাক্ষরতার শিক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে অপরিহার্য।

একটুখানি চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, বয়স্ক-শিক্ষার কতকগুলো স্বকীয় সমস্যা আছে। শিশু-শিক্ষা-বিষয়ে যাঁরা চিন্তা-পরিকল্পনা করেন তাঁরা বয়স্ক-শিক্ষার বিশেষ সমস্যার কথা অনেক সময় ঠিক

বুঝতে পারেন না। শৈশবে স্মৃতিশক্তি থাকে খুব সজীব। তখন অভিজ্ঞতা থাকে অতি সামান্যই, কিন্তু কৌতূহলের সীমা থাকে না। তাই লিখতে-পড়তে শেখাটা তখন একটা আনন্দ-উদ্দীপনার বিষয় হয়। প্রৌঢ়দেব বেলায় একথা খাটে না। প্রৌঢ়দের বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে যায়। তাতেই তাঁদেব প্রয়োজন মোটামুটি মিটে যায়। তাই তাঁদের অক্ষব-পরিচয় করে জ্ঞানলাভে বিশেষ উৎসাহ থাকে না। বস্তুত, অনেকক্ষেত্রে তাদের অভ্যাসের জড়তা ও মনের কাঠিন্য কাটিয়ে উঠতে হয়।

এখন শিশুদেব শিক্ষাতেও অক্ষর-পরিচয়ের শিক্ষারীতিব পরিবর্তন হয়েছে। এখন তাবা অক্ষব শেখে ছবি আর ছড়া-ছন্দের সাহায্যে। ছড়া-ছন্দেব সুর-তালের দোলায় লেখাপড়া-শেখার কষ্ট রূপান্তরিত হয় আনন্দে। দুঃসাহসিকতার গল্পকাহিনীতে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। বয়স্কদের তা হয় না। তাদের শিক্ষার কষ্ট ও অসুবিধা ঘোচাবাব অনেক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এর একটা হল—এমন-সব কথা বেছে বেছে নেয়া যেগুলি দ্বারা বাচিত বস্তুগুলো হবে প্রথম অক্ষবগুলোর ছাঁদের অনুরূপ। যাঁরা বুঝেছেন যে, এক-একটা করে অক্ষর শেখানোটা বড়োদের মনোমত হবে না তাঁরা পদ বা সম্ভব হলে বাক্য দিয়ে শেখাবার পক্ষপাতী। এই পদ্ধতিগুলো অল্প-বিস্তর সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, এগুলোর কোন একটাকে একান্তভাবে নেয়া চলে না। আসলে, শিক্ষকেব প্রচেষ্টা ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যই এ-বিষয়ে সাফল্যের যথার্থ নিরূপক।

বয়স্কদের অক্ষর-শিক্ষার ব্যাপারটির সঙ্গে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক-সংগ্রহের ব্যাপারটি জড়িত। এ অতি সহজবোধ্য কথা যে, শিশুদের পাঠ্যপুস্তক বড়োদের মনের মতো হতে পারে না। বড়োরা যদি নিরক্ষরও হন তবু তাঁদের মন যে পরিণত তা অস্বীকার করবার নয়। বহুবিষয়ে তাঁদের আগ্রহ; বহু শব্দও তাঁদের জানা। তাই তাঁদের

পাঠ্য বইগুলির বিষয় হওয়া চাই পরিণত মনের উপযোগী, কিন্তু ভাষা হওয়া চাই সম্ভবমতো সরল। এ-ক্ষেত্রেও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়েছে। ভারতের অধিকাংশ বর্ণমালায় আছে যুক্ত-ব্যঞ্জন। প্রথম পক্ষে এ এক বিভীষিকা; শিশুদের তো বটেই, নিরক্ষর বড়োদের কাছে যেন আরও বেশি। তাই কোন-কোন পাঠ্যপুস্তকে যুক্তাক্ষর বাদ বা ভেঙে দেয়া হয়েছে। এতে করে বড়োদের কাছে বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছে। বিষয়ের দিক থেকে বিচারে, বড়োদের জন্যে সাধারণ জ্ঞান ও ইতিহাসের গ্রন্থ পাঠ্য করা হয়েছে। এতে তাঁদের পরিণত জীবনের উপযোগী বিষয় থাকায় এগুলি সাগ্রহে পঠিত হয়ে পাঠ-নৈপুণ্য ও জ্ঞান বাড়ায়।

বয়স্কদের পাঠ্যপুস্তক-ব্যবস্থার চেয়ে আরও গুরুতর ব্যাপার হচ্ছে, পাঠ মোটামুটি শেষ হয়ে গেলে তাঁদের পঠনীয় সাহিত্যগ্রন্থের ব্যবস্থা করা। লেখাপড়ার অভ্যাস না রাখলে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া ভুলে যায়। বড়োরা তো আরও বেশি ভোলে। তাই এঁদের জন্যে পঠনীয় গ্রন্থের ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। এই ব্যবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সাহিত্যগ্রন্থগুলি উঁচু দরের হয়। সরকারের পক্ষে সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবে যে-পরিবেষ্টনীতে ভালো সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে এবং যাতে তা যথেষ্ট বিক্রি হয় তার ব্যবস্থা করতে পারে সরকার।

এই বয়স্কশিক্ষা-বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং অনুধ্যান থেকে বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা পাওয়া গেছে। তা হচ্ছে এই যে, এ-শিক্ষার প্রোগ্রাম-প্রচেষ্টা সফল হতে হলে প্রৌঢ়দের নানা বিষয়ের আগ্রহ তৃপ্ত করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পাঁচদফার একটি প্রোগ্রাম করা হয়েছে। তাতে যথাসম্ভব বয়স্ক ব্যক্তিদের মোটামুটি জ্ঞাতব্য-জিজ্ঞাস্য ব্যাপারগুলো জানা ও জানানোর কথা আছে। এই দফা পাঁচটি হচ্ছেঃ (ক) নিরক্ষরতা-

বিদূরণ, (২) স্বাস্থ্যজ্ঞান, (৩) বয়স্কদের অর্থনীতিক অবস্থার মান-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, (৪) নাগরিকতা-বোধ, অর্থাৎ, নাগরিকের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং (৫) ব্যক্তি ও সমাজের উপযোগী সুন্দর আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত সবরকম সংগত উপায়ই অবলম্বন করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে সমাজের যোগ্য সভ্য ও দেশের সুনাগরিক করে-তোলা, এবং তার জীবন-মান উন্নত করে সর্বসাকল্যে সমগ্র সমাজের মান উন্নত করা। এই জন্যে এই শিক্ষার নাম দেয়া হয়েছে 'সামাজিক শিক্ষা'। নিরক্ষরতা-বিদূরণের প্রোগ্রাম থেকে এর স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্যেই এই নাম দেয়া হয়েছে এর।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে এমন-এক ধারার শিক্ষা যাতে মানুষের নাগরিকতা-বোধ উদ্দীপ্ত হয় আর সমাজে সংহতি বেশ পোক্ত হয়। কেবলমাত্র নিরক্ষরতা-দূরীকরণই এর লক্ষ্য নয়, জনগণের মন যাতে শিক্ষিত ও নিবুদ্ধ হয়ে ওঠে সেই দিকেই এর বিশেষ দৃষ্টি। এই ধারার শিক্ষার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য-বিষয়ে চেতনা শাণিত হয়ে উঠবে।

৩

পরশাসন-মুক্তির পরও স্বাধীন ভারতে জাতির জীবন-সংস্কার-কাজে পুরানো বাধার জের চলেছিল বিস্তর। তার মধ্যে অন্যতম ছিল দেশব্যাপী নিরক্ষরতা। অধিকাংশ মানুষেরই জীবন-সংসারের ওপর কেমন-যেন-একটা ঔদাসীন্য ও নির্জীবতা এসে গিয়েছিল: ছিল কোন-মতে জীবনটা কাটিয়ে-দেয়ার ভাব। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষ ছিল জীবন্মৃত: বাঁচার আনন্দ নেই, স্পৃহা নেই, সে এক অদ্ভুত অবস্থা। না ছিল ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, না ছিল

বর্তমানের তৃপ্তি-নিশ্চিন্ততা। প্রাচীন সংস্কারাগত কর্মফলবাদ ও অদৃষ্টবাদের প্রভাবে তাদের আত্মশক্তি, স্বনির্ভরতা গিয়েছিল নষ্ট হয়েঃ ইচ্ছা, কর্ম ও চেষ্টার দ্বারা যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে সে-ধারণাও হয়েছিল পঙ্গু, অসাড়।

ভারতের স্বরাজ-লাভের পর রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতার অধিকার জনগণের মনের ওপর বইয়ে দিলে এক নতুন জীবন-চেতনা; সুদূর পল্লীগ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল সে-ধারা। ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্রের নীতি হল স্বীকৃতঃ যোগ্য সৎ সব সাবালক মানুষেরই রাষ্ট্রনীতিক অধিকার ও দায়দায়িত্ব এল। আপন-আপন ইচ্ছা, রুচি ও আদর্শবোধ-অনুযায়ী সব নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল বিধান-রচনা ও রাজ্যশাসনকার্য-পরিচালনের জন্যে বিধান-সভায়, লোকসভায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর। যাঁরা এতকাল কেবল নগর-সীমায় আবদ্ধ রাখতেন নিজেদের রাজনীতিক কাজকর্ম তাঁরা এখন গ্রামে-গ্রামে যেতে বাধ্য হলেন। গ্রামের নিরক্ষর অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষও যখন দেখলেন যে, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তাঁদের কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছেন তখন তাঁদের মধ্যে ধীরে-ধীরে জেগে-উঠতে থাকল এক নতুন মর্যাদা-বোধ। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, প্রথম-প্রথম দেশের সাধারণ মানুষ এই অধিকারের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি। এমনও হয়েছে যে, কোথাও-কোথাও কোন-কোন মানুষ মোটা দামে বিক্রি করেছেন নিজেদের ভোট; তাঁদের এই ধারণা হয়েছিল যে, ওটা বোধ হয় ইচ্ছামতো ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। এখন কিন্তু সে-ধারণা মিলিয়ে যেতে বসেছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে, ভোটাধিকার শুধু একটা অধিকার-সুযোগ নয়, এ এক মহান্ দায়িত্বও। ১৯৪৭-এর পর, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে জনসাধারণের রাজনীতি-চেতনা বেশ বেড়েছে। ১৯৪৮-এ নিরূপিত সামাজিক শিক্ষার রূপকল্পনা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যেই রচিত।

সামাজিক শিক্ষার অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকতা-বোধের

উদ্দীপন। এর জন্যে দরকার দেশের সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল-বিষয়ে জ্ঞান, রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারের জ্ঞান, এবং ভোটাধিকারের দায়িত্ব-চেতনা। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে নাগরিকতা মানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা-অধিকারের অংশগ্রহণ ও ব্যবহার। ভোট হচ্ছে তার প্রমাণ।

এই আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যাবে যে, সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়সমূহে জনগণের শিক্ষা সহজে হতে পারবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। এই জন্যেই সামাজিক শিক্ষার সবরকম প্রোগ্রামে জনগণকে যে শুধু রাষ্ট্রিক ব্যাপারেই সচেতন করে-তোলার লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা-ই নয়, হয়েছে ছোটো-ছোটো সমাজ-সংস্থা-বিষয়েও। জাতীয় উন্নয়নের জন্যে ১৯৫২ থেকে দু'টি সমাজ-সংস্থা গড়ে উঠে কাজ করে চলেছে। এ-দু'টির একটির নাম সমাজ-উন্নয়ন-সংস্থা (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট্ প্রজেক্ট্স্), অপরটির নাম—জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থা (ন্যাশনাল্ এক্স্টেন্সন্ সারভিসেস্)। এখনও অবধি শহরে-নগরে যে-সব সুখ-সুবিধা ছিল সেগুলি পল্লী-অঞ্চলেও যাতে পাওয়া যায় তাই জাতীয় উন্নয়ন-সংস্থা গঠন করা। কতকগুলো করে গ্রাম নিয়ে এক-এক অঞ্চলে গড়া সংস্থাই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন-সংস্থা। জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থাও তা-ই, তবে এ হচ্ছে ছোট আকারের। উন্নয়ন-সংস্থার প্রথম ধাপ হল সম্প্রসারণ-সংস্থা। এই-সব সংস্থার গঠন ও পরিচালনে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও এগুলির প্রধান লক্ষ্য হল উন্নয়নের কাজকর্মে স্থানীয় লোকদের উৎসাহ-প্রচেষ্টা জাগিয়ে তোলা। এতে করে তাঁদের নিহিত আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব-গুণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। সাধারণ নাগরিকের কাছে শিক্ষা যাতে বাস্তবিক ও ব্যবহারিক হয়ে-ওঠে তাই সামাজিক শিক্ষার সবরকম প্রোগ্রামে জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থার কাজকর্মের যোগাযোগ রাখার কথা হয়েছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থার লক্ষ্য হল সব দিকে জাতির জীবন-

মান-উন্নয়নের সমগ্র আয়োজন। ১৯৪৮-এ সামাজিক শিক্ষার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হওয়ার সময় থেকে এই শিক্ষারও লক্ষ্য হয়েছে তা-ই। সেই জন্যেই সামাজিক শিক্ষার প্রোগ্রামে অর্থনীতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য-বিষয়ে শিক্ষার নির্দেশ রাখা হয়েছে। জাতির স্বাস্থ্য উন্নত করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ। এত অর্থ আসবে কোথা থেকে? তার জন্যে করা হল অর্থ-উপার্জনের ব্যবস্থা। সে-ব্যবস্থা হল নানারকম বৃত্তিকর্মশিক্ষা দিয়ে। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের জন্যে যে-বাড়তি টাকাটা চাই তা আসবে এ থেকে। ভারতের বেশির ভাগ লোক কৃষিজীবী; তাই সামাজিক শিক্ষায় কৃষি-ব্যবস্থারও উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে। চাষবাসের কাজ শেষ হলে বছরের অনেকটা সময়েই কৃষকরা বসে থাকেন; যাতে এই সময়টায় তাঁদের কিছু-কিছু কাজে নিযুক্ত রাখতে পারা যায় তারও ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ আছে সামাজিক শিক্ষায়। পল্লী-অঞ্চলে অব্যবহৃত কর্মশক্তি ও অপূরিত চাহিদাকে মিলিয়ে অর্থের অভাব ঘুচিয়ে সম্পদ-বৃদ্ধির চেষ্টাও করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে সাধারণ নাগরিকের স্বচ্ছন্দতর ও পূর্ণতর জীবন-যাপনের অনুকূলে জ্ঞান দেবার উপায়।

সামাজিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরক্ষর জনসাধারণের মনকে যথার্থ শিক্ষিত করে-তোলা, শুধু সাক্ষর বা লিটারেট করে-তোলাই নয়। শিক্ষা আর সাক্ষরতা যে এক কথা নয়—একথা বলাই বাহুল্য। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, তথাকথিত লেখাপড়া-জানা অনেক লোকের মন তৈরী হয় নি; সংকীর্ণতায়, গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে-মন। একে কি যথার্থ শিক্ষা বলতে হবে? এখনও পৃথিবীতে এমন-অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা বহু, কিন্তু মানুষগুলো তত সামাজিক ও শিষ্টাচারী নয়। দিনে-দিনে উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের চাহিদা-

বৃদ্ধি ও প্রকাশ, সস্তা লঘুসাহিত্যেব কাটতি, নিতান্ত অশ্লীল, হাল্‌কা ও খেলো সিনেমা-ছবির প্রসার প্রভৃতিই তার প্রমাণ।

এই যে সাক্ষরতার সঙ্গে অশালীনতার সহস্থিতি—এটা কিন্তু হাল আমলের উৎপত্তি। ভেবে দেখা দরকার এটা হয় কেন? নইলে তো এর প্রতিকারের উপায়-চেষ্টা হতে পারবে না। মানুষের জীবনে সমাজে কাজও চাই, আরাম-বিরামও চাই; 'বিরাম কাজেরই অঙ্গ, একসাথে গাঁথা'। কাজের ফল ভালো পেতে হলে যেমন তার সুপরিকল্পনা দরকার, আরাম-বিরামেরও তা-ই; কাজের সঙ্গে বিরামের সংগতি রক্ষা করা চাই। আধুনিক সমাজে এই সংগতিটা যেখানেই রক্ষিত হয় নি সেখানেই জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কল্যাণে উৎপাদন-পদ্ধতির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে গেল। এরই নাম শিল্পবিপ্লব। এতে শ্রম-বিভাজনের জন্যে উৎপাদনের সংখ্যা ও পরিমাণ পেল বৃদ্ধি। এই বিভাজনের নীতিটার বেশ কদর হল। কাজ আর বিরাম-ভোগের ব্যাপারেও প্রযুক্ত হতে লাগল এই নীতিটা। কিন্তু জীবন তো অত কঠোর বিভাজন-নীতি মানার পক্ষপাতী নয়। আধুনিক উৎপাদন-পরিমণ্ডলে সমাজের দৃষ্টি থাকল শুধু কাজের দিকে। তাই কর্মীদের আপন রুচি-মর্জি-অনুযায়ী বিরাম-ভোগ ও আমোদ-আনন্দের একটা সুবিহিত ব্যবস্থা চাই। ১৯৩৭-এ ভারতে বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল যে, বয়স্ক ব্যক্তিদের শুধু নিরক্ষরতা ঘোচানোই যথেষ্ট নয়, তাঁদের জন্যে আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা রাখাটাও একটা দরকারী বিষয় বলে ধরতে হবে। কেবলমাত্র নিরক্ষরতা-বিদূরণের চেষ্টায় তাঁরা উৎসাহিত বোধ করেন না। কাজে নতুন উৎসাহ-আগ্রহ পাবার জন্যেই দরকার আমোদ-আনন্দের, ভালোভাবে বিরাম-উপভোগের। তাহলে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে বিরাম-আমোদের সম্পর্কটা কত ঘনিষ্ঠ। অতীতে বিরাম-উপভোগের সুযোগ ছিল অল্পসংখ্যক মানুষের।

এই সুযোগের সুব্যবহার করার শিক্ষা তাঁদের হত। তাই তাঁরা পেরেছিলেন নানা শিল্পকলার সৃষ্টি ও বিকাশে আনুকূল্য করতে। এখন কিন্তু সকলেরই বিরাম-আনন্দ পাবার সুযোগ এসেছে। তবে সবাই জানে না তার সদ্‌ব্যবহার করার উপায়, কেননা, সেই শিক্ষা নেই তাদের। বিরাম-আনন্দের ব্যবহার দিয়ে দেহমনকে সজীব-সঞ্জীব করে তুলতে পারে যে-মন তাকেই বলি শিক্ষিত মন।

সামাজিক শিক্ষায় শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য এবং অন্যবিধ সৃজনধর্মী কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আবেগ-অনুভূতির শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সহিষ্ণুতা, শুভেচ্ছা ও সন্তোষ-নীতির সমর্থন-পোষণের এবং গোঁড়ামি ও চিত্তস্থবিরতা-অপসারণের উদ্দেশ্যে সাহিত্য-রচনার অনুকূল পরিবেশ করে-তোলা হচ্ছে এখন। এর জন্যে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্য ও দৃশ্য-শিল্পকলার শিক্ষানিকেতন বা আকাদেমিও খোলা হয়েছে। এই নিকেতনগুলি স্বাধীন। সরকারী আনুকূল্যে এদের উদ্‌ভব হলেও এদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সরকারের নীতি নয়। যাতে জনগণের ভেতর শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা উৎসাহিত ও পুষ্ট হয় তারই জন্যে হয়েছে এগুলির সৃষ্টি। বয়স্ক-শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্যে শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বিশেষ-বিশেষ পারিতোষিক-পুরস্কারেরও ব্যবস্থার দিকে। এই-সব পুরস্কারের জন্যে লিখিত গ্রন্থের নির্বাচন করেন নামকরা সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা, সরকারী কর্তৃপক্ষ নয়। ওঁদের মতামতই মেনে নেওয়া হয় সব ক্ষেত্রেই। ভারতের ও বিদেশের প্রাচীন সদ্‌গ্রন্থরাজি এবং মৌলিক গ্রন্থসমূহ যাতে প্রকাশের ব্যবস্থা হয় ও অল্পমূল্যে গণতন্ত্রের নাগরিকরা পান তার জন্যে জাতীয় গ্রন্থভাণ্ডার (ন্যাশনাল বুক্ ট্রাস্ট্) নামে এক প্রতিষ্ঠান করার কথা হয়েছে।

ভারতের ইতিহাস নানা জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ইতিহাস। আধুনিক জগতে দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে সংস্পর্শ আরও

বেশি দরকার। তাই সবরকম সামাজিক শিক্ষার প্রোগ্রামে জোর দেওয়া হয় বিশ্বমৈত্রী ও সর্বজনীন নীতিজ্ঞান-শিক্ষার ওপর। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে তো মত ও নীতির পার্থক্য-বিষয়ে সহিষ্ণুতা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত।

আগেই বলা হয়েছে, বয়স্কদের শিক্ষার প্রগতি না হলে শিশু-কিশোরদের শিক্ষার অগ্রগতি-উন্নতি অসম্ভব। আর, দেশের সাধারণ শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা-প্রচেষ্টার যোগাযোগ না থাকলেও সামাজিক শিক্ষার প্রগতি হতে পারে না। তাই বিদ্যালয়-গুলিকে সমাজ-জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ করে-তোলার জন্যে সামাজিক শিক্ষার বিষয়গুলি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শেখাবার প্রস্তাব হয়েছে। আর, এ-বিষয়েও প্রায় মতান্তর নেই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই জনগণকে এই নতুন প্রচেষ্টায় সাড়া দিতে নিবোধিত করবেন।

৪

সব রাজ্যসরকারই বয়স্ক-শিক্ষার এই আদর্শগুলি গ্রহণ করেছে। তবে, বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন আদর্শের ওপর জোর দেয়া হবে—একথা কিছু বিচিত্র নয়। কোথাও জোর দেওয়া হয়েছে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের ওপর, কোথাও সামাজিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে প্রাচীন মৌখিক পদ্ধতিতে। এই উদ্দেশ্যে দৃষ্টি-শ্রুতি-সহায়ক উপকরণের সাহায্য নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই-সব উপকরণের সাহায্য নেয়া হলেও সাধারণত নীতিটা হচ্ছে প্রাচীন ধারার। আগেই বলা হয়েছে যে, এখানকার পরিস্থিতিতে প্রাচীন মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আর যথেষ্ট নয়। সব রাজ্যেই শিক্ষা-প্রচেষ্টায় নিরক্ষরতা-নির্বাসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে।

বয়স্ক-শিক্ষা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখ্য বিবর্তন হচ্ছে দিল্লি রাজ্যে অনুষ্ঠিত শিক্ষামিছিল। এই মিছিলগুলোয় তিনটে কি চারটে জীপ-গাড়ি থাকে; এর সঙ্গে কখনও পেছনে জোড়া থাকে

কতকগুলো করে মালবাহন, কখনও বা থাকেও না। মিছিলের একটা অংশে থাকে চলমান মঞ্চ, একটায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, একটায় প্রদর্শনী-গাড়ী, আর চতুর্থটায় থাকে একটা প্রজেক্টার্। মিছিল গিয়ে সমবেত হয় কোন এক কেন্দ্রস্থানীয় গ্রামে; সেখানে স্বাস্থ্য আর কৃষি-শিল্প-কর্মের একজিবিশন খোলা হয়। কিশোর ও বয়স্কদের খেলাধুলো আর ব্যায়াম-প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা রাখা হয় সেখানে; এতে স্থানীয় লোকদের ভেতর বেশ-একটা প্রাণের সাড়া জাগে। স্থানীয় লোকদের নিয়ে অভিনয়াদিও করানো হয়; অভিনয়ের বিষয়বস্তু সাধারণত হয় কোন স্থানীয় বিষয় নিয়ে। এতে গ্রামবাসীদের ভেতর শিক্ষার উপযোগিতার কথাটা ধরাবার চেষ্টা থাকে। আলাপ-আলোচনা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যখন স্থানীয় লোকদের ভেতর শিক্ষাপ্রোগ্রামে আগ্রহ-উৎসাহ সঞ্চারিত হয় তখন বিশ-ত্রিশজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার একটি দল চার কি ছয় সপ্তাহের জন্যে ঐ-অঞ্চলে থেকে যান। পুরুষ এবং নারীদের জন্যে যতগুলো করে সামাজিক শিক্ষার আসরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তা তাঁরা করেন। এইভাবে নিরক্ষরতার দুর্গ-ভাঙার কাজ শুরু হয়। তার পর এঁরা যখন সেখান ছেড়ে চলে যান তখন স্থানীয় শিক্ষকরা ঐ-ধারার কাজ চালিয়ে যান। তিন থেকে ছয় মাসের আক্ষরিক শিক্ষার পর এই শিক্ষিতদের দেয়া হয় সাক্ষরতার সার্টিফিকেট।

১৯৫৭-এর ভেতর বয়স্ক লোকদের শতকরা ৫০জনকে সাক্ষর করে তোলা দিল্লির লক্ষ্য বলে স্থির হয়। ১৯৫০-এ হারটা ছিল শতকরা দশ; কাজকাজেই এর ভেতর শতকরা ৪০ মোটেই কম নয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যে আরও বেশি উদ্যম-উদ্যোগের দরকার তা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় শিক্ষকরা অবশ্য যথাসাধ্য সাহায্য করছেন, কিন্তু তাতে তো কুলোবে না; তাতে শিশু-কিশোরদেরই প্রয়োজন মিটবে না। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সামাজিক শিক্ষার

প্রোগ্রামকে যথেষ্ট সফল করে তুলতে হলে চাই বহু কর্মী। এত কর্মী এখন মিলবে কোথা থেকে?—একমাত্র মিলতে পারে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির উঁচু শ্রেণীর আর কলেজের ছাত্রদের ভেতর থেকে। এদের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় যদি সামাজিক শিক্ষা রাখা হয় তবে ও-কাজ অনেকখানি এগোতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের সামাজিক শিক্ষার প্রোগ্রামের বিশেষ উল্লেখ না না করে পারা যায় না। নিরক্ষর জনগণকে গণতন্ত্রের দায়িত্ব ও অধিকার-বিষয়ে সচেতন করে তোলবার জন্যে এই প্রদেশের সরকার নিরক্ষরতা-বিদূরণের বিপুল প্রয়াস করেছ। এখানকার প্রোগ্রাম মোটামুটি ঐ-ওপরে-বলা প্রোগ্রামের মতোই, তবে এর কিছু বিশেষত্ব আছে। তা হচ্ছে শিক্ষকদের ওপর বয়স্ক-শিক্ষা-কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা। এই প্রদেশই সর্বপ্রথম চলমান বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করে: সামাজিক শিক্ষার বিবিধার্থ-সাধক যানগুলোকে লাগায় এর কাজে। নব্যসাক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষরতার শিক্ষা যাতে বর্তায় তার জন্যে ওখানে পল্লী-অঞ্চলে লাইব্রেরি খোলা হয়েছে, গ্রামবাসীরা এক জায়গায় বসে যাতে শুনতে পায় তার জন্যে বহু রেড়িও-সেট দেয়া হয়েছে। এর একটা বলবার মতো কথা এই যে, ওখানে সামাজিক শিক্ষার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের ভেতর শতকরা কুড়িজন হচ্ছেন নারী।

সামাজিক শিক্ষা-প্রসার-প্রচেষ্টায় বিহার ও রাজস্থানের কথাও বলতে হয়। অতীতে দেখা যেত দলে-দলে গায়করা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভজন-গীত গেয়ে মানুষদের ভক্তিভাব জাগিয়ে তুলতেন। বিহারে ঐ-পদ্ধতিতে আধুনিক ভাবধারা-প্রচারের রীতি অবলম্বিত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের দিয়ে কেমন করে বয়স্কদের ভেতর শিক্ষা-চেতনা আনা যায় তার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে রাজস্থান। কোন-কোন দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে, এই প্রদেশটি অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশি রক্ষণশীল। গ্রামের প্রবীণ লোকেদের মধ্যে সেখানে সাক্ষরতার আন্দোলনে কোন উৎসাহ দেখা যায় নি, বরং তাঁদের ঔদাসীন্যই

প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের তো কথাই নেই। বালিকাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টাও সমর্থন পায় নি, বিশেষ করে গোঁড়াদের কাছ থেকে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে সমস্যা-নাটকের অভিনয় করিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ বয়স্কদের এই ঔদাসীন্য দূর করবার চেষ্টা করেছেন। নাটকগুলিতে নিরক্ষরতার দোষ দেখানো হয়েছে। তাতে কিছু-কিছু সুফল ফলেছে, বয়স্কদের মনোভাবের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে।

৫

সামাজিক শিক্ষায় নারীদের উৎসাহ-আগ্রহের কথাটাও বলবার মতো। এ-বিষয়ে বোম্বাই অগ্রণী হয়েছে, অন্তত কোন-কোন ক্ষেত্রে। রাজস্থান তো এই কিছুকাল আগেও ছিল সামন্ততন্ত্রী শাসনে; কিন্তু সেখানেও সামাজিক শিক্ষার কাজে নারীদের বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। এ কম আশ্বাসের কথা নয়। যাঁদের অবস্থা সচ্ছল, অবসর আছে যাঁদের—এমন মেয়েরা যদি সামাজিক শিক্ষার কাজ করেন তাহলে সুফল ফলতে বাধ্য। বয়স্কা মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকৃত হয়ে শিক্ষালাভ হলে পরের ধাপের মেয়েদের শিক্ষা-সমস্যা আর তত কঠিন থাকবে না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষা-দানের মূল্য বেশি; তাঁদের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাটা ছড়িয়ে পড়তে পারে বেশি। একটি ছেলেকে শিক্ষা দেয়া মানে শুধু তাকেই শিক্ষা দেয়া, কিন্তু একটি মেয়েকে শিক্ষা দেয়া মানে গোটা পরিবারকেই শিক্ষা দেয়া।

নারীদের সামাজিক শিক্ষা সফল হতে হলে দু'টি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি হল—মেয়েদের শেখাবার সময়টা ঠিক করা। কেননা, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তো তাঁদের গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকতেই হয়; তারপর আবার বিকেল গড়াতে-না-গড়াতে কাজে লাগতে হয়। তাছাড়া, দুপুরবেলার কাজকর্ম সেরে তাঁরা সকলেই প্রায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরোন। কেউ-কেউ বা

তখন হয় একটু গা গড়িয়ে নেন, কেউ-কেউ বা গল্পগুজব করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যের সময়টা মেয়েদের শিক্ষাদনের জন্যে নির্ধারিত করা সুবিধাজনক হবে না। তাই বৈকালেই এঁদের শিক্ষা দেবার সময় ঠিক করা ভালো। যেখানেই তা হয়েছে সেখানেই ফল হয়েছে আশানুরূপ।

আর একটা দিক হল বয়স্কা নারীদের শিক্ষাকে সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারিক করে-তোলা। তাঁদের অনেককেই সাংসারিক অভাব-মেটানোর চিন্তায় থাকতে হয় মগ্ন। কী করে যে অল্প আয়ে কুলিয়ে-গুছিয়ে সংসার চালাবেন তার ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন থাকেন তাঁরা। এমনি উদ্‌বিগ্ন মন নিয়ে কেমন করে তাঁরা মন দেবেন শিক্ষায়? তাই তাঁদের জন্যে পরিকল্পিত সামাজিক শিক্ষা এমন হওয়া দরকার যা হবে তাঁদের অভাব-মোচনের উপায়। তবেই এদিকে আগ্রহান্বিত করতে পারা যাবে অভাবগ্রস্ত সংসারের মেয়েদের। আর, তাঁদের সংখ্যাই তো ভারতে বেশি। অতএব, এঁদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে কুটিরশিল্প-শিক্ষার। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আগের চেয়ে এখন সংসারের খরচপত্র বেড়েছে ঢের, পণ্যমূল্য হয়েছে মহার্ঘ। তাই মধ্যশ্রেণীর লোকেদের বাধ্য হতে হয়েছে জীবননির্বাহ-মান নামাতে। শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়েরা যদি রোজগার না করেন তো তাঁদেরও ঐ-দশা হবে। এ আর বলতে হবে না যে, যাতে সংসারের আয় হবে তাতে সকলেরই আশু সমর্থন থাকবে। এই আয়টা দু'রকমে হতে পারে: এক, সোজাসুজি অর্থাগমে; আর, খাওয়া-পরার খরচ বাঁচিয়ে। যে-খাদ্য-পরিধেয় কিনতে হয় তার কিছু-কিছু যদি মেয়েদের তৈরি করতে শেখানো যায় তো সে-শিক্ষা তাঁরা সাগ্রহে নিতে চাইবেন। বিধবাদের তো কথাই নেই। তাঁরা তো এইরকম শিক্ষার কল্যাণে স্বনির্ভর হতে পারবেন।

ভারতের অতীত ইতিহাসের ওপর সিংহাবলোকন করলে জানতে পারা যাবে, জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা থাকে

মানবসমাজ বহুধা-বিভক্ত হওয়ায় ভারতের জাতীয় ঐক্য-সংহতি হয়েছিল শিথিল। ভারতের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্যে সর্বপ্রথম চাই জাতীয় সংহতি। যে-কোন উপায়ে আনতে হবে এটি। নারীদের ভেতরও কুসংস্কার, সংকীর্ণতা কম নেই। তাঁরাও সমগ্র সমাজের অংশ। সুতরাং সমগ্র সমাজের শক্তি-সমৃদ্ধির জন্যে দরকার তাঁদেরও সংহতি। সামাজিক শিক্ষা তাঁদের মধ্যে আনবে সমাজ-বোধ, উদার জাতীয়তা-বোধ। তাতে ঘুচে যাবে তাঁদের মানসিক সংকোচ-জড়তা, কাঠিন্য-কার্পণ্য। ভারতীয় সমাজে যে এখনও জাতিভেদ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে অস্পৃশ্যতাকে অবৈধ বলে বিধান নেওয়ায় এর অপসারণের পথ হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে থেকে এই জাতিভেদ-বোধ যত তাড়াতাড়ি যাবে ততই অদ্ভুৎপনা চলে যাবে।

তাই ভারতের আক্ষরিক জ্ঞানহীনা নারীদের, বিশেষ করে পল্লী-অঞ্চলে, সাক্ষর করে-তোলার ব্যবস্থা করতে হবে অন্তর দিয়ে। দুঃখের কথা হলেও বলতে হচ্ছে যে, এক্ষেত্রে কাজ হয়েছে নিতান্ত নগণ্য। সাম্প্রতিক যুগে সারা দেশে নারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় বেশ সাড়া পড়ে গেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তার ঢেউ তেমনি জোরে গিয়ে পড়ে নি। অথচ আমাদের দেশের বেশির ভাগটাই হল পাড়া-গাঁ নিয়ে। সেই পাড়া-গাঁ যদি থাকে নিরক্ষর-অশিক্ষিত তো তার মানে হবে—দেশের মোটা ভাগটাই নিরক্ষর-অশিক্ষিত। তাই দেশের শিক্ষা-প্রসার-প্রচেষ্টায় পল্লীগ্রামের কথাটাই মনে রাখতে হবে বিশেষ করে। কেবলমাত্র শহরে-নগরেই যদি শিক্ষার বিকিরণ-প্রসারণ হতে থাকে তো দেশে শহর আর গ্রামের মধ্যে ব্যবধানটা আরও বাড়বে বই কমবে না। সে হবে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। তাতে সমাজের ভারসাম্য যাবে নষ্ট হয়ে, দেশের উন্নতি-প্রগতির পথ রুদ্ধ হবেই। পাড়া-গাঁ তো নানাদিকে পিছিয়ে আছেই; [redacted] মেয়েরা আবার আরও পিছিয়ে আছেন শিল্প-সংস্কৃতিতে

সমাজের এই ব্যবধান যাতে যথাসম্ভব ঘুচিয়ে ফেলা যায় তার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

এখনকার বয়স্কা নারীরা যে নিরক্ষর তার কারণ তাঁরা শৈশবে-কৈশোরে লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ পান নি। তার একটা প্রধান কারণ পল্লী অঞ্চলে শিক্ষিকার অভাব। পাড়াগাঁয়ের বেশির ভাগ পাঠশালাতেই শিক্ষক একজন করে: আর শিক্ষিকা তো প্রায় নেই বললেই হয়। এখনও অবধি গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সংস্কার এমনই যে, অভিভাবক-অভিভাবিকারা পাঠশালায়-বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাতে চান না। তার কারণ শিক্ষক আর বেশির ভাগ পোড়োই পুরুষ। তাছাড়া, শিক্ষকরা প্রায়ই হন অপ্রবীণ, আর গাঁয়ের ছাত্রীরা শহরের মেয়েদের তুলনায় প্রায়ই কিছু বেশি বয়সের হয়ে থাকে। আর, তারা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে মানুষ হয় বলে তাদের বাড় হয় কিছু তাড়াতাড়ি। এ-কারণেও অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না মেয়েদের।

তাহলে গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসার ত্বরিত করতে হলে তার তেমনি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে অভিভাবক-অভিভাবিকারা মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অরাজী না হন। এর একটা উপায় হল মেয়েদের জন্যে আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা। এখানে-সেখানে কিছু-কিছু তা করাও হয়েছে। এতে অবশ্য শিক্ষাখাতে খরচ বেড়ে হবে প্রায় দু'গুণ। এখনকার অবস্থায় সে-ব্যয়ের ক্ষমতা দেশের মোটেই নেই। অতএব, নারীদের জন্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে চাওয়া মানে তাঁদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাওয়া।

এই সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান হচ্ছে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকাদের সংখ্যা মেয়েদের সংখ্যা-অনুপাতে বাড়ানো। যেখানে বিদ্যালয়টি একজন শিক্ষকের সেখানে শিক্ষিকা রাখলেই বেশি সুবিধা হবে। দেখা গেছে যে, ছোটো-ছোটো ছেলে কি মেয়ের পক্ষে

নারীরাই শিক্ষা-কাজের বেশি উপযুক্ত। তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে শিক্ষিকা যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাবে না বলে এক শিক্ষকের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষিকা নিযুক্ত করার উপায় নেই।

বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ের সংখ্যা যদি যথেষ্ট হয় তবে সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে দুই-শিক্ষকের বিদ্যালয়ে একটি দম্পতিকে নিযুক্ত করা। তবে মুশকিল এই যে, পাড়া-গাঁয়ে এমন শিক্ষিত দম্পতি মেলা কঠিন। গ্রামের শিক্ষকের জায়া সাধারণত গ্রামেরই মেয়ে হয়ে থাকেন, আর গ্রামে তো নারীদের তেমন শিক্ষা হয়ই না বললে চলে। আবার, শিক্ষক আর শিক্ষিকার মধ্যে যদি কোন সামাজিক সম্পর্ক না থাকে তো তাঁদের নিযুক্ত করাও এক সমস্যা। এই-সব কারণে সমস্যা-সমাধানের জন্যে প্রথম-প্রথম বিশেষ উপায় অবলম্বন করতে হবে।

সেই বিশেষ উপায়টি হল গ্রাম্য শিক্ষকের জায়াকেও বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের জননীস্থানীয়া করে নিযুক্ত করা। তিনি তাদের দেখাশোনা করবেন, দেবেন স্নেহ-ভালোবাসার আশ্রয়। তিনি সেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ জানলে মেয়েদের তা শেখাতে পারেন; আর-কোন শিল্পকাজ জানলে সবাইকেই তা শেখাতে পারেন। মোট কথা, তাঁর উপস্থিতির দরুন বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাতে অভি-ভাবকদের আপত্তি থাকবে না।

শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে নারী থাকলে সেটা সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের বীজ হয়েও বেড়ে উঠতে পারে। তাঁর উপস্থিতির জন্যে গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলারাও আসতে আগ্রহান্বিত হতে পারেন। হাতে-হাতে এই ফলটা লাভ হতে পারে। কেননা, বালিকাদের সংখ্যা বাড়তে সময় নিতে পারে। বিদ্যালয়টি যদি নারীদের মিলনতীর্থ হয়ে ওঠে তো তার মহৎ সম্ভাবনা অনেক। এখন তো গ্রামের মেয়েদের কোন-একটা নির্দিষ্ট মিলনকেন্দ্র প্রায় দেখাই যায় না। যে বলতে আছে এক পুকুরঘাট, নয় কুয়োতলা, নাহয় কারো

বাড়ির উঠোন। আর, তাঁদের মিলনে আলাপ-আলোচনার বিষয়ই বা কী?—গল্পগুজব, নয়তো সেই ছেঁদো সাংসারিক কথা। বিদ্যালয় তাঁদের মিলনস্থান হলে তার পরিবেশে তাঁদের মনের গতির মোড় ফিরবে মূল্যবান চর্চার দিকে। তার ফলে একপুরুষ-কাল-মধ্যে সারা দেশে অপরিমেয় শুভ পরিবর্তন ঘটবে।

৬

একথা ঠিক যে, দেশে সামাজিক শিক্ষার, অন্তত পক্ষে সাক্ষরতার, প্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না। কিন্তু হচ্ছে না কেন?—হচ্ছে না দেশে তার তেমন কদর নেই বলে। দেশের অর্থনীতিক অবস্থায় শিক্ষার যে কী দান তা দেশ এখনও তেমন বুঝতে শেখে নি। শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করেন অনেকেই, তবে শিক্ষা যে অর্থনীতিক মান বাড়াবার উপায় সেকথা বুঝতে বড়ো-একটা চান না; বেশির ভাগ লোকের ধারণা, অর্থনীতিক সাচ্ছল্য থাকলে তবে শিক্ষা হতে পারে। দেশে সম্পদ থাকলেই তো হল না, সে-সম্পদের আবিষ্কার ও ব্যবহার তো হওয়া চাই। তা হতে হলে যে চাই তেমন শিক্ষা। মানব-সমাজে শিল্পবিপ্লব হওয়ার পর থেকে বৈষয়িক সমৃদ্ধি বাড়ল। কিন্তু শিল্পবিপ্লব সম্ভব হল কী করে?—উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির জন্যে। যন্ত্রপাতি তৈরি করলে কে? মানুষ। কোন্ মানুষ?—বৈজ্ঞানিক মানুষ। শিক্ষা না হলে কি মানুষের বৈজ্ঞানিক হওয়া সম্ভব হয়? —কখনই না। বিজ্ঞানের কল্যাণেই এখন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে কয়লা আর খড়ি থেকে খাদ্য-পানীয় তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। তাহলে একথা সিদ্ধান্ত করলে নিশ্চয় ভুল হবে না যে, আধুনিক পৃথিবীতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সমৃদ্ধি নির্ভর করছে বিজ্ঞান-শিক্ষার ওপর।

শুধু যে বস্তুপদার্থের এবং যন্ত্রপাতির আবিষ্কার-ব্যবহারের জন্যেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দরকার তা-ই নয়, পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন

ও বণ্টনের বিলিব্যবস্থার জন্যেও তার প্রয়োজন অনেক। এ-যুগের উৎপাদক শুধু কাছাকাছি জায়গার খরিদদারদের রুচি-চাহিদার কথা জেনেই তৃপ্ত থাকতে পারেন না, তাঁকে ভাবতে হয়, জানতে হয় দূর-দূরান্তরের ক্রেতাদের কথাও। তাই এখনকার উৎপাদন-কর্তৃপক্ষকে ধরতে হয় যথেষ্ট বুদ্ধি, রাখতে হয় চাতুর্য এবং পৃথিবী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান। আর উৎপাদন-কর্মীদেরও যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে কিছু কম জ্ঞানবুদ্ধির দরকার হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সব ক্ষেত্রে সকলেরই দরকার হয় প্রথমত সাধারণ শিক্ষার; দ্বিতীয়ত, উচ্চপদস্থ কর্মীদের উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তৎপরতার।

সব প্রগতিশীল শিল্পপতিই স্বীকার করেন যে, আধুনিক শিল্পের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার ওপরে। একথা অবশ্য বলবার সুযোগ নেই যে, তাঁরা এই স্বীকৃতিকে কাজে পরিণত করতে সর্বদা সচেষ্ট। একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য ভারতীয় শিল্পপতিদের সম্বন্ধে। অন্যান্য দেশে শিল্পপতিরা শিক্ষার জন্যে যা করে থাকেন ভারতের শিল্পপতিরা তার সামান্য অংশও করেন না। দু'-একজনকে অবশ্য ব্যতিক্রম-হিসেবে এই অভিযোগ থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে, তবে এ-ই হচ্ছে সাধারণ সত্য। শিক্ষা যে তাঁদের শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূল হতে পারে—এই কথাটা তাঁরা তেমন করে বুঝতে চান না। তাঁরা এই অভিযোগ করেন যে, যুক্তরাজ্য ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের চেয়ে ভারতীয় শ্রমিকরা অনেক কম দক্ষ। একথা তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, দক্ষতার এই অল্পতা শিক্ষার অভাবের জন্যে। তাই খুব কম শিল্পপতিই শিল্প-শ্রমিকদের শিক্ষা-শিক্ষণের বিলি-ব্যবস্থা করে থাকেন।

উন্নত-অগ্রসর দেশের শিল্পপতিরা একথা বেশ ভালো বোঝেন যে, শিল্প-কর্মীরা নিরক্ষর বা অশিক্ষিত হলে যন্ত্রপাতি থেকে যথাপ্রাপ্য কাজ আদায় করা যায় না। তাঁদের প্রচেষ্টার কথা জানলে বুঝতে

পারা যায় ব্যক্তিগত চেষ্টায় দেশের নিরক্ষরতা কতখানি নির্মূল করা যায়। কোন-কোন দেশে জাতীয় সংবাদপত্রগুলির প্রচেষ্টা থেকে জানা যায় যে, নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষর করে-তোলার ব্যবস্থা করলে কত সুফল পাওয়া যায়। পোর্টোরিকোয় দু'টি সংবাদপত্র ক্রমাগত ছ' মাস ধরে সংবাদপত্রের আধ থেকে দু'টি করে কলাম্ রাখত বয়স্কদের সাক্ষরতা-শিক্ষার জন্যে। দক্ষিণ আমেরিকায় কতকগুলি সংবাদপত্র বয়স্ক-শিক্ষার জন্যে বিনাপয়সায়, কি নামমাত্র দামে বই বিলোত। বইগুলো বার করতে তাদের এমন-কিছু খরচা পড়ত না। তাদের তো ঝড়তি-পড়তি কাগজ থাকতই আর নিজেদেরই ছাপাখানা ছিল; অবসর-সময়টায় পুরোদমে কাজ চালিয়ে ঐ-বইগুলো ছাপিয়ে নেয়া হত। তাতে যে এদের আর্থিক ক্ষতি হত তা নয়। শেষ পর্যন্ত এতে বরং তাদের লাভই হত। কেননা, সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা বাড়লে তাদের কাটতি হত আরও বেশি; তখন তারা বিজ্ঞাপনের হার দিতে বাড়িয়ে। ভারতে কোন সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান যদি এইরকম ধারায় কাজ করে তো তাতে দেশে মস্ত-বড়ো একটা সামাজিক কাজ হবে, আর সেই পত্রিকারও লাভ কম হবে না।

বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টার আর একটা উদাহরণ আছে মার্কিন্ যুক্তরাষ্ট্রে। এ-প্রচেষ্টাতেও ক্ষতি না হয়ে বরং পরিণামে লাভই হয়। সেখানে বীমা-কোম্পানিগুলো খাদ্য ও ব্যায়াম-বিষয়ে সহজ পুস্তিকা বার করে প্রভূত উপকার করেছে। এ-সব পুস্তিকায় কোন প্রচার থাকে না, তবে পুস্তিকাগুলোর মলাটে কোম্পানির নাম থাকে। যে-কেউ চাইলে ওগুলো অমনি পেতে পারে। তাই বইগুলো পড়ে বীমাকারী মানুষের স্বাস্থ্যজ্ঞান বাড়ে; তাতে তাদের আয়ু বেড়ে যায়। তাতে করে কোম্পানিগুলোর ওপর পাওনায় চাপ যায় বেশ কমে। আর, পুস্তিকাগুলোর প্রচ্ছদপটে কোম্পানির নাম থাকায় প্রকারান্তরে প্রচারটাও না হয়ে যায় না। ওগুলো থেকে যথেষ্ট উপকার পাওয়ায় প্রকাশক

কোম্‌পানিগুলোর ওপর মানুষের শুভেচ্ছা না থেকেও পারে না। এইরকম কাজ যদি মার্‌কিন্‌ যুক্তরাষ্ট্রে অমন সুখ্যাতি পেয়ে থাকে তবে এদেশেও বীমা-কোম্‌পানিগুলো যদি ঐ-রীতি নেয় তো প্রশংসা পাবে আরও বেশি। ঐভাবে স্বাস্থ্য ভালো হলে, পরমায়ু বাড়লে মানুষ তার তারিফ না করে পারে? বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, যেখানে মানুষের গড়পড়তা আয়ু হচ্ছে তিরিশ, যেখানে সরকারী স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাও স্পষ্টতই খুব কম।

মার্‌কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র যন্ত্রের কারখানাগুলোও বয়স্ক-শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেও কৃষি এবং সরল যন্ত্রপাতি-ব্যবহার সম্পর্কে নানা পুস্তিকা বেরিয়েছে। এগুলোর কোন-কোনটায় হয়তো প্রচার আছে। কী করে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে আরও বেশি ভালো কাজ হবে সেকথা বলার পর হয়তো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। তা হোক, তবু তো শিক্ষাপ্রসারের কাজটা না-হয়ে যায় না। সেইটেই বা কম লাভ কী? ভারতেও তো অমনি ছোটো-খাটো নানা যন্ত্রপাতি-নির্মাণের কারখানা আছে। বিজ্ঞাপনেও এরা কম টাকাটা খরচ করে না। কিন্তু এদের ক'টাই বা বোঝে যে, নিছক ব্যবসায়ের দিক থেকেও ওতে অর্থবিনিয়োগ পরিণামে লাভেরই হয়। অমনি ধারার পুস্তিকা প্রকাশ করলে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপকার হয় আর তাঁরা কৃতজ্ঞ থাকেন— এতে কি কারবারের প্রচার কম হয়? তাহলেই দেখা যাচ্ছে, এইধারার কাজে সামাজিক শিক্ষার প্রসারও হয়, অবার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেরও প্রচার হয়; তাতে শেষ পর্যন্ত মুনাফা বাড়ে বই কমে না। প্রচারের খরচের টাকার একটা অংশ যদি এই খাতে লাগানো যায় তো তাতে ব্যবসায়ও সমৃদ্ধ হয়, আর দেশের কাজও হয়।

ভারতে বড়ো-বড়ো শিল্পকারবারের কর্তৃপক্ষ বয়স্ক-শিক্ষার প্রসার সোজাসুজিই করতে পারেন। বর্তমান ভারতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ

কারখানা-শ্রমিক আছে। তাদের বেশির ভাগই নিরক্ষর। শিল্প-কারবারগুলি যদি মজুরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তো তাতে তাদের কর্মনৈপুণ্য বেড়ে কারবারেরই লাভ হবে, আর দেশের উপকারও হবে; গ্রামের শ্রমিকদের চেয়ে কারখানার মজুরেরা সাধারণত বেশি উদ্যমী, কর্মঠ, বুদ্ধিমান এবং সচেতন, তাই শিক্ষাগ্রহণে বেশি আগ্রহী। তাছাড়া, এতে উপকার শুধু শহর-সীমায় আটকে থাকবে না, ছড়িয়ে যাবে দেশ জুড়ে। তার কারণ, আমাদের দেশের শ্রমিকরা এখনও নিছক শ্রমিক-শ্রেণী হয়ে শহরে শ্রমিক-পল্লীতেই পাকাপাকি ভাবে থেকে যান না, তাঁরা মাঝে-মাঝে গ্রামে ফিরে যান। তাঁদের গাঁয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাও সেখানে কিছু-কিছু ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে। শিল্প-কারখানার এই বাবদ ব্যয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বলে ধরে আয়কর নির্ধারণ করলে সরকার এই ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিতই করবে।

দেশের শিল্পবাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি কী ভাবে বয়স্ক-শিক্ষার প্রসারে যুগপৎ নিজেদের কারবারেরও সাহায্য করতে পারে—তারই কিছু নির্দেশনা দেয়া গেল এখানে। কথাটা এই: কারবার-কারখানার শ্রমিকরা সাধারণ-শিক্ষিত হলে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি-সমৃদ্ধি হবে, মানে দেশেরই সম্পদ বাড়বে। বাড়বে নানাভাবে। তার একটা হল এই: শ্রমিকরা শিক্ষা পেলে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অপচয় কমবে, কাজ ভালো হবে। শুধু পরিবহণ-শিল্পেই লক্ষ-লক্ষ টাকা বেঁচে যাবে প্রতি বছর। যানবাহনের সযত্ন ব্যবহারে তার ভাঙ্গাচোরা হবে কম, ফলে ঠিকমতো শিক্ষা হলেই তো ভালো মেকানিক হওয়া সম্ভব হবে। এতে যে কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়েরই লাভ হবে তা নয়, দেশেরও সম্পদ বাড়বে; তার ফলে আবার জাতীয় উন্নয়ন-কাজ বাড়বারও উপায় হবে। একমাত্র শিক্ষাই জাতির জীবন-মান-উন্নয়নের বৈষয়িক বুনিয়াদ পত্তন করতে পারে। এরই কল্যাণে মানুষের মন ও চরিত্র গঠিত হলে অবকাশ-যাপনের

সদ্‌ব্যবহার হতে পারবে। ভারত-রাষ্ট্র ব্যক্তি-মুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তা—এই দু'য়েরই নীতি মেনে নিয়েছে। তার লক্ষ্য হল কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। তার এই নীতি ও লক্ষ্য সফল হতে পারে সামাজিক শিক্ষার কল্যাণে।

জানুআরি, ১৯৫৫

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

ভারতে এ-যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ধারার সমালোচনা হয়েছে অনেক। সব সমালোচনারই যে খুব জোরালো যুক্তি আছে তা নয়, তবে কতকগুলোতে কিছু যুক্তি আছে বৈকি। এই কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বড়ো বেশি পুঁথিগত ও অব্যবহারিক। এতে মানুষ জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষা পায় না। এর দোষ এই যে, এ-শিক্ষা পেয়ে মানুষ শারীরিক শ্রমের কাজ এবং গ্রাম্য জীবনের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মোহ বহু উদ্যোগী-উৎসাহী গ্রাম্য তরুণকে শহরের দিকে টেনেছে। তাতে যদি শহরের কিছু লাভ হত তাহলে না হয় বোঝা যেত, কিন্তু তা বিশেষ হয় নি। শহরে এসে শেষ অবধি এদের অনেকেই নানা ব্যর্থতার আঘাতে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হয়; তাতে জীবনের অনুরাগ আর শক্তি যায় অপচিত হয়ে। কিন্তু এরা যদি গাঁয়ে থাকত তো নানা গঠনমূলক কাজে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাতে পারত।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে আর-একটা সমালোচনা আছে। এই সমালোচকরা বলেন: এই নবযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়া হয়েছিল ইংরেজদের রাজকার্য চালাবার লোক তৈরি করবার জন্যে। ইংরেজরা যখন তাঁদের রাজত্ব কায়েম করলেন ভারতে তখন নিজেরা যত ভালো-ভালো বড়ো-বড়ো পদ নিলেন। কিন্তু তাতে তো আর সারা রাজ্যের কাজ চলে না, আরও লোক চাই,—মোটামুটি কিছু লেখাপড়া-জানা লোক। এমনি-সব লোক-তৈরির জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রবর্তন হল। সেইজন্যেই এই শ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেরানী-তৈরির কারখানা ছাড়া কিছু নয়।

এই যে মোটামুটি দু'রকম সমালোচনা—এর ভেতর কিছু-কিছু সত্য যে নেই তা নয়, তবে এতে দোষকে বড়ো বাড়িয়ে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা কিছুটা ভাবধর্মী হবেই। মানুষ যে সৃষ্টির অপরাপর প্রাণী থেকে বড়ো তা কিসে?—চিৎ-শক্তিতে। এই শক্তির প্রকাশ ভাবে, চিন্তায়, স্মৃতিতে ও জ্ঞানে। এই শক্তির কল্যাণে মানুষ কতকগুলো বিশেষ ব্যাপার থেকে নির্বিশেষ সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারে। তাই তার চিন্তা-চেষ্টায় কিছুটা ভাব বা তত্ত্বের প্রভাব না থেকে পারে না। এই ধারার মনোভাব থেকে বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, শুধুমাত্র ভাব-তত্ত্ব-ধর্মী শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়; এই দুইয়ের সমন্বয়ে-সামঞ্জস্যে যে-শিক্ষা তা-ই হল ঠিক শিক্ষা। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে-পরিমাণে এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেই পরিমাণে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারার সমালোচনাও একদেশদর্শী, অতিদোষদর্শী। হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পোড়োই আরামের চাকরি পেলে খুশী হয়, কিন্তু তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু কেরানী-তৈরির যন্ত্র—এমন কথা বলা ঠিক হয় না। ব্রিটিশ ভারতে নয়াধারার শিক্ষাটা এল কোন্ কোন্ সূত্রে তা না জানলে এর স্বরূপ ও হেতু নিরূপণ করা সহজ হবে না। শুধু যে ইংরেজ শাসক-প্রশাসকরাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা তো নয়, করেছিলেন ক্রিশ্চান্ মিশনারীরা, আর অল্পসংখ্যক ভবিষ্যৎ-দর্শী ভারতীয় মহাপুরুষ। তাঁরাই ছিলেন ভারতের নবজাগৃতির অগ্রদূত বা পূর্বসাধক। তাঁদের সেই উদ্‌বোধন-প্রবর্তনের ফলেই ভারতীয় জীবন নতুন আশায়-এষায়-ভাষায়, উৎসাহে-উদ্যোগে-উদ্যমে উজ্‌জীবিত হয়ে উঠল উনিশ শতকে। তাছাড়া, এই কথাটা ভুললে চলবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য যদি শুধু কেরানী-তৈরি হবে তবে তাতে গণিত, লজিক, রাজনীতি, কাব্য-সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মতো বিষয়-পাঠনের নির্দেশ থাকবার দরকার কী? তাহলে তো কেবল সংক্ষেপ-লেখন, হিসাব-শিক্ষা ইত্যাদি অফিসের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোই পাঠ্য হত।

ঐ-দু'টো ধারার সমালোচনা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, একটি ধারা অপরটির অনেক যুক্তি খণ্ডন করে দিচ্ছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা যদি তত্ত্ব-ভাব-ধর্মী হয় তো তা যে কেরানী-তৈরির জন্যে নয়—সেই কথাই প্রমাণিত হয়। আর যদি কেরানী-তৈরির যন্ত্র হয় তবে তাকে অকেজো বলে নিন্দা করা যাবে কেমন করে?--এর পরেও হয়তো কেউ-কেউ তর্ক করবেন যে, দেশে যত-সংখ্যক কেরানী দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি বেরোয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু এ-যুক্তিতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা অকেজো।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষত্রুটি কি নেই?—আছে. গলদ হচ্ছে—শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সংখ্যার অভাব, উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, আর সবার ওপর অর্থের অপ্রাচুর্য। শিক্ষকের অভাব শুধু যে সংখ্যায় তা-ই নয়, অভাব যোগ্যতায়ও। শিক্ষিত শ্রেণীর যোগ্যতম, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শিক্ষাবৃত্তি নেন না; এর মুখ্য হেতু হচ্ছে শিক্ষাবৃত্তিতে যথেষ্ট, সংগত পারিশ্রমিকের অপ্রাপ্যতা। কাজে-কাজেই সমস্ত সমস্যাটা এসে ঠেকেছে অর্থের ব্যাপারে। অর্থের অপ্রাচুর্যের জন্যে শুধু যে যোগ্য-দক্ষ শিক্ষকের অভাব হয় তা-ই নয়, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ল্যাবরেটারি প্রভৃতিরও দৈন্যদুর্দশা ঘোচে না। সাধারণত এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ এমনই অপ্রশস্ত-অপরিসর যে, সেখানে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের কঠিন কাজ করার উৎসাহ যায় উবে। এই অর্থসংকোচের ফলেই ছাত্র-সংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না। উচ্চশিক্ষ

সম্বন্ধে মানুষের ধারণারও ভ্রান্তি আছে ঃ এ-ও এক বিপত্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতে আগে ছাত্ররা পরে ভালো চাকরি পাবার আশায়। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রথম যুগে এ-শিক্ষা নিত খুব কম লোকই। তাই তারা পেত ভালো-ভালো কাজ। এ থেকে ঐরকম ধারণাটা এসেছে। কিন্তু এখন যে বহু ছাত্র পাশ করে বেরোচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা পেয়ে। এখন আর অত ব্যক্তিকে চাকরি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা হচ্ছে তীব্র সমালোচনা আর নিন্দার বিষয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দায়ী করলে ঠিক হবে না, করতে হবে অর্থনীতিক অবস্থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার যে কোন দোষত্রুটি, বাধাবিপত্তি নেই সেকথা বলা হচ্ছে না। তবে এ-ও মানবার কথা যে, ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে নবজাগরণ আনায় অনেকখানি আনুকূল্য করেছে এই শিক্ষাধারা। রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি আনার ব্যাপারেও এর দান অন্যতম প্রধান। তবে ভারতের পরাধীন অবস্থার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমনটি ছিল এখন তো আর তাদের ঠিক তেমনিটিই রাখা যায় না; রাজনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের দাবিতে তাদেরও যথেষ্ট সংস্কার হওয়া দরকার। ভারত গণতন্ত্রী ছাঁচের সরকার প্রবর্তন করেছে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বসাধারণের উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্যে সুযোগ-সাম্যের বিধি-বিধান ও ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা যাতে এই লক্ষ্যে পৌছবার মতন মন তৈরি করতে পারে, যাতে তা যুগোপযোগী হয়ে ঐ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিতে পারে মানুষকে তারই ব্যবস্থা করতে হবে এখন।

২

অতীত যুগ থেকে আধুনিক যুগকে পৃথক বলে ধরা হয় দু'টো যুগের লক্ষণ-পার্থক্যের জন্যে। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ হল অনুভূতি ও চিন্তার আবশ্যিকতা এবং মানব-সমাজের বৃহত্তর সংহতি।

এখন আর প্রায় কোন মানুষেরই চিন্তা-ভাবনা না করলে চলে না। এখন কোনদেশের মানব-সমাজ পৃথিবীর অপরাপর অংশের মানব-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট বা নিঃসম্পর্ক হয়ে থাকতে পারে না। প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করে দেশে-দেশে যাওয়া তত সম্ভব বা সহজ ছিল না মানুষের পক্ষে। তাই গিরিদরিমরু-পারের দেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত; একদেশের মানুষ সম্বন্ধে অপরদেশের মানুষের কোন জ্ঞান-পরিচয় প্রায় ছিল না বললেই হয়। যাত্রাপথে দুর্জয় প্রাকৃতিক বাধাগুলোর জন্যে যাত্রায় সময়ও লাগত খুব বেশি। যাত্রাকালের দীর্ঘতার দরুন বিভিন্ন সমাজের মানুষের ভেতর শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য হত। স্থান আর কালের দূরত্ব এখন অপসারিত হয়েছে, আরও হতে চলেছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-গবেষণা এবং নির্মাণ-বিজ্ঞানের উন্নতির কল্যাণে এখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা লাগে।

মানব-সমাজে এই আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার সূচনা হয়েছিল কখন?—প্রায় তিন-চারশো বছর আগে। টয়েনবি নামে এ-যুগের এক ইতিহাসতাত্ত্বিক একজায়গায় বলেছেন, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রেট ব্রিটেন থেকে রোম যেতে কোন রোমান সম্রাটের যে-সময় লাগত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একজন ব্রিটিশ কূটনীতিকের রোম থেকে লন্ডন্ যেতেও ঠিক একই সময় লাগত। উনিশ শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক সাধনায় ও নির্মাণ-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটল। ফলে ঐ-যাত্রাটা সমাধা করার সময় কমে হল ২৪ ঘণ্টা। দিন-দিন এ-বিষয়ে এত উন্নতি হয়ে চলেছে যে, জেট বা এই ধরনের দ্রুতগামী বিমানে লন্ডন্ থেকে রোম কি রোম থেকে লন্ডন্ যাত্রা করতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ২৪ মিনিট লাগবে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে স্থানকালের ব্যবধান যেমন কমেছে তেমনি হয়েছে প্রকৃতির নানা শক্তি ও উপাদানকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা।

অবশ্য, বিজ্ঞানের বলে মানুষের ধ্বংস-শক্তিও কম বাড়ে নি। অতীতে কোন জাহাজ সমুদ্রপথে যদি কুয়াশার বেড়াজালে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হত হবে তার আর রক্ষার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন আর সে-ভয় নেই। এখন যদি কোন নাবিক দূর সমুদ্রে পথ হারান তো বিমান ও বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে তিনি হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। তার ফলে উদ্ধার-কারীরা সেখানে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন। বিনাশের ক্ষেত্রেও তেমনি মানুষের শক্তি কিছু কম বাড়ে নি। অতীতে মানুষের অস্ত্রশস্ত্রে আর কত মানুষ মরত?—এখন একটি আণবিক কি হাইড্রোজেন বোমায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

এই যে যানবাহনের গতিসত্বরতা—এর ফলে সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও কম পরিবর্তন ঘটল না। এই জন্যেই এখন দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, সমগ্র মানব-সমাজেই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এত দরকার হয়ে পড়েছে। অতীত যুগে মানব-সমাজের মিলন-সংহতি ব্যাহত হত প্রাকৃতিক বাধায়। তখন এক-একটা মানব-সমাজ আপন ঐতিহ্য-প্রথা-পদ্ধতি আর আচার-সংস্কারের গণ্ডিতে আটকে থাকত, থাকতে বাধ্য হত, থাকলেও তত হানি হত না। কিন্তু এখন আর তা হলে চলে না। দূর-দূরান্তের মানব-সমাজ এখন কাছে এসে গেছে; তাই মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব এখন আর রাখা চলে না, রাখা ঠিক নয়। তাতে বিরোধ-বিবাদ পাকিয়ে উঠে সর্বনাশা ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হবে। সারা পৃথিবীর মানব-সমাজ এখন যেন একপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এখন সমগ্র মানব-পরিবারের হয় একসঙ্গে উত্থান, নয় একসঙ্গে পতন। এই হবে এযুগের নীতি ও আদর্শ; কিন্তু এখনও হয় নি তা। মানুষের মন এখনও আছে পিছিয়ে, সুর মেলাতে পারে নি এই পরিবেশের সুরের সঙ্গে। মানুষের সত্তায় এখন দু'টো ভাগ হয়ে

গেছে যেন: একদিকে তার সহজাত আবেগ-সত্তা, অপরদিকে বুদ্ধিসত্তা। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ বুঝছে যে, আধুনিক পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজ নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত, কিন্তু তার চিরাচরিত নানা সংকীর্ণ ভাবাবেগ আর সংস্কার সে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে না; সাম্প্রদায়িক, জাতীয় প্রভৃতি বিবিধ অচলায়তনিক রীতিনীতি পূর্ণরূপে ফুটে উঠতে দিচ্ছে না তার বুদ্ধিস্বীকৃতিকে। এটাই হল এযুগের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

মানব-সমাজের ইতিহাস থেকে জানা গেছে যে, মানুষের কোন সাংস্কৃতিক অবদান-সম্পদ যদি কোন-একটা সম্প্রদায়ের ভেতর আবদ্ধ হয়ে থাকে তো শেষ পর্যন্ত তা লুপ্ত হতে বসে; সারা মানব-সমাজই তার হিতকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়। আধুনিক গণতন্ত্রী সমাজে মানুষের যা-কিছু শ্রেয়-প্রেয়, যা-কিছু সর্বকল্যাণকর—তাকে সর্বজনলভ্য করে-তোলাতেই গণতন্ত্রের সার্থকতা। ভারতের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকে যদি সার্থক হতে হয় তো দেশবিদেশের মানুষের সংস্কৃতি-সাধনার সঙ্গে ভারতবাসীদের পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। এখন সারা পৃথিবীর মানব-সমাজের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা। এখন আপন সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় পেতে হলেও দরকার আর-আর সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়। সেকালে রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কটা তত ঘনিষ্ঠ ছিল না; একালে কিন্তু তা নয়। এখন এই দুই-এর সম্বন্ধ প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে-ওঠায় মানুষের ব্যক্তি-জীবনেও রাষ্ট্রকে কিছুটা হস্তক্ষেপ করতে হয়। এই-সব কারণেই এখন যে-কোন নাগরিকের রাজনীতি-অর্থনীতির ব্যাপারে অল্পবিস্তর জ্ঞান না থাকলে নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য কী?—মানুষের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তীর্ণ করা। বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সীমিত। তাই সেই সীমিত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকলে মানুষের প্রগতির পথ হবে সংকীর্ণ। মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্য কাল আর

সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার শক্তিতে। মানুষ যে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে এগিয়ে গেছে তা এই শক্তির গুণে। এটি না থাকলে শারীরিক শক্তিতে হীন মানুষ বহুকাল আগে জবরদস্ত জাঁনোয়ারদের কাছে হার মেনে চলে যেত সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে। শিক্ষাই সেই অভিজ্ঞতাকে বাড়াবার সুযোগ দেয়। তাই শিক্ষা যত বাড়বে মানুষের অভিজ্ঞতার সীমানা ততই প্রশস্ততর হতে থাকবে।

উপস্থিত পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; খুব অল্পসংখ্যক ভাগ্যমন্তই তা পায়। এখনও বহু দেশে তো প্রাথমিক শিক্ষাই বহুজনকে দেয়া সম্ভব হয় নি। এ-যুগে শুধুমাত্র টিকে-থাকার জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার। এই শিক্ষার স্তরেই অধিকাংশ লোকের শিক্ষা শেষ হয়। প্রায় শতকরা আশিজন লোক এর পর আর শিক্ষা নিতে উদ্যোগী হয় না। সাধারণত এরা আপন স্থানের দশ-বিশ মাইলের পরিধির বাইরে বড়ো-একটা চলাফেরা করে না।

খুব কম সংখ্যার লোকই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে উচ্চশিক্ষা নেবার জন্যে উদ্যোগী হয়। এই লোকসমষ্টিকেও আবার দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়ঃ একটা বড়ো, একটা ছোটো। বড়ো ভাগটা মাধ্যমিক শিক্ষার পর আর এগোয় না, ঐখানেই শিক্ষার ইতি করে। প্রাথমিক-শিক্ষিত লোকদের অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তির চেয়ে যে মাধ্যমিক-শিক্ষিত লোকদের শিক্ষা ও বোধশক্তি বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাতে বড়োজোর ব্যক্তি ও সমাজের অল্পপরিসর ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো মিটতে পারে; দেশ ও সমাজের বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ, অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্ধারণে, এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-স্থাপনে মাধ্যমিক শিক্ষাও যথেষ্ট নয়। এর জন্যে দরকার উচ্চতর শিক্ষার। অল্পসংখ্যক লোকই এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পায়। কিন্তু তা হলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও সমস্যা-সংকট-সমাধানের প্রয়োজনে

এঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষকে।

গণতন্ত্রকে যদি সফল ও সার্থক হতে হয় তবে অন্তত সাধারণ শিক্ষা সব নাগরিককেই দেয়া চাই। এটা রাষ্ট্রের ন্যূনতম কর্তব্য। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষা যেমন তার একান্ত কর্তব্য এ-ও তেমনি। এই সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা-ব্যাপারটা এত বিশাল ও ব্যাপক যে, যেমন-তেমন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে সে-কাজ সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিক-শিক্ষকদের জ্ঞানবোধও আরও বেশি থাকা দরকার। মাধ্যমিক-শিক্ষকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-মানের শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যদি সরকারকে করতে হয় তবে তারও জন্যে তেমন যোগ্য বহু মানুষ চাই, কেননা, সেই ব্যবস্থার জন্যে অফিস খুলতে হবে স্থানে-স্থানে। এই লোকগুলিকে নিশ্চয়ই যথার্থ শিক্ষিত ও জ্ঞানবোধসম্পন্ন হতে হবে; প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সে-জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়-মানের শিক্ষাও প্রসারিত হওয়া দরকার।

একালেব পৃথিবীতে একদিকে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা অপরদিকে উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজে এর দাম অনেক। দেশের লোকদের জীবন-মান উন্নীত করতে হলে দরকার বৈষয়িক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। শিক্ষা ব্যাতিরেকে তা হওয়ার পথ নেই। শিক্ষা দ্বারাই দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়। শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের বস্তু-বিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় হয়ে থাকে। দেশে দারিদ্র্য থাকে তার মানুষের অজ্ঞান-অশিক্ষার জন্যে, আর সমৃদ্ধি আসে তাদের শিক্ষা-জ্ঞান থেকে। বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন কী না সম্ভব হচ্ছে? বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে দেশে কোন অভাব-

অনটন থাকবার কথা নয়। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে উচ্চশিক্ষার দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় সেইজন্যেই এত প্রয়োজনীয়।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক জ্ঞান-পরিচয় এবং পারস্পরিক বোঝাবুঝি, সহিষ্ণুতার চর্চা ও শিক্ষার জন্যেও চাই বিশ্ববিদ্যালয়। এযুগে সারা পৃথিবীর মানব-সমাজকে ছেড়ে কোন দেশ থাকতে পারে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়, রাখলে ভালো বই মন্দ হয় না। এখন এই সম্পর্ক যাতে প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগের হয় তারই ব্যবস্থা ও চেষ্টা করতে হবে। নইলে, বিরোধ-বিসংবাদের পথে গেলে এখন মানবজাতি ও সভ্যতার সমূহ বিনাশের আশঙ্কা, কেননা, বিজ্ঞানের বলে এখন অস্ত্রশস্ত্রও ভীষণ মারাত্মক ও সাংঘাতিক হতে পেরেছে ও পারছে। এই প্রণষ্টির পথে মানুষকে না যেতে দিতে হলে মানুষের মধ্যে জাগাতে হবে শুভবুদ্ধিকে। উচ্চশিক্ষাই দিতে পারে সেই শুভচেতনা। অন্ততপক্ষে যাঁরা দেশের নীতি ও আদর্শ নিরূপণ করেন তাঁদের সেই উচ্চশিক্ষা থাকা অপরিহার্য।

যে-কোন সমাজেই নেতা-নায়কদের স্থান বেশ গুরুত্বযুক্ত। নেতা নইলে বিরাট সাধারণ জন-সমাজ চলতেই পারে না। পথের নির্দেশ, লক্ষ্য-নির্ধারণ, আর কর্মসূচী-প্রস্তুতি প্রভৃতির কাজ তো নেতারাই করেন। অ-গণতন্ত্রী সমাজে নেতৃত্বের অধিকার-ব্যাপারটা জন্মগত বা কৌলিক ; নেতার ছেলেই নেতা হবেন, রাজার ছেলে রাজা, হোতার ছেলে হোতা, মোড়লের ছেলে মোড়ল,—তা তাঁদের প্রয়োজনীয় গুণ-শক্তি থাকুক আর না থাকুক। গণতন্ত্রী সমাজে তা হয় না। সেখানে নেতৃত্ব-নায়কতার অধিকার গুণগত। এই সমাজে অধিকার-সুযোগের সাম্যনীতি স্বীকৃত বলে এখানে যে-কোন মানুষেরই অধিকার থাকে নেতা হবার। কিন্তু শিক্ষা-জ্ঞান না থাকলে সে-সুযোগ ঠিকমতো গৃহীত হতে পারে না। সুতরাং এর জন্যেও শিক্ষার অতীব প্রয়োজন। তাছাড়া, সাধারণ মানুষ যাতে নায়ক-নেতাদের নেতৃত্ব-পরিচালন ঠিক বুঝে-সুঝে নিতে পারে,

তাঁদের চিনে নিয়ে নির্বাচন করতে পারে তার জন্যেও উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা কম নয়। সেকালে নেতারা ভুল করলে জাতির দুঃখদুর্ভোগ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একালে তাঁদের ভুল হলে জাতির সর্বনাশের আশঙ্কা। তাই তো এখন সবদিক থেকেই প্রয়োজন উচ্চশিক্ষার।

গণতন্ত্রী সমাজে নেতানায়কদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে সেখানে শিক্ষাধারা যে জাতীয় ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়া দরকার, তা বলাই বাহুল্য। তা হলে সমাজের সব জায়গা থেকেই নেতা নির্বাচিত হবার সুযোগ হবে। কিন্তু, একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার সুযোগ-সাম্য থাকলেও নানাভাবে মানুষে-মানুষে তফাত থাকবে। সব লোকেরই শিক্ষা-জ্ঞান সমান হয়ে যাবে না। তা না যাক। তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। গণতন্ত্রী সমাজে এ-বৈচিত্র্য বেখাপ্পা হবে না। এতে শুধু এইটুকু দেখার থাকে যে, যোগ্য লোকের ওপরই যেন গুরুকাজের ভার থাকে। সব লোক রাষ্ট্রীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করলে অনেক সন্ন্যাসীতে রাষ্ট্রীয় কাজের গাজন নষ্ট হতে বসবে। আর একটা কথা—শিক্ষার সুযোগ-সাম্য থাকলেও কেউ-কেউ আপন-আপন শক্তি-প্রতিভা-বলে অনেককে ছাড়িয়ে যাবেন। তাঁদের সেই অসাধারণ শক্তির স্বাকৃতি না-হওয়া সত্যিই তেমনই দোষের, যেমন দোষের সুবিধায় প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অযোগ্য লোকদের স্বীকৃতি হওয়া।

৩

প্রত্যেক দেশের জীবনযাত্রার রীতিতে দু'টো শক্তি কাজ করে—একটা স্থিতির, একটা গতির। জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকটা স্থিতির আর নবাগত চিন্তাধারা ও কাজকর্মের দিকটা গতি বা পরিবর্তনের। এই দুই-এর ভেতর একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করাই হচ্ছে উচ্চাশিক্ষার অন্যতম কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার মধ্যে

দিয়ে করবে এই কাজ। অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি করেও তাই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও তা করতে হবে। কোন সমাজই একেবারে অচলায়তন হয়ে থাকতে পারে না। বাইরে থেকে ক্রমাগত নানা নবনব ভাবের স্রোত এসে পড়ে। তার চাপে সমাজের পুরোনো আদলের বদল হয়েই চলে। পরিবর্তন-সচেতনতা জাতির জীবনের লক্ষণ। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, এই পরিবর্তন-শীলতা যেন সমাজের অভ্যন্তরীণ ঐক্যসংহতি আর স্থিতিশক্তিকে একেবারে উপড়ে না ফেলে। ফেললে সমাজদেহে বিরাট ভাঙন ও বিনষ্টি দেখা দেবে।

কোন-কোন দেশে বড়ো-বড়ো বিপ্লব ঘটে জাতির আদর্শ-নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিপ্লব থেকে যে-পরিবর্তন হয় তার বেগটা থাকে প্রবল, কিন্তু তা পুরোপুরি দেশ-ছাড়া হয় না, দেশের ঐতিহ্যে তার বীজ থাকে। ফ্রান্স্ ও রাশিআয় যে-বিপ্লব হয়েছিল তার মূল ছিল ঐ দেশদু'টির জাতীয় চরিত্রে, ওদের ইতিহাসে। এই যে দু'টি বিপ্লব—এ দু'টিও রূপে-স্বভাবে এক ছিল না। বিপ্লবের পরিবর্তন প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে আসে বলে তাকে আকস্মিক মনে হয়, কিন্তু, আসলে তা আকস্মিক নয়। তার ক্রিয়া সমাজ-দেহের ভেতরে অনেককাল ধরে কাজ করে আসে, তার প্রকাশটাই হয় জোরের সঙ্গে। মোটকথা, জাতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিবর্তনের যোগ না থাকলে তাতে বিনাশের বিপত্তি দেখা দেয়। এর উদাহরণ আছে মানব-ইতিহাসে। যেখানে একটি প্রাচীন সমাজে অগ্রসর সভ্যসমাজের ধারা-ধরন এসে পড়ে সেখানে দেখা দেয় অমনি বিপত্তি। অস্ট্রিক্ কি রেড্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ইওরোপীয় ভাবধারা এসে-পড়ার ফলে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি গেছে বিনষ্ট হয়ে; শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তারা।

সমাজের ঐ স্থিতি আর গতি-শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হলেই ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ-স্বস্থ অভ্যুদয় হতে পারে। সৃষ্টির বস্তুলোকে

যেমন মানব-সমাজেও তেমনি কাজ করে চলে স্থিতিশীলতার রীতি। অবস্থার চাপে না পড়লে সাধারণত মানুষ পরিবর্তন ভালবাসে না, শিক্ষাও রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শিক্ষাই সমাজে পরিবর্তন আনার একটা উপায়। অবশ্য, শিক্ষা রীতি-প্রথার মতো রক্ষণশীল কখনই হয় না। এর মধ্যে একটা এই গুণ থাকেই থাকে যে, এর কল্যাণে প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী—নানা প্রকারের আচার-সংস্কার মানুষের জানা হয়ে যায়; তার ফলে মন কিছু-না-কিছু উদার ও সহিষ্ণু হয়ই হয়। এই যে নানা আচার-সংস্কারের জ্ঞান-পরিচয়—এটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে অতখানি পাওয়া যায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের চিরাচরিত, গতানুগতিক সামাজিক রীতি-প্রথা ও আচার-সংস্কারে পরিবর্তন স্বীকার করবার মতো মন তৈরি করতে পারে শিক্ষা; অথচ এই শিক্ষা আকস্মিক কোন নাড়া দিয়ে যে এই মনোভাব আনে তা নয়। আদিমধর্মী সমাজগুলোতে সামাজিক আচার-বিচারেরই প্রভাব বেশি। শিক্ষার অভাবে সেখানে আত্মরক্ষা ও বহিঃস্থ জীবনচর্যা-গ্রহণের শক্তি কম থাকে। তাই সভ্য-সমৃদ্ধ সমাজের সংস্পর্শে এলে ওরা নিজেদের সত্তা-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। অভ্যাগত সেই সভ্য সমাজের গ্রহণযোগ্য জিনিসগুলো যে নেবে তেমন মনোভাবও থাকে না তাদের। শিক্ষা যত উন্নত হবে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ততই হবে বিস্তীর্ণ। সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতির কোন্‌গুলো ভালো, কোন্‌গুলো মন্দ, কোন্‌গুলো স্থায়ী মূল্যের, কোন্‌গুলো অস্থায়ী ও তাই বর্জনীয়—সে-জ্ঞান দিতে পারে উচ্চশিক্ষাই। পুরানো-নতুন, পরিচিত-অপরিচিত, বিষয়ের দোষগুণ বিচার করার শক্তি আসে এই উচ্চশিক্ষা থেকে। সব-কিছুর সামঞ্জস্য-সমন্বয় করে চলবার মতো মতিগতি ও ক্রিয়াশক্তি আসতে পারে এই উচ্চশিক্ষার পথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হল এইরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোরও এই লক্ষ্যের কথা মনে রাখতে হবে

৪

এখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ কর্তব্য কী হবে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নানা সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধক হতে হবে। একথা প্রথমটা বেখাপ্পা শোনাতে পারে, কেননা, ভারতের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই তো এই সমন্বয়-সাধন। তবে, আবার ওকথা নতুন করে বলার দরকার কী? —দরকার এই যে, সমন্বয়সাধন এখন সচেতন চিন্তা-কর্মের ক্ষেত্রে হওয়া চাই, শুধু ভাবাবেগের তাগিদে হলে হবে না। এখন ভারতের বিভিন্ন সমাজ-সম্প্রদায়ের নীতি-মতের যে-পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বা সমন্বয় দেখা যায় তা প্রধানত গতানুগতিক, অভ্যাস-চালিত। ভারতের এই সমন্বয়-রীতির মূল্য অস্বীকার করবার নয়, তবে এই-ই যথেষ্ট নয়। এই সমন্বয়-রীতিকে এখন যদি সজ্ঞান প্রচেষ্টা দিয়ে প্রণোদিত করতে পারা যায় তবে কাজ আরও ভালো হবে। এইটে না-হওয়ার জন্যেই ভারতের ইতিহাসে কতকগুলো অনর্থকর বিপর্যয় ঘটেছে।

ভারতে সংহতি-সমন্বয় যে সজীব-সক্রিয় নয় তার একটা প্রমাণ এখানকার তিনটি ধারার শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রতীচ্য দেশগুলিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-নিকেতনের রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানের স্বাতন্ত্র্য-পার্থক্য থাকলেও—একটা সাধারণ ঐক্যধারা ওগুলোর সর্বত্র অন্তঃশীল হয়ে থাকে। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিতে বস্তুবিজ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল। এর এই বিজ্ঞান-মনস্কতার মূলে আছে গ্রীক ও হিব্রু সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ঐতিহ্য। ওদেশগুলোতে যে শিক্ষার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে বিভিন্নতা নেই তা নয়, তবে সে-ভেদ ভারতীয় শিক্ষাধারার পার্থক্যের মতো নয়।

আধুনিক ভারতে তিনটি শিক্ষাধারা পাশাপাশি চলে: একটি প্রাচীন, একটি মধ্যযুগীয়, আর-একটি আধুনিক। প্রাচীন-ভারতীয় বিদ্যাচর্চা প্রথমটায় প্রধানত ছিল দার্শনিক-ভাবাপন্ন; পরে হয়ে

দাঁড়াল ভাব-ভাবনা-ধর্মী, এবং অতিরিক্ত ঐতিহ্য-নির্ভর। প্রাচীন-ভারতীয় সমাজে অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন শিক্ষা-জ্ঞানের অধিকারী। তার ফলে শিক্ষা হয়ে বসল স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত। সাধারণ লোকে যে শিক্ষা কিছুই পেতেন না তা নয়; পুরাণ, কাহিনী, গুরুপুরোহিত-সাধুসন্তদের কথকতা ও উপদেশ-পরামর্শের মধ্যে দিয়ে যেটুকু জুটত। কিন্তু সে অতি সামান্য। এতে সমাজ দু'টো বিপরীত থাকে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার একদিকে ছিলেন সুশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা, অন্যদিকে অগণিত অশিক্ষিত নরনারী। এহেন সমাজ যে গতানুগতিক বাঁধাপথে চলবে সে আর বিচিত্র কী।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসকরা ভারতে আরব-পারস্যের শিক্ষাধারা কিছুটা প্রবর্তন করেছিলেন। মুসলিম ধর্ম প্রথম দিকে ছিল বৈপ্লবিক ও গণতন্ত্রী। এর ফলে এর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল গণতান্ত্রিকতা, কিন্তু সে ছিল শুধু ঐ-চিন্তায়, বাস্তবে এশিক্ষাও ছিল অল্পসংখ্যক লোকের ভেতর আবদ্ধ। জন্ম ও জাতির বাধা অবশ্য এখানে ছিল না, কিন্তু শিক্ষার কালপর্ব ছিল এত দীর্ঘ, আর পাঠ্যবিষয় এত কঠিন যে, বিশেষ অনুরাগী লোক ছাড়া আর কেউ তাতে লেগে থাকতে পারত না। প্রাচীন যুগের শিক্ষাধারার মতো এ-ধারাটিও হয়ে গেল গোঁড়া ও মামুলী। আরও দুঃখের বিষয় হল এই যে, ভারতীয় ধারার সঙ্গে এর কোন যোগ রইল না; বরং প্রায় তার বিপরীত রীতিতে চলতে লাগল এই মধ্যযুগীয় ধারাটি। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাধারা দু'টি যদি মাঝে-মাঝে মিলতে পারত তবে এদের গোঁড়ামি অনেকখানি যেত কমে। কিন্তু তা তো হয় নি। ধারাদু'টি সমান্তর দু'টি রেখার মতো পাশাপাশি থেকেছে, কিন্তু মিলতে পারে নি কখনই।

তারপর এল ইংরেজ-আমল; সঙ্গে-সঙ্গে এল ইংরেজী শিক্ষা-ধারা। কিন্তু এর পরও বিভিন্ন শিক্ষাধারায় এল না মিলন। এতে কেবল আর-একটা ধারা বাড়ল এইমাত্র। কি শিক্ষার নীতি-নিয়ম,

কি তার বাস্তব প্রয়োগ—সব ক্ষেত্রেই এই ইওরোপীয় শিক্ষাধারা সকলের জন্যেই শিক্ষার সুযোগ-পথ খুলে দিল। এই ব্যবস্থায় জাতিধর্মের ভেদ স্বীকৃত হল না। বরং কোন-কোন উপেক্ষিত শ্রেণীই প্রথমে এই নীতির সুযোগ নিল। এই শিক্ষাধারায় ছিল বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচারশীলতার স্থান। তার ফলে ভারতের শিক্ষাধারায় এক নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হল; জীবনে এল নতুন চেতনার জোয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভেতর উদ্‌দীপ্ত হল সত্যাসত্য-নির্ধারণের ইচ্ছা-চেষ্টা। কিন্তু এতেও থেকে গেল একটা দোষ। এতে আবার প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে একটা জাতীয় শিক্ষাধারা গড়ে-তোলার কোন চেষ্টাই হল না।

কিন্তু একই দেশে বাস করে বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের মানুষ কি একেবারে ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকতে পারে?—না। কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার ফলে তাদের মধ্যে সংস্পর্শ-সংযোগ না ঘটেই পারে না। টিকে-থাকার, বেঁচে-থাকার দাবিতে হিন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়া করতেই হয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকেই অনেক ক্ষেত্রে মিলিত হতে হয়েছিল তাঁদের। শহরে-নগরে, রাজদরবারে মেলা-মেশার ফলে এবং বৈষয়িক উন্নতির আশায় আচার-ব্যবহারে এল কিছু-কিছু সাম্য। পল্লীতে-গ্রামে চৈতন্য, নানক, রামানন্দ প্রভৃতির মতো মহাপুরুষদের, তথা ধর্মপ্রচারক, কবি ও সংগীতশিল্পীদের প্রচেষ্টায় হিন্দুদের শুধু আপনাদের-নিয়ে-থাকার ভাব অনেকখানি গেল কেটে; ফলে হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান নিশ্চয় কমল। মুসলিম সম্প্রদায়ের কবীর, চিস্‌তি এবং নিজামুদ্দিনও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষাধারার কিছু-কিছু চুয়ে পড়ে মিশেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে, কিন্তু মিশ্রণের ফলে এদের বৈশিষ্ট্য গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। ইংরেজরা এদেশে আসার পর এই-রকম যোগাযোগ নতুন

করে ঘটেছে। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে প্রাচীন রীতিপ্রথা কিছু-কিছু বদলাতে শুরু হয়েছিল সত্যি, কিন্তু, এখানেও সমন্বয়টা হয়েছিল জীবনযাত্রায়, বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে নয়।

ভাবাবেগ, অনুভূতি ও জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এইরকম সন্নিহিতির দাম যথেষ্ট। একে সংহতি-সমন্বয়ও বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-সমন্বয় পূর্ণাঙ্গ নয়, নয় দৃঢ়ভিত্তিক। সচেতন প্রচেষ্টা এবং বিচারশীল মন না থাকলে তা হতে পারে না। যে-কোন রকমের জৈব প্রেরণায় যে-দোষ-ত্রুটি থাকে এতেও তা-ই। এমনি আর-একটা প্রেরণার ধাক্কায় এ বেটাল-বেসামাল হয়ে পড়ে।

৫

শিক্ষার এই ত্রিধারা প্রায় একশো বছর ধরে পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু এই ধারাতিনটি মিলে একটি পূর্ণ-সমগ্র রূপ হয়ে-ওঠার জন্যে যে-আন্তঃসঞ্চারণ দরকার তা হয় নি। প্রথম ধারাটির ভাষামাধ্যম সংস্কৃত, দ্বিতীয়, অর্থাৎ, মুসলিম ভাবধারাটির বাহন আরবী ও পারসী ভাষা, আর তৃতীয়টির হল ইংরেজী। ফইজি এবং দারা, অথবা পরবর্তী যুগের রাজা রামমোহনের মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তিরা ছাড়া সে-যুগের চিন্তাশীল লোকেরা এই ধারাতিনটির ভেতর সমন্বয় আনবার চেষ্টা করেন নি। মুষ্টিমেয় জনকয়েক হিন্দু রাজনীতিক-অর্থনীতিক কারণে আরবী-পারসী শিখেছিলেন বটে, তবে তাঁদের আবার সংস্কৃত-শিক্ষা হতে পায় নি। মাত্র দু'-চারজন মুসলমানই সংস্কৃত শিখেছিলেন। ভারতে ইংরেজ-আগমনের পর থেকে প্রথমে হিন্দুরা বেশি করে ইংরেজী শিখতে লাগলেন, পরে মুসলমানরাও, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তিনটে ধারার এক-একটায় শিক্ষা নিতেন। টোল আর মক্তবগুলো যেন আলাদা-আলাদা রাজ্য হয়ে রইল। ইংরেজী-শিক্ষার্থীদের সে-রাজ্যে প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ ছিল। ভারতের বর্তমান সমাজ-জীবনের অনেক অবাঞ্ছনীয় অংশেরই কারণ

শিক্ষার তিনটি ধারাকে অমিশ্রণীয় করে-রাখা। এই এখনও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের শিক্ষাদর্শ-রীতি হচ্ছে প্রাচীন ধারার। কিন্তু প্রায় দেড়হাজার বছর আগে এ-শিক্ষাধারার কাল গেছে ফুরিয়ে। আর-এক দল আছেন যাঁরা আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তথা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধারা-বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এদিকে আবার এখনকার বিশ্ববিত্থালয়ী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃত বা আরবী-পারসী সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহলে বলা যায়, বিশ্ববিত্থালয় বা এইজাতীয় উচ্চ-শিক্ষানিকেতন-গুলিও প্রাচীন ভারতের মুনি, ঋষি, জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত, ভাবুক, সন্ত, মোহান্ত, কবি, শিল্পী, এমন কি অনেক সাধারণ নরনারী ধর্ম, নীতি ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যে-সব শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা গ্রহণ করতে পারে নি।

যে-সব নরনারী একই ভৌগোলিক বাতাবরণের মধ্যে বাস করে তাদের সম্পূর্ণ তফাত করে-রাখা যায় না। তাই শিক্ষা-জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ ভাব-অনুভবের, আবেগ-আচরণের ক্ষেত্রে এসে মিলেছে। আমাদের চিন্তাবুদ্ধি আর ভাব-অনুভবের মধ্যে মিলন-সংহতি না-ঘটায় ব্যক্তি-মানসলোকে ঘটেছে অপ্রোতব্য বিচ্ছেদ-বিভাগ। তাই অনেকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা বুদ্ধি দিয়ে নিলেও মন থেকে প্রাচীন-ভারতীয় ভাবাবেগ আর অভ্যাসের লূতাতন্তু ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না। তাই মনের মধ্যে আধুনিকতম ভাবধারার সঙ্গে প্রাচীন রীতির ভাব-ব্যবহার থাকে টিকে। এ-ব্যাপারকে ব্যতিক্রম বা বিভ্রান্তি বলে উপেক্ষা করা যায় না, কেননা, এর সংখ্যা কম নয়। একথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এই তিনটি ধারা অপ্রোত থাকায় ভারতের অধিকাংশ নরনারীর মানস-জীবন হয়েছে ক্ষীণ ও পঙ্গু।

একটি সমগ্র-পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাধারার অভাবেই ভারতের সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ভাষা-ভিত্তিক

আত্মকেন্দ্রিকতা। অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য-সম্পদ নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি সাধারণ সমগ্র শিক্ষাধারা। ভারতে এমনটি হতে পারে নি বলেই এখানে নানা খণ্ডতার জন্যে সমাজ-জীবনে ঐক্য-সংহতির অভাব ঘটেছে।

৬

উচ্চশিক্ষার সুযোগ অল্পসংখ্যক লোকদের প্রাপ্য করে-রাখায় সমাজে আর-একটা অবাঞ্ছনীয় কুফল হয়েছে। সমাজ যে-দু'টো বিপরীত থাকে ভাগ হয়ে গেছে তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এতে সমাজেব বিকাশটা হয়েছে বেআড়া-বেঢপ রকমের। উচ্চশিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের অবজ্ঞা করতে শিখেছেন; তার সঙ্গে শিখেছেন ছোটোখাটো-কিন্তু-প্রয়োজনীয় বৃত্তিকর্মকে অবজ্ঞা করতে। এখন উচ্চশিক্ষার দ্বার যদিও খুলেছে অনেকের জন্যেই, তবু শ্রমবহুল কাজের ওপর সেই পুরোনো অবজ্ঞা-উপেক্ষার মনোভাব এখনও যায় নি। বরং এখন আর-একটা জিনিস দেখা দিয়েছে: সেটা হচ্ছে নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে পার্থক্য। মধ্যযুগ পর্যন্ত পার্থক্যটা ছিল সামান্যই, ছিল পরিমিত। কিন্তু এখন তা এত বড়ো হয়ে-উঠছে যে, দু'টোর ভেতর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। গ্রামবাসীরা এখনও সেই অতীতের পরিবেশেই জীবন কাটাচ্ছেন। শহরগুলো বিশ শতকের ভাব-গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে। তাছাড়া, যাঁরাই আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছেন তাঁরাই শহরমুখো হয়ে পড়ছেন। শহর-বাসীদের মনে গ্রামবাসীদের ওপর কেমন-একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যেব ভাব এসেছে। এর জন্যেও তফাতটা বেড়েই চলেছে। এতে জাতির সমাজ-জীবনে ভেদ-ভাগ ঘটে সংহতি নষ্ট হচ্ছে বৈকি।

গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের রীতির এই ব্যবধান সরিয়ে-ফেলার বিরাট আয়োজন চলছে। সামাজিক শিক্ষার আলোচনা-প্রসঙ্গে তার কিছু কথা বলা হয়েছে। একটা বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখ

করা দরকার। সেটা হচ্ছে এই যে, এখনও অবধি উচ্চশিক্ষার নিকেতনগুলি নগরেই স্থাপিত হয়েছে। এতে গ্রামের লোকেরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর, সবচেয়ে খারাপ ফলটা হয়েছে এই যে, গ্রামের যোগ্যতম সর্বাপেক্ষা উদ্যমী ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা শহরে উচ্চশিক্ষার জন্যে এসেছেন তাঁরা আর প্রায়ই গাঁয়ে ফিরে যান নি। শহরে-নগরে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি থাকায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে শুধু সেখানকার সমস্যাগুলোর ওপর, গ্রামীণ সমস্যার দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরে নি। অথচ সমস্যা গ্রামেই বেশি, আর লোক বাস করে পাড়া-গাঁয়েই বেশি। তাই এখন উচ্চশিক্ষার আয়তনগুলি পল্লী-অঞ্চলে গড়ে-তোলার দিকে দৃষ্টি পড়েছে, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করারও চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ যে কী বা কেমন হবে তার কথা স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। কেবলমাত্র গ্রাম্য পরিবেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেই যে তা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে তা নয়; ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামীণ সমস্যার ওপর বেশি নজর দেয়া হয় বলেও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার স্তরে বিশেষভাবে বিবেচ্য গ্রামীণ বিষয়গুলি যে কী হবে তা-ও নির্ধারণ করা সহজ নয়। উচ্চ-শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষণ এই দেখা যায় যে, এ প্রায়ই ভাবতত্ত্ব-ধর্মী এবং সাধারণ শিক্ষা হয়ে থাকে। আসল লক্ষ্যটা রাখতে হবে এই দিকে যে, গ্রামের বুদ্ধিমান-প্রতিভাশালী তরুণদের যেন গ্রাম ছেড়ে শহরমুখে ধাওয়া না করতে হয়। গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান-নির্বাচনও ঠিকমতো হওয়া চাই; তার ওপরেও শিক্ষার্থীদের ওদিকে আকৃষ্ট-হওয়া নির্ভর করবে অনেকখানি। গ্রামীণ মানুষদের উচ্চশিক্ষা-সমস্যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও সমাধানের জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির যে-মত প্রকাশিত হয়েছিল তা এই যে, গ্রাম ও শহর-অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও

লক্ষ্য-বিষয়ে কোন পার্থক্য থাকার প্রয়োজন নেই। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, পল্লী-অঞ্চলের কতকগুলো বিশেষ-বিশেষ সমস্যা আছে; নগরের শিক্ষাব্যবস্থায় সে-বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয় নি। পল্লী-অঞ্চলের এই অসুবিধা দূর করার জন্যে, আর সেখানকার তরুণদের যাতে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হতে না হয় তারও জন্যে এই কমিটি কতকগুলি গ্রামীণ শিক্ষানিকেতন খোলার নির্দেশ-পরামর্শ দিয়েছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর এখানে তিন বছরের পড়া পড়তে হবে। তাতে সেখানকার পাঠমান এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর প্রথম উপাধি-পরীক্ষার মানের সমান হবে। এখনকার কলেজগুলোর চেয়ে এই শিক্ষানিকেতনগুলোর যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা থাকবে আপন-আপন পরিবেশ-অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্বাচনে। কয়েকবছর এইভাবে কাজ করার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যেতে পারবে।

৭

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির যে-অভ্যুদয়-উন্নতি হতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল এখনকার ভারত তা-ই পেতে চাইছে কয়েক দশকের ভেতর। প্রতীচ্যে পূর্ণ শিল্পায়ন হতে লেগেছিল অন্তত তিনশো বছর। ভারত সেই শিল্পায়ন চাইছে ত্রিশ বছরের ভেতর। ভারতে শিল্পায়নের সূত্রপাত অবশ্য হয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে। প্রথম মহাসমরে আধুনিক বাণিজ্য-শিল্প বেশ বাড়বার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থার জন্যে প্রাচীন জীবনধারার বিশেষ পরিবর্তন হতে পায় নি। সেটা হতে লাগল দ্বিতীয় মহাসমরের সময় থেকে, কেননা, তখনই আধুনিক পণ্য-উৎপাদন-রীতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হল; তাই জীবনযাত্রাতেও সোৎসাহে এল আধুনিকতা। তার পর ভারত যখন স্বাধীনতা পেল তখন শিল্প-বাণিজ্যিক, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ব্যাপারের সংস্কার করার আয়োজন ও যোজনা হতে থাকল গণতান্ত্রিক রীতিতে। তাই এখন ভারতে যে-পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে তা যথার্থই বৈপ্লবিক বলা যায়: কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটছে জনগণের সম্মতি-সমর্থন নিয়ে।

গণতন্ত্রের প্রসার এবং শিল্পায়নের অভ্যুদয়ের ফলে উচ্চশিক্ষারও বিস্তার ঘটেছে অনিবার্য ভাবেই। আমাদের মনে রাখা ভালো যে, যে-দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর বিপুলায়তন শিল্পায়নের নীতি গৃহীত হয়েছিল সেখানেই সর্বজনীন উচ্চশিক্ষার সুযোগ হতে পেরেছিল। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার না হলে গণতন্ত্র সফল হয়ে উঠতে পারে না। শিল্পায়নও নির্ভর করে এর ওপর, কেননা, শিল্পায়নে যে-যন্ত্রব্যবহারের প্রয়োজন তার জন্যে শিক্ষা না হলেই নয়। যতই যন্ত্র-ব্যবহার বাড়তে লাগল ততই শিক্ষা-সারের প্রয়োজন হতে থাকল। বেশ বোঝা যায় যে, শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে যন্ত্রপাতির উদ্‌ভাবন ও ব্যবহার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

ভারত জনসমাজে যথার্থ গণতন্ত্র প্রবর্তন করার নীতি নিয়েছে। তাই সমাজে বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য ঘোচাবার দরকার হয়েছে খুব বেশি। যাতে জনগণের ভেতর একটি সর্বভারতীয় জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে তাই ভেঙে ফেলতে হবে ভাষা, ধর্ম, জাতি এবং সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার প্রাচীরগুলো। সমস্ত মানুষের মধ্যে যদি সমাজ-বোধ ও সামাজিক সংহতি ঘনসংসক্ত হতে হয় তবে শহর আর গ্রামের মানুষদের অভ্যুদয়-পথের পার্থক্যও ফেলতে হবে ঘুচিয়ে। গণতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক পরিবর্তন-সংস্কার হয় জন-সমর্থন নিয়ে ধীরে-ধীরে, প্রায় অজ্ঞাতসারে বললেই হয়; কোন যোজনা-পরিকল্পনা প্রায়ই থাকে না তাতে। কিন্তু ডিক্‌টেটারি-শাসনে জন-সমর্থনের কোন অপেক্ষা থাকে না। ভারত গণতন্ত্র-নীতি নিয়ে থাকলেও যোজনা-পরিকল্পনার রীতি নিয়েছে, কিন্তু তাই বলে এখানে যে জনসম্মতির অপেক্ষা রাখা হয় নি তা নয়। যে-মহান্

সামাজিক আদর্শ ভারত গ্রহণ করেছে তা সফল-সার্থক হতে হলে চাই সর্বকল্যাণব্রতী নিপুণ নেতৃত্ব।

তাহলে একথা এখন নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি-রূপের বিবর্তনে সাহায্য করার বিশেষ দায়িত্ব আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও পর্যন্ত আশানুরূপ সেই ফল পাওয়া যায় নি। দু'-একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে কেন তা হয় নি। এই কিছুকাল আগেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা দর্শনশাস্ত্র পড়তেন তাঁদের পড়তে হত শুধু পাশ্চাত্ত্য দর্শন। এই শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় দর্শন-অধ্যয়নের সূত্রপাত হল; তারপর থেকে অবশ্য তার আয়তন ও মূল্য বেড়ে এসেছে। কিন্তু এখনও অবধি দুই ধারার দর্শনশাস্ত্রের বা বিভিন্ন চিন্তাধারার সংহত অধ্যয়নের মূল্য যেন এখনও ঠিক উপলব্ধ হয় নি। এখনও ইওরোপীয়, ভারতীয় এবং ঐসলামিক দর্শন স্বতন্ত্র করে পড়ানো হয়। সবচেয়ে নিন্দনীয় হচ্ছে ভারতীয় দর্শনকে আরবীয় দর্শনের বিকল্পরূপে নেয়া, অর্থাৎ, একটার বদলে আর একটা পড়ার নির্দেশ। আধুনিক ভারতের চিন্তাধারায় আছে ভারতীয়, আরবিক ও ইওরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাব। তাই ভারতের সমগ্র, জাতীয় শিক্ষাধারায় ঐ-তিনটি চিন্তাধারারই সংহত এবং সংগ্রথিত পঠন-পাঠন দরকার। আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এত বেড়ে চলেছে যে, যে-সব চিন্তাধারা ভারতীয় মনকে প্রভাবিত করে নি তা-ও নবগঠিত সিলেবাস-ভুক্ত করা ভালো। দূরপ্রাচ্যের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই হয়, কিন্তু, তা না থাকলে সমগ্র মানবিক চিন্তাধারার বিবর্তনের পূর্ণরূপ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা যাবে না। বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান বিলক্ষণ ভালো, কিন্তু বিশেষজ্ঞতার ভিত্তি হবে ব্যাপক সাধারণ শিক্ষা। তা না হলে বিশেষজ্ঞতা সার্থক ও সফল হতে পারে না।

আমাদের সিলেবাসের ভাষাশিক্ষা-নির্দেশের দিকে তাকালে

বুঝতে পারা যায় আমাদের দৃষ্টি সে-বিষয়েও কত খণ্ডিত ও আবদ্ধ। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পাঠ্যবিষয় হচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতি। তার পোড়োরা ইওরোপের দু'টি প্রধান সভ্যতার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হতে পায়। সে-দু'টি হচ্ছে গ্রীক ও লাটিন সভ্যতা। গ্রাক আর লাটিন ভাষা তাদের শিখতেই হয়। ভাষাদু'টি শিখে গ্রীস ও রোমের দার্শনিক চিন্তাধারা, এবং রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কাঠামোর কথা জানতে হয়। ভারতে কিন্তু ব্যবস্থা এই ধারার নয়; এখানে যিনি সংস্কৃত পড়েন তিনি পালি-পড়ার দরকার মনে করেন না, পড়তে হয়ও না। যাঁরা পারসী পড়েন তাঁদের অনেকেই আরবী জানেন না। আর, সংস্কৃত ও আরবী, কি, পালি ও পারসী একসঙ্গে মিলিয়ে পড়ার কোন ব্যবস্থা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনও অবধি করে নি। ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণরূপের সঙ্গে যদি পরিচয় হতে হয় তবে একথা মানতেই হবে যে, অন্তত জনকতক করে অধীয়ান সংস্কৃত ও পারসী, পালি ও আরবী ভাষায় নিষ্ণাত হবেন। গ্রাস ও রোমের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস জানার ফলে ইওরোপের প্রাচীন সাহিত্যের পাঠকদের কল্পনাশক্তির প্রসার এবং বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির বিকাশ হতে পায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলির পঠন-পাঠনের নির্দেশ ও ব্যবস্থা ঐরকম উদারপন্থী হলে ঐ-বিষয়ের অধীয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গীও উদার না হয়ে পারে না।

এই কথার বিরুদ্ধে হয়তো একটি প্রতিযুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, ওতে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যাপক হবে বটে, কিন্তু সংহত হতে পারবে না। এ-যুক্তি বলিষ্ঠ নয়। বিদ্যার অনুরাগ যাঁদের নেই তাঁদের পাঠ ভাসা-ভাসা হতে পারে, হতে পারে বিষয়ের অল্পতা সত্ত্বেও। কিন্তু সে-অনুরাগ যাঁদের আছে, আছে উদ্যম-অধ্যবসায়, তাঁরা বিষয়ের একটু বিস্তার বা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেন। পাঠ্যবিষয়ের

অল্প-স্বল্প বিস্তার-বৈচিত্র্য বিশেষ জ্ঞান-অর্জনে সহায়তাই করবে, বাধা হবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি সার্থক হতে হয়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা-ধারায়-মেশানো একটি পূর্ণাঙ্গ, সমগ্র শিক্ষাধারা তৈরি ও পঠন-পাঠন-ব্যবস্থা করে মানুষের সমগ্র দৃষ্টি ও জাতীয়তার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

বহুবিচিত্র উৎস হতে উৎসারিত হয়ে ভারতের সংস্কৃতি উঠেছে গড়ে। সেই-সব উৎসের পরিচয়-জ্ঞান না থাকলে এই সংস্কৃতির প্রাণশক্তির বৈচিত্র্য এবং মূল্য বুঝে-ওঠা যাবে না। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী হবে?—হবে সংস্কৃতির ভাণ্ডার এবং প্রগতির অগ্রদূত। তা যদি হতে হয় তো তাদের এমন-সব পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভারতীয় জীবনধারার বৈচিত্র্য হয় প্রকাশিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে মিলনতীর্থ—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্ষা-জ্ঞানের সঙ্গে একালের বিদেশাগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মিলনের স্থান। এই আদর্শরীতি গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারবে বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্য স্থাপন করতে, পারবে মানুষের সেই কল্পনার বিস্তার ও মানসিক ঔদার্য আনতে যা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, স্বাতন্ত্র্য, সাম্য ও মৈত্রীর লক্ষ্যে উপনয়নের জন্যে প্রয়োজনীয়।

জানুআরি, ১৯৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংরেজী-শিক্ষা

একথা শুনে বিস্ময় লাগতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্য যে, ভারতের রাজনীতিক মুক্তির পর থেকে ইংরেজী-শেখার আগ্রহ আগের চেয়ে বেড়েছে। যে-সব লোক এতে অনুৎসুক ছিলেন তাঁরাই এখন বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। পল্লী-অঞ্চল সম্বন্ধে তো কথাটা বিশেষ করে খাটে। অতীতে বেশির ভাগ গাঁয়েই ইংরেজী-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু লোকেদের তেমন-কোন অনুযোগ ছিল না তার জন্যে। এখন গ্রামবাসীদের ইংরেজী-শিক্ষার দাবি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তাঁরা বলছেন, শহরের মতোই গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরেজী শেখবার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এই মনোভাব প্রকাশ পাবার কারণ আছে অনেক। আগে ইংরেজ সরকার শহরবাসীদের প্রয়োজন-প্রার্থনার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতেন। শিক্ষার সুযোগও তাই বেশি ছিল শহরে। গ্রামবাসীদের মনে এই পক্ষপাতিত্ব অবিচার বলে অনুভূত হলেও সে-কথা প্রকাশ করে বলবার মতো সাহস ও উদ্যোগ প্রায় ছিল না বললেই হয়। এখন দেশের রাজনীতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হওয়ায় গ্রামবাসী জনসাধারণের মন থেকে ঐ সংকোচ-সংশয়, ভাবনা-ভয় হচ্ছে অপসৃত; তাঁরা সচেতন হচ্ছেন আপনাদের অধিকার-বিষয়ে। তাই তাঁরা দাবি করছেন যে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের তেমনই শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে শহরের ছেলেমেয়েরা যেমনটি পেয়ে থাকে। এইটেই বোধ হয় ইংরেজী-শিক্ষার দাবির একটা প্রধান কারণ।

তবু, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর বিদেশী ভাষা-শিক্ষার এই আগ্রহ বা

মূল্যবোধকে অসংগত বলে মনে হতে পারে। আগে ব্রিটিশ শাসনকালে অবস্থাটা ছিল অন্যরকম। তখন জীবনে উন্নতি করতে হলে ইংরেজী-শেখার দরকার হত। শুধু চাকরি-বাকরিতে নয়, বৃত্তিকর্ম আর কাজকারবারেও ছিল তার দরকার। প্রয়োজনের এই একান্ততা সত্ত্বেও, ইংরেজী ভাষার ওপর ছিল এক বিরূপ মনোভাব। ইংরেজী ভাষাকে যাঁরা সংস্কৃতি আর বিজ্ঞান-শিক্ষার একটা দামী বাহন বলে মনে করতেন তাঁরাও এই মত পোষণ করতেন যে, ইংরেজীর ওপর যে-জোরটা খুব বেশি দেয়া হয় তা সমর্থনীয় নয়। এখন এ-মনোভাব বদ্‌লেছে। এখন তো আর ইংরেজী-শিক্ষার সেই বাধ্যবাধকতা নেই, ইচ্ছে করলেই এখন একে বাদ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনই সর্বত্র সকলেরই আগ্রহ বেড়ে চলেছে ইংরেজী-ভাষা-শেখার।

পল্লীগ্রামে উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে তার অবস্থা-নিরূপণ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট হালহদ্দ জানা হয়। তা থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষদেরও ইংরেজী-শিক্ষার আগ্রহের কথা জানা গেছে। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের সব-কিছু ভালোর সুযোগ সবাইকে দেয়া; সুতরাং শিক্ষার সুযোগও। সবাইকে উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ দেয়াও গণতন্ত্রের কর্তব্য। পরশাসনকালে ভারতে শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্যে ছিল না। ভালো শিক্ষার সুযোগ বলতে যা তা ছিল শহরগুলিতে। পাড়া-গাঁয়ে অবশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা; তা-ও জনসংখ্যার তুলনায় ছিল না যথেষ্ট। তাছাড়া, গ্রাম্য পাঠশালা-গুলোর শিক্ষামান ছিল নীচু। আর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। মাধ্যমিক স্তরের পরের শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রামে ছিল না বললেই হয়।

তাহলে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তখন গ্রামের লোকেরা ছিল শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার একটা প্রধান দোষ ছিল এই যে, তাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে তরুণদের আসতে হত শহরে।

তরুণ বয়সে নাগরিক পরিবেশে কিছুকাল কাটানোর জন্যে তাঁদের মনে জন্মাত নাগরিক জীবনের ওপর মোহ; তাঁদের অনেকেই আর গাঁয়ে ফিরে যেতে চাইতেন না। অর্থাৎ শিক্ষিত গ্রামবাসীরা শহরমুখো হয়ে-যেতে থাকলেন। সুতরাং শহরের শিক্ষায় গাঁয়ের বিশেষ কিছু লাভ হ'ত না। এইসবের মূলে ছিল পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগের অভাব।

গণতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি-অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগকে সর্বজনীন করে-তুলতে হলে পল্লীগ্রামে শিক্ষার সমান সুযোগ রাখতে হবে। বেশি লোক বাস করেন পাড়া-গাঁয়ে। বেশির ভাগ লোককে ভালো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে কখনও সফল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সব লোককে শহরে এনে-ফেলাও যায় না, তাতে লাভও নেই। গ্রামগুলোকে তাড়াতাড়ি শহরে রূপান্তরিত করে-ফেলা যায় না। সুতরাং এ-সমস্যার সমাধান হচ্ছে পল্লী-অঞ্চলে সবরকম প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ-ব্যবস্থা করা।

পল্লী-অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অবস্থা-নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিটি এক অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ১১-১২ বছরের একটি কিশোরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী শিখতে তার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে, তখন ছেলেটি ইংরেজী-শেখার কথা বলেছিল। কেন তার ইংরেজী-শেখার এত ইচ্ছে—এই প্রশ্ন করলে সে বলেছিল, ইংরেজী না শিখলে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হব কেমন করে? এই ব্যাপারটির মধ্যে দিয়েই পল্লী-অঞ্চলে ইংরেজী-শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কথা অনেকটা বুঝতে পারা যায়।

শিশুদের অপাপবিদ্ধ মনেই অনেক সময় সত্যের প্রকাশ হয়। *বাইবেলেও আছে ঐ-ধরনের একটি কথা।* *ঐ-ছেলেটির কথাতেও* একটি সত্য প্রকাশ পেয়েছিল তার অজ্ঞাতসারে। ওটা একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; সাধারণ মনোভাবেরই দ্যোতক বলে মনে করা যেতে পারে ওটাকে। ওর মধ্যে দিয়ে দু'টি সত্য হয়েছিল প্রকাশিত: তার

একটি হচ্ছে গণতন্ত্র-চেতনা। ছেলেটি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা ভাবতে পেরেছিল তার মধ্যে দিয়েই তার প্রমাণ। এর মধ্যেই ছিল সুযোগ-সাম্যের অধিকার-বোধ। অপর সত্যটি হচ্ছে বিশ্বনাগরিকতার চেতনা। মানুষের এখন শুধু আপন দেশের নাগরিক হয়ে থাকলে চলবে না, হতে হবে বিশ্বের মানব-সমাজের নাগরিক, মেলামেশা, আদান-প্রদান করতে হবে নানা দেশ ও সমাজের মানুষের সঙ্গে। তাই তো শিখতে হবে এমন-এক ভাষা যার সাহায্যে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যায়। ইংরেজী যে সেইরকম এক্ ভাষা। সে-ভাষা শিখলে সভ্য ও উন্নত সমাজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞান পাওয়া যাবে তার মাধ্যমে। দেশের বা মানব-সমাজের নেতৃত্ব করতে হলে তো চাই দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। ইংরেজী শিখলে যে তা হতে পারবে সহজে। এই সত্যকে কি অস্বীকার করা যায়? ভারতে এখন যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার বা কর্তা-ব্যক্তি তাঁদের যদি ইংরেজী জানা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যতের যে-নাগরিকদের সম্ভাবনা আছে নেতা-নায়ক হওয়ার তাঁদেরও থাকবে সেই প্রয়োজন। ইংরেজী-শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে এই কথাটি বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে।

২

আধুনিক ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গণতন্ত্র-চেতনায়। এই চেতনা উত্তরোত্তর বাড়তির পথে চলেছে। এতে মানুষের অধিকার-সাম্যের চেতনা হচ্ছে বর্ধমান। এখানেই অতীত ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের পার্থক্য; এখান থেকেই অতীতের গতানুগতিক, মামুলী পথ ছেড়ে নবীন পথে ভারতের যাত্রা হল শুরু। এই গণতন্ত্র-চেতনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা দুনিয়াতেই এনেছে নবজীবনের স্পন্দন, এনেছে নবতনের আহ্বান। অন্যান্য দেশের

প্রাচীন সমাজগুলোর মতো ভারতেরও সমাজ ছিল মুখ্যত পুরোহিত-তন্ত্রী, বর্ণভেদতন্ত্রী; সে-সমাজ ছিল উঁচু-নীচু নানা থাকে-ভাগে ভিন্ন। সারা পৃথিবীতেই এই পুরোহিততন্ত্র, বর্ণভেদতন্ত্র লোপ পেয়েছে। অনেক দেশেই এখন দ্বন্দ্ব চলেছে জীর্ণ-দীর্ণ সামাজিক রীতির সঙ্গে আধুনিক ধারা-ধরনের। জিজ্ঞাসা হতে পারে কিসে ঐ-ভেদতন্ত্রী প্রাচীন সমাজের ধারা-ধরন পরিবর্তিত হতে পারল?—তার উত্তর হচ্ছে বিজ্ঞান আর নির্মাণ-বুদ্ধির অগ্রগতির কল্যাণে। এই বিজ্ঞান আর নির্মাণ-বুদ্ধিরই বা অগ্রগতি কিসে সম্ভব হল?—প্রকৃতির নানা নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্যের জ্ঞানবুদ্ধির ফলে। তারও মূলে আছে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার।

বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে গণতন্ত্র-চেতনার বৃদ্ধি হয়েছে। এটা যে আকস্মিক ভাবে হয়েছে তা নয়; দু'-এর ভেতর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানব-সমাজে এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন: গণতন্ত্রে শিক্ষার কাজ কী তার আলোচনায় এটা জানা দরকার। না জানলে সে-আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অতীতের ভেদতন্ত্রী সমাজের অস্তিত্বের কারণ কী ছিল?—কারণ ছিল দু'টি: একটি ছিল তখনকার দেশে-দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে যথেষ্ট যানবাহন আর যোগাযোগের উপায়ের অভাব। এর ফলে মানব-সমাজ ছিল নানা পৃথক ভাগে বিভক্ত; বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছিল না তেমন যোগাযোগ। প্রত্যেক সমাজের ছিল স্বকীয় ভেদতন্ত্র ও বৈষম্যনীতি; ছিল ক্ষমতাশালীদের সুযোগ-সুবিধার পাকাপাকি ব্যবস্থা। কোন ব্যক্তির অধিকার বা সুযোগ ছিল না তার প্রতিবাদ করার, তার ন্যায্যতা-অন্যায্যতার প্রশ্ন তোলার। তখনকার মানুষের নিজের সমাজের ছাড়া অন্য সমাজের জ্ঞান বড়ো-একটা থাকত না। এতে যে ঐ-ভেদতন্ত্রী সমাজগুলো টিকে থাকবার অনুকূল অবস্থা পেয়েছিল—সে আর আশ্চর্য কী।

ভেদতন্ত্রী সমাজের অস্তিত্বের দ্বিতীয় কারণ ছিল তখনকার

অর্থনীতিক অবস্থা। সে-অবস্থাটা সত্যিই ছিল দৈন্য-দারিদ্র্য আর অভাবের। তখন প্রকৃতির ওপর ব্যাপক আধিপত্য হয় নি মানুষের। তাই প্রাপ্ত বস্তু-সামগ্রীর সংখ্যা-পরিমাণ ছিল কম। পরশ্রমজীবী লোকরা ছাড়া অন্য মনুষ্যদের বিরাম-বিশ্রাম প্রায় ছিল না বললেই হয়। অথচ এই বিরাম আর আয়ের উদ্‌বৃত্ত একান্ত দরকার সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য। সে-অবস্থায় একদল লোকের অবকাশ-বিরাম পেতে হলে আর-একদল লোককে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে হত। এমন পরিস্থিতিতে ক্রীতদাসত্ব বোধ হয় না এসেই পারে না। তাই দেখি প্লেটো আর আরিস্‌টটলের মতো সহৃদয় উদার দার্শনিকরাও দাসত্ব-প্রথাকে যেন স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, তখনকার অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন না করলে সংখ্যাল্প লোক ভোগ করতে পায় না, আর তা না পেলে সংস্কৃতির সম্পদও হয় না উৎপাদিত।

বিজ্ঞানের উন্নতিতে হল নির্মাণ-বিজ্ঞান আর কারিগরি-বিদ্যার উন্নতি। তাতে পৃথিবীর অর্থনীতিক অবস্থা-ব্যবস্থা ও রাজনীতির কাঠামো গেল বদ্‌লে। এখন উৎপাদনের হার গেছে বেড়ে। প্রত্যেকের অভাব মেটাবার উপায় এখন আছে। বাস্তবিক পক্ষে, এখন সাধারণ মানুষও এমন-সব সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন যা আগে রাজা-রাজড়ারাও পেতেন না। এখন আর এক মানুষের শ্রম দিয়ে আর-এক মানুষের বিশ্রাম কিনতে হয় না। এইজন্যে এখন সামাজিক ভেদ-তন্ত্রের একটা প্রধান কারণ হয়েছে অপসারিত।

নির্মাণ-বিজ্ঞান আর কারিগরি-বিদ্যার প্রগতির ফলে যানবাহনের আর যোগাযোগের উপায় হয়েছে উন্নত। স্থানের দূরত্ব আর বাধাবিপত্তির অনতিক্রম্যতা এখন আর পৃথিবীর এক জায়গার মানুষকে অপর জায়গার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না। এতে মানব-সমাজ হয়েছে ঘনিষ্ঠ, সারা পৃথিবী হয়েছে সংসক্ত। বিভিন্ন আচার-

ব্যবহার প্রথা-সংস্কারের লোকদের মেলামেশা আর ভাব-বিনিময় সম্ভব ও সহজ হতে পেরেছে। তাতে মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে যে, কোন সমাজের স্বকীয় ভেদতন্ত্র আর বৈষম্যব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় বা অলঙ্ঘ্য নয়। এই চেতনা যেই জাগল অমনি কতকগুলো লোকের সুবিধা-সুযোগ-ভোগের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা-বিষয়ে প্রশ্ন জাগতেও আর বেশি বিলম্ব হল না। অনেক পুরানো প্রত্যয়ের ঘটল বিলয়। মানুষের মনে এই ধারণা গেড়ে বসতে থাকল যে, জীবন ও জগতের সুযোগ-সুবিধার অধিকার কারো জন্মগত বা অবস্থাগত নয়।

আর-এক ভাবেও বিজ্ঞানের অভিযান সাহায্য করেছে মামুলী অধিকারবাদকে ভেঙে ফেলতে। ব্যক্তি-মানুষ সম্পর্কে যখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী হল নতুন তখনই সম্ভব হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষকে সকল মানুষের বা একটা সমাজের একটা অংশরূপে দেখা। ঐ-একই এর কাজ হল কোন সাধারণ বা নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে তবে সে-সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য বলে মনে করা। বিশেষের ভেতর নির্বিশেষকে দেখার, বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের সম্পর্ক মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী এল যখন থেকে তখন থেকেই শুরু হল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এ-দৃষ্টিভঙ্গী যে কেবল বিজ্ঞানের সীমানায় আটকে থাকল তা নয়, ছড়িয়ে পড়ল অন্যত্রও। এর ফলে তৈরী হল এমন-এক মানস-পরিবেশ যাতে করে ব্যক্তি বা দলের বিশেষ অধিকার অস্বীকৃত ও অসমর্থিত হতে থাকল।

আর, যেই ঐ-মামুলী অধিকারবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল অমনি অগণিত মানুষের মুহ্যমান আচ্ছন্ন শক্তি পেলে অবাধ মুক্তি। এককালে যে-শোচনীয় সামাজিক-অর্থনীতিক অবস্থাকে মানুষ নিয়তির বিধান বলে ভেবে এসেছে সেই ভাবনার ঠাঁই নিলে স্বচ্ছন্দ মুক্তির অনুভূতি। এইজন্যেই অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে মানব-

সমাজের বিপুলপরিমাণ উন্নতি। তাই গত পঞ্চাশহাজার বছরে যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়নি তা হতে পেরেছে গত পাঁচশো বছরে। এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে মানুষের মানস-জীবনের আর তার সমাজ-পরিবেশের যে, আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। এই পরিবর্তনের গুণগত রূপও কম বিরাট নয়।

কিন্তু এই ত্বরিতগতি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে নতুন-নতুন সমস্যা। মানব-সমাজ এখন এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে যেখানে সমগ্র সমাজকে হয় একসঙ্গে বাঁচতে হবে, নয় মরতে হবে। শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি—সব দিক থেকেই সারা পৃথিবী এখন অখণ্ড অবিভক্ত একটি পৃথিবী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অন্য প্রান্তে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছে; মানব-সমাজের এই ঐক্যকে সে এখনও নিতে পারে নি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে। এখানেই আধুনিক সমাজের দ্বন্দ্ব-বিপত্তি: একদিকে বাস্তব সন্নিধান, অপরদিকে মানব-মনে সে-সন্নিধানের অনুপলব্ধি।

পৃথিবীর মানব-সমাজের ঐক্যবোধ যে একেবারে নতুন একটা জিনিস তা নয়। যুগে যুগে মনীষীরা ঘোষণা করেছেন সব মানুষের ঐক্যের কথা। ঠিক ভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, সব যথার্থ সভ্যতা-সংস্কৃতিই হচ্ছে সর্বজনীন সভ্যতা-সংস্কৃতি। সেই সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-কৃষ্টির ভাবধারা, তার মহিমা-গরিমা তখনকার ভারতীয়দের জানা নানা অঞ্চলে পড়েছিল ছড়িয়ে। ঐ-একই কথা বলা চলে প্রাচীন চীন আর ইজিপ্ট্-এর সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে। মধ্যযুগে আরব-সভ্যতাও অমনি ছড়িয়েছিল তার পরিচিত দেশগুলিতে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্বসভ্যতার প্রসার-প্রচেষ্টার সঙ্গে এযুগের বিশ্বসভ্যতার প্রসার-প্রচেষ্টার একটা লক্ষণীয় তফাত আছে। তা হচ্ছে এই যে, অতীত যুগে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপায়ের অভাবে সারা পৃথিবীর ঐক্য-সংহতি হয়ে ছিল

শুধু একটা ভাবাদর্শ, কিন্তু এখন আর তা নেই, তা পরিণত হয়েছে বাস্তব ব্যাপারে।

৩

এই যে পৃথিবীর এক-হয়ে-ওঠা—এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যের কথা ভাবতে হবে। প্রাচীন সভ্যতাগুলি ফুটে উঠেছিল কতকগুলো ভাষাকে আশ্রয় করে। অতীত ভারতে সংস্কৃতির বিচিত্র-সুন্দর বিকাশের ভাষাবাহন ছিল সংস্কৃত। শুধু ভারতে কেন, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-অঞ্চলেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সংস্কৃত। আর যেখানে-যেখানে গ্রীসের সভ্যতা এবং রোমান বিধি-বিধান গৃহীত হয়েছিল সে-সব স্থানে ভেতর যোগসূত্র হয়েছিল লাটিন ভাষা। মধ্যযুগে সভ্য জগতের কিয়দংশে সেই কাজ করেছিল আরবী ভাষা। তারপর, যখন আরবী ভাষার তপন হল অস্তমিত তখন কয়েক শতাব্দী ধরে তার শূন্য স্থানটা ছিল অপূর্ণ। ঠিক হয় নি কে পূর্ণ করবে সে-স্থান। কিছুকালের জন্যে মনে হয়েছিল ফরাসী ভাষাই সে-স্থান নেবে; ভাষাটির প্রসারও হয়েছিল ইওরোপে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাব-সংবাদ-বিনিময়ের ভাষা হয়েও দাঁড়িয়েছিল কিছুকালের জন্যে। সেই থেকেই আন্তর্জাতিক বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষার অর্থে 'লিংগুআ ফ্রাংকা' (Lingua Franca) কথাটি চলে এসেছে। কিন্তু ফরাসী ভাষার এই উদয়ন খুব বেশিকাল স্থায়ী হতে পারল না; ইংরেজী ভাষা হটিয়ে দিলে তাকে, গৌরবের আসনে আসীন করল নিজেকে। একথা কি এখন আর অস্বীকার করার উপায় আছে যে, ইংরেজী ভাষাই এক হিসেবে এযুগের সংস্কৃতির ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, এক-একটা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা জড়িয়ে ছিল তার ভাষা-বাহনের সঙ্গে। সংস্কৃতি-পুষ্ট

এই ভাষাগুলো থেকে অপরাপর ভাষা শক্তি-সম্পদ সংগ্রহ করত। আধুনিক ইওরোপের ভাষাগুলো বেড়ে উঠেছে কেবল গ্রীক আর লাটিন ভাষার সম্পদ ধার করে নয়, আরবী ভাষারও। হাঁ, এই-ভাবে নানা ভাষার সম্পদ গ্রহণ করেই একটা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা বা অন্তত অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে উঠতে পারে।

ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বে ভাষার এই লক্ষ্যসাধনের তাৎপর্য বুঝতে পারলে বোঝা সহজ হবে কেন ভারতের জাতীয়তা-জাগরণে ইংরেজী ভাষা এতখানি সক্ষম হতে পেরেছিল। ইংরেজরা তো শুধু অস্ত্রবলে ভারত জয় করেন নি। ভারতের অনৈক্য-অসংহতিও তাঁদের পরোক্ষ সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন ভারতে চলছিল রাজায়-রাজায় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আর মন-কষাকষি। ইংরেজরা বুদ্ধি করে এই বিবাদ-বিরোধের সুযোগ নিয়েছিলেন। তাঁরা একজনের কাছে আর-একজনের নামে লাগাতেন; কিসে পরস্পরের ঝগড়াঝাটিকে বাড়িয়ে তুলবেন তার চেষ্টায় থাকতেন। এইভাবে তাঁরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সহজেই তাঁদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল। ইংরেজরা যখন প্রথম ভারতে আসেন তখন তাঁরা সভ্যতায় ভারতীয়দের চেয়ে পিছনে ছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমর-কৌশলের প্রয়োগে তাঁরা সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখনকার ভারতের রাজনীতিক অবস্থা আর ইংরেজদের সমর-বিজয়—এই দুই-এ মিলে তাঁদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-অধিকারের সুবিধা করে দিয়েছিল। রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠায় ইংরেজী-ভাষা-প্রতিষ্ঠা যে কিছুটা আনুকূল্য পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভাষা তখন আধুনিক বিজ্ঞান-সংস্কৃতির একটা প্রধান ভাষা হয়ে-ওঠায় ভারতে এর প্রসারে আরও সুবিধা হয়েছিল। এর কল্যাণে তৎকালীন প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল বলে ভারত একে সহজেই গ্রহণ করল।

ভারতীয় মনে ইংরেজী ভাষার প্রভাবের ফল হয়েছে অনেক। তার ভেতর দু'টি তো খুব ভালো: এক, এই ভাষাই ভারতে রাজনীতিক গণতন্ত্রের সংবাদ বহন করে এনেছিল; দুই, সারা ভারতকে এক জাতীয়তার সূত্রে বাঁধবার, জাতীয়তা-বোধ জাগাবার পথ করে দিয়েছে এই ভাষাটি! মুক্তি ও সাম্যের জন্যে সংগ্রামের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তিন-চারশো বছরের ব্রিটিশ ইতিহাসে। গণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করার জন্যে ব্রিটিশরা আপনাদের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছে, একবার তো এক রাজার শিরচ্ছেদই করে ফেললে। ইংরেজী সাহিত্যে এই রাজনীতিক সংগ্রাম ও মুক্তি-আন্দোলনের কথা ছেয়ে আছে। ইংরেজী ইতিহাস ও সাহিত্য ভারতীয় মনে জাগিয়েছিল এক নবীন দেশাত্মবোধ এবং মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের নবচেতনা।

ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা হওয়াতেও গণতন্ত্র-চেতনার প্রসার হওয়ার সুবিধা হয়। ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতে রাজ্যশাসক ছিলেন মুসলমানরা। ইংরেজরা এসে তাঁদের সরিয়ে দিলেন শাসকের আসন থেকে। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে বৈরভাব থেকে গিয়েছিল প্রথমটায়। মুসলমান-আমলে মুসলমানরা যে-সুযোগ-সুবিধা পেতেন অ-মুসলমানরা তা পেতেন না। ইংরেজরা রাজ্যভার অধিকার করার পর সেই বিশেষ সুবিধার অধিকার আর রইল না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মনে এই এই ধারার বৈরভাব ছিল না। অবশ্য, ইংরেজদের রাজ্যশাসক হওয়ার পর থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত-অবহেলিত মানুষের সামনেও সুযোগ-সুবিধার পথ খুলে গেল। পাকাপাকিভাবে *যে-সুবিধার অধিকার কারো-কারো ছিল তা নাকচ করে দিয়ে* সকলের জন্যেই তার সমান সুযোগের নীতি স্বীকৃত হল।

প্রাগাধুনিক যুগের ভারতে ছিলেন অনেক উপজাতি-অর্ধজাতি। তাঁরা সব মিলে মিশে একজাতি হয়ে উঠতে পারেন নি। ইংরেজ-

আমলে এমনি সব নানা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সমাজের ভেতর একটা রাষ্ট্রিক ঐক্যবোধ আসতে থাকে। দু'ভাবে এই রাষ্ট্রিক ঐক্যবোধ আসে: এক, ইংরেজী সাহিত্যের জাতীয়তা-বোধের কথা ইংরেজী-শিক্ষিত মানুষের মনে ও পরে সাধারণ জন-মানসে সোজাসুজি হল সঞ্চারিত। আর, দুই, ইংরেজরা শাসক হওয়ার পর তাঁরাই হলেন বেশি-বেশি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী; তার তুলনায় জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতীয়েরা নিজেদের দুঃস্থতার ঐক্যে ঐক্য বোধ করলেন। এই ঐক্যবোধ এল একটু ঘুরপথে।

ভারতে ইংরেজী-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য সুফল হয়েছিল রাজনীতিক জাগৃতি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ভারতীয় মানসের উজ্জীবন। প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ তখনকার জানা সব দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। মধ্যযুগেও আরবী আর পারসী ভাষার মাধ্যমে ঐস্লামিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু, তার বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিজ্ঞানে, নির্মাণ-বিদ্যায় হয়ে-ওঠে নিপুণতর। ইংরেজী জানার আগে ভারতীয়দের কাছে এই বিজ্ঞানের জগৎ ছিল অজানা। এই ভাষা শিক্ষা করার ফলে বিজ্ঞানের দ্বার হল মুক্ত। এই জ্ঞানের বিকিরণে ভারতীয় শিক্ষাধারা-সম্বন্ধে গোঁড়ামি, আর ওপরওয়ালাদের জবর-দস্তির মনোভাবও কেটে যেতে থাকল। প্রাচীন ভারতের জবরদস্তি-সূচক মেজাজের একটা নিদর্শন মেলে শাস্ত্রসমূহের টীকাকারদের মনোভাবে। টীকাকাররা অনেকসময় আপন-আপন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত অনুসারে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতেন; সেই ব্যাখ্যা হয়তো শাস্ত্রপ্রণেতাদের ঠিক অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও টীকাকাররা নানা তর্কযুক্তির জাল বুনে কোন-রকমে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করতেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে একথাও বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, তাঁরা যা বললেন তা নতুন-কিছু নয়, শাস্ত্রেই তা আছে নিহিত হয়ে।

ইংরেজী-শিক্ষা স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিল। প্রতীচ্য দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অতীতের জ্ঞানীদের কথাও নির্বিচারে নেন নি, দরকার হলে তার খণ্ডন করতেও সংকোচ বোধ করেন নি। ভল্‌টেআর তো ঈশ্বরকেও অস্বীকার করবার মত সাহস দেখিয়েছিলেন। ইংরেজী-সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য দেশের এইধারার বৈপ্লবিক চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। অর্থাৎ, ভারতের প্রাচীনকাল থেকে সাধারণত-চলে-আসা অতীত মত ও আদর্শের নির্বিচার অন্ধ অনুবর্তন আর পালনের রীতি বর্জিত হয়ে এল স্বকীয় চিন্তার ব্যক্তিত্ববোধ। এমনি বিচারশীল যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী সহায়তা করল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-বিকাশের। এতে করে ভারতের সংকীর্ণায়মান মানস-দিগন্ত হতে থাকল প্রসারিত।

গত একশো বছরের কিছু বেশি সময়ের ভেতর ভারতে বহু অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, শুধু বিজ্ঞানতত্ত্ব আর ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যকলা, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও। এশিআর অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ প্রতিভা আছে সুপ্ত হয়ে, কিন্তু সুযোগের অভাবে পাচ্ছে না যথেষ্ট প্রকাশ। সেখানে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার উৎসাহ জাগে নি তেমন। সতেরো শতকের প্রায় গোড়া থেকে ব্রিটিশ-মানসে যে-সজীবতা-সক্রিয়তা সঞ্চারিত হয়েছিল উনিশ শতকের ভারতীয় মানসেও হয়েছিল তা-ই।

মানবিক ব্যাপারে এমন জিনিস প্রায় নেই বললেই হয় যা নিছক ভালো কি নিছক মন্দ। ইংরেজী-শিক্ষার কল্যাণে ভারতের যে-উপকার-সাধনের উপায় হয়েছিল তা বলা হল। কিন্তু, সে-শিক্ষায় অপকার যে কিছুই হয় নি তা নয়। সে-কথা না বললে পক্ষপাতদোষ ঘটবে। ওর প্রথম অপকার হয়েছিল মাতৃভাষা-শিক্ষায় অবহেলা। ইংরেজী-শিক্ষার ফলে সমাজ-জীবনে এল এক নতুন জাতিভেদ: ইংরেজী-জানা আর ইংরেজী-না-জানা লোকদের

মাঝখানে যেন এক প্রাচীর উঠে গেল। ইংরেজী-শিক্ষিত লোকেরা প্রায়ই দেশের ঐতিহ্য বর্জন করতেন, শুধু তা-ই নয়, তাকে অবজ্ঞা ও নিন্দা করতেও থাকলেন। এতে জাতির সমাজ-জীবনে ভাঙন ধরে শক্তি অপচিত হতে লাগল। গ্রাম ও নগরের মধ্যেকার ব্যবধান এই প্রক্রিয়ারই এক প্রকাশ।

ইংরেজী-শিক্ষার ওপর বেশি ঝোঁক পড়ায় আর-একটা কুফল দেখা দিল: ইংরেজী ভাষায় অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার সুযোগ হল সংকুচিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের শিক্ষা অনেক কাল ধরে অবজ্ঞাত হয়েছিল। এর ফলে বাণিজ্য-শিল্পেরও গতি বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। এর সবচেয়ে বড়ো দোষ হয়েছিল ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করাতে, ইংরেজী-শেখাতে নয়। এর কোন দরকার ছিল না। বিদেশী ভাষার বাধা ও ভার মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধা হয়েছিল। অঙ্গুলিগণ্য কয়েকজন বিশেষ বুদ্ধিমান লোক ছাড়া সাধারণের কল্পনা, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তির স্ফুরণের সুযোগ এতে ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে এর জন্যেই অনেকের শিক্ষা শেষ হয়ে যেত অসমাপ্ত অবস্থায়।

ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার অন্যতম কুফল হচ্ছে এই যে, ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল একপেশে। আগেই বলা হয়েছে, ভারতে মধ্যযুগে আরবী-পারসী ভাষাতেই ঝোঁক বেশি পড়ায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সংস্পর্শ বা যোগাযোগ হয়েছিল ব্যাহত। আধুনিক ভারতে কেবলমাত্র বিদেশীয় ভাষা ইংরেজী-শিক্ষার ফলেও সেই দুর্দশা ঘটেছে। ইংরেজী-জানা ভারতীয়েরা সারা পৃথিবীকে দেখতে শিখেছে ইংরেজের ভাব দিয়ে। একথা অবশ্যই সত্য যে, বিশাল ও সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে ভারতীয় মন অনেক কিছু লাভ করেছে। কিন্তু, একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, এর ফলে আমাদের মন প্রাচ্য ও ইওরোপের অন্যান্য সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ে সচেতন হতে পারে নি। ভারতের

রাজনীতিক মুক্তিলাভের পর থেকে ভারতীয় শিক্ষাধারার লক্ষ্য হল এই একদেশদর্শিতা সরিয়ে-ফেলা।

অবশ্য, ইংরেজী-শিক্ষার ফলে যে মোটের ওপর ভারতের কতকটা অগ্রগতি হতে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম দিকে যে ব্রিটিশ সরকার ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না সেকথা ভুললে চলবে না। ঈস্‌ট্ ইন্‌ডিআ কোম্‌পানি শুধু লাভের দিকেই দৃষ্টি রেখেছিল। রাজ্য-শাসনের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথম দিকে এর দৃষ্টি ছিল শুধু প্রাচ্য শিক্ষা উৎসাহিত করার পক্ষে।

ইওরোপীয় মিশনারীরা অবশ্য প্রথম থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হতে থাকে কয়েকজন উদারমনা দূরদর্শী ভারতীয় ব্যক্তির সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এঁদের অগ্রণী। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হলে ভারতের নবজাগরণ হবে সম্ভব।

ইংরেজ-যুগে ইংরেজী-শিক্ষা কতকটা জোর করে ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখনকার কথা ছিল আলাদা। কিন্তু এখন কতকগুলো উল্লেখযোগ্য কারণেই স্বাধীন ভারতে ইংরেজী-শিক্ষা বজায় রাখার দরকার আছে। প্রথমত, ইংরেজী ভাষা এখন পৃথিবীর বিচিত্র সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন। এ-শিক্ষা বন্ধ করা মানে ইতিহাসের প্রগতিশীল শক্তিসম্পদ থেকে ভারতকে বঞ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী-শিক্ষা ভারতের সমাজ-জীবনের নানা জটিল রীতির সংস্কারসাধন করতে সাহায্য করেছে ও করছে। তার জন্যেও এর স্থিতি দরকার। তৃতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখার জন্যে তার প্রয়োজন আছে।

৩

ইংরেজী-শিক্ষার পক্ষে কিছুটা ওকালতি করা হল বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ইংরেজী-শিক্ষা গত একশো-দেড়শো বছর ধরে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিটি রাখতে বলা হচ্ছে। ইংরেজী-শিক্ষার প্রথম ঝোঁকে এক শ্রেণীর লোকের এমনই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি পর্যন্ত ভুলতে চেয়েছিলেন। অনেকে তখন গর্ব করে বলতেনও যে, তাঁরা মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজী ভালো বলতে পারেন। এ ছিল এক বাড়াবাড়ি। এখন আবার দেখা দিয়েছে আর-এক আত্যন্তিকতাঃ সেটা হচ্ছে ইংরেজীকে ভারত থেকে একেবারে তাড়ানো। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, ইতিহাসের ধারাকে উল্টিয়ে দেয়া যায় না। ভারতে ইংরেজী-শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হওয়ার সময় ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক শিক্ষাধারা বিদেশীয় বলে মনে হওয়ার যুক্তি ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। একশো বছরের ওপর এর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আর একে একেবারে বিদেশী বলা চলে না; এ এখন আমাদের সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা জীবন থেকে একে বাদও দিই তবু এর প্রভাবের ছিটে-ফোঁটা এখানে-ওখানে নানাভাবে থাকবে ছড়িয়ে।

এখানকার বর্তমান পরিবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজী-ব্যবহারের প্রয়োজন যে বিভিন্ন তা বুঝতে হবে। ভারতে এখনও বহুলোকই ইংরেজী জানেন না। তাঁরা আর শিখবেনও না। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষা-লাভ করার দরুন তাঁরাও ইংরেজী বা আধুনিক শিক্ষার ফল প্রকারান্তরে কিছু-কিছু পেয়েছেন। তার কারণ, এখনকার প্রধান ভাষাগুলো ইংরেজীর দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য ভাষার বিকাশ ও উন্নতি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

আর-এক শ্রেণীর ভারতীয় আছেন যাঁরা ইংরেজীকে সাধারণ

আলাপ-পরিচয় বা ভাব-বিনিময়ের ভাষা-রূপে ব্যবহার করতে চান। এই ব্যবহারে অবশ্য নানা থাক থাকবে। কেউ-কেউ মোটামুটি এর জ্ঞান নিয়ে অপরভাষী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার প্রাথমিক প্রয়োজন মিটলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করবেন। আবার কেউ-কেউ একে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতিক বিষয় প্রভৃতির মতো জটিল ব্যাপারের কথাবার্তা চালাবার ভাষা-হিসেবেও ব্যবহার-করতে চান আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। এঁরা সকলেই একে প্রধানত ব্যবহার করতে চান কাজের ভাষা-হিসেবে, সাংস্কৃতিক ভাষা-রূপে তেমন নয়।

তৃতীয় আর-এক দল আছেন যাঁরা ইংরেজী ভাষাকে শুধু কাজ চালাবার ভাষা-রূপেই ব্যবহার করে তুষ্ট থাকতে চান না, চান তার সাহায্যে প্রতীচ্যের সংস্কৃতি-ধারা থেকে স্বীয় কৃষ্টির পুষ্টিসাধন করতে। অবশ্য, এখানেও আছে বিভিন্ন থাক। একটি থাক চান ইংরেজী সাহিত্যের রস উপভোগ করার মতো ইংরেজী ভাষার বিশেষ জ্ঞান। অপর-একটি থাকের বাসনা হচ্ছে ইংরেজীতে লেখা দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির মতো কঠিন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার মতো ভাষাটি-শেখার। সংখ্যায় খুব কম হলেও আরও-একটি দল আছেন, যাঁরা আর-একটু এগিয়ে যেতে চান, যাঁরা চান এই ভাষায় কিছু সৃষ্টি করতে।

এই-সব কথা বিবেচনা করলে মানতে হয় যে, বেশির ভাগ লোকের পক্ষে ইংরেজী-শিক্ষার দরকার নেই। না শিখলেও বিশেষ কিছু আসবে-যাবে না। যে-দেশের শতকরা ৮০জন লোকই নিজেদের গ্রাম থেকে দশ-পনেরো মাইল ব্যাসের মধ্যে জীবন কাটায়, তারা বাইরের জগতের খবর বড়ো একটা রাখে না। তারা অভ্যস্ত রীতিতেই জীবনযাপন করতে ভালোবাসে। তারা বিদেশী ভাষা শিখতেও চায় না, তার দরকারও তাদের হয় না। ভারতের শতকরা ৮০জন লোকেরও ইংরেজী-শিক্ষা বিশেষ-কোন

উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। আপন-আপন মাতৃভাষা-শিক্ষাই যথেষ্ট হবে। তবে, কথাটা এই যে, ইংরেজী বা অন্য কিছু শিখতে চাইলে অন্যান্য নাগরিকের মতো তাঁদেরও যেন সমান সুযোগ থাকে। যেহেতু এযুগে কোন মানুষই বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপন করে না তাই এখন সকলেরই বাইরের জগতের ভাবধারা গ্রহণ করবার মতো চিত্তের নমনীয়তা-গ্রহণশীলতা রাখা দরকার। স্বাধীন এবং সাধারণতন্ত্রী ভারতের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হলে তাঁদের শিক্ষা একান্ত দরকার। তার জন্যে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পুষ্টি-সমৃদ্ধি খুবই দরকার।

আর-একটি ছোট দল আছেন যাঁদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় কয়েক লক্ষে। এই দলের লোকদের কাজকর্ম ছড়াতে হয় সারা প্রদেশ জুড়ে, চাই কি, প্রদেশের বাইরেও সারা ভারত জুড়ে। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলেই ভারতে ঐক্য-চেতনা গড়ে উঠেছে ; তাই এঁরা এঁদের কাজকর্মের প্রসার ও প্রচার করতে চান ইংরেজীর সাহায্যে। ভারতীয় জীবনে বিদেশী ভাবধারার প্রভাব বুঝতে হলেও দরকার ইংরেজী-শিক্ষার। তাছাড়া, আর-একটা কারণেও ইংরেজীর দরকার অনুভূত হয়ঃ যাঁরা পররাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করার বিষয়ে ভারতের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁদের তো ইংরেজী না জানলেই নয়। ভারত যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখন এত মর্যাদা লাভ করেছে তার কারণ স্পষ্ট-স্বচ্ছ ভাষায় তার নীতি ও আদর্শের প্রকাশ। এতে কোন সন্দেহ নেই বললেই হয় যে, ভারতীয় নেতা ও প্রতিনিধিদের ইংরেজী ভাষার ওপর দখলই এই স্পষ্টতার কারণ। এমন একটা সুবিধা নষ্ট করা খুবই দুঃখের হবে সন্দেহ নেই।

তাহলে একথা বলা যায় যে, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে ইংরেজী বাদ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় একে রাখতেই হবে। অবশ্য, এখানেও এর স্থান আগের মতো থাকবে

না। এমন এক সময় গিয়েছে যখন মানুষের গুণাগুণ বিচার করা হত তার ইংরেজী-শিক্ষা দিয়ে। এ-দৃষ্টিভঙ্গী এখন আর থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ইংরেজী-শিক্ষার সময় এখন কমিয়ে দিতে হবে, কি ঘণ্টায়, কি বছরে। সেই সময়টা বরং আপন ভাষা-শেখার কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে ইংরেজী-ভাষার ওপর যে-দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তারও পরিবর্তন হবে। এখনও পর্যন্ত ইংরেজী পড়া হচ্ছে সাহিত্য-হিসেবে, এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেও। তাতে ফল হয়েছে অশুভ। এই স্তরের পোড়োদের যে-বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা থাকবার কথা নয় তা-ই তাদের পড়ে আয়ত্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এটা যে কত হাস্যকর হয়ে দাঁড়াতে পারে তা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। হেরিক (Herrick) নামে এক কবির 'ড্যাফোডিল্‌স্‌' বলে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি অবশ্য সুন্দর। কিন্তু তা হলে কি হয়, কবিতাটিতে যে-তুষার বা বরফের বর্ণনা আছে তা-ও বেশির ভাগ ভারতীয় পোড়ো দেখে নি, ঐ ফুলটিও না। কাজেকাজেই সে-কবিতার সৌন্দর্য উপভোগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আর কি করতে পারে?—বড় জোর কবিতাটি মুখস্থ করে ফেলতে পারে; তাতে কতকগুলো শব্দ শেখা হতে পারে মাত্র। আর, সেটুকু হলেই বোধ করি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক খুশী হবেন। কিন্তু এতে কি যথার্থ শিক্ষা হয়?—হয় না। তাই ইংরেজী-শিক্ষার পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজী-শিক্ষাতেই সে-শিক্ষার শেষ নয়, তা হচ্ছে জ্ঞান-অর্জনের উপায় মাত্র। সুতরাং ইংরেজী-শিক্ষার ব্যাপারে ঝোঁকটা সাহিত্য-পাঠ থেকে সরিয়ে আনতে হবে নিত্যব্যবহার্য সরল ভাষার ওপর।

ভারতে ভাষার পরিস্থিতি বিচার করেও ইংরেজী-শিক্ষার সম্বন্ধে মনোভাব বদলানো দরকার। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে এখন নিজের ভাষা তো শিখতেই হয়, তাছাড়া শিখতে হয় হিন্দী;

কেননা, হিন্দী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দফ্‌তরী ভাষা। এ ছাড়া, তৃতীয় ভাষা-হিসেবে শিক্ষণীয় হচ্ছে ইংরেজী। এর ওপরেও কারো-কারো ইচ্ছে একটি প্রাচীন ভাষা-শেখার ব্যবস্থা রাখা। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?—অল্প বয়সের পোড়োদের একই সঙ্গে চারটি ভাষা-শেখার কথা। যে-পোড়োর মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা হতে পৃথক তার অবস্থা তো আরও শোচনীয়। তাকে আবার চারটির ওপরে শিখতে হবে আরও একটি ভাষা। এই যদি হয় ভাষাশিক্ষার অবস্থা-ব্যবস্থা তাহলে মনে সহজেই প্রশ্ন ওঠে,—আর-সব বিষয়-পড়ার সময় কখন পাবে পোড়োরা?

এই ভাষাগুলোর যদি আবার সাহিত্যও পড়তে হয় তবে তো অবস্থা হবে সাংঘাতিক। তবে যদি এক মাতৃভাষার সাহিত্য-পাঠ ছাড়া অন্য ভাষাগুলো মোটামুটি কাজ চালাবার মতো শেখার কথা হয় তবে অবশ্য ভাষাশিক্ষার এই ব্যাপারটা তত নিন্দনীয় থাকবে না। বস্তুত, ভাষাগুলো যদি পাশাপাশি রেখে শেখানো হয় তবে পোড়োদের ভাব-বিনিময়ের শক্তি তাতে বাড়তে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের অনেকখানি জায়গা ইংরেজী-শিক্ষার জন্যে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে কিনা—তা-ও ভেবে দেখতে হবে। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলি প্রাচীন ভাষাগুলির সংস্পর্শে গড়ে ও বেড়ে উঠেছে—এই কারণে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য-শেখার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। হাল আমলে ভারতের অনেকগুলি ভাষা ইংরেজীর পোষকতায় পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ইংরেজী ভাষা-শিক্ষাকে যদি বোঝার মতো না করে-তোলা হয় তবে ইংরেজী ভাষার পরিচয়ে ভাষা-বোধ উদ্দীপ্ত হওয়ারই কথা। এতে কালক্রমে পোড়োদের আপন-আপন ভাষায় সৃজনধর্মী রচনা করবার ক্ষমতা হবে। তারা নিজেদের ভাষায় যুগোপযোগী সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমৃদ্ধ করার শক্তি পাবে।

যা-ই হোক, একটা বিষয় নিশ্চিত যে, ইংরেজীকে যদি ইস্‌কুলে

শিক্ষণীয় ভাষাগুলোর মধ্যে একটা বলে রাখতে হয় তবে ইংরেজী-শিক্ষার ঘণ্টার সংখ্যা দিতে হবে কমিয়ে। সাধারণত এর জন্যে অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী-জ্ঞানের মান যাবে নেমে। এমনিতেই এখন এর মান যে খুব উঁচু তা নয়; এর পর মান আরও নীচে নামাবার কোন অবকাশই নেই। আর, তা যাতে না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এখন যা করতে হবে তা এই: ইংরেজী-শিক্ষার পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। আর, প্রথমেই তা করতে হবে শিক্ষা-নিকেতনগুলিতে। এগুলিতে ব্রিটিশ ইস্‌কুলগুলির পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়ে চলেছে, কিন্তু ব্রিটিশ ইস্‌কুলগুলিতে ইংরেজী-শিক্ষার যে-পদ্ধতি চলে তা যে ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে চলতে পারে না—এই সহজ কথাটাই মনে রাখা হয় না। ব্রিটিশ ইস্‌কুলে ইংরেজী ভাষা পোড়োদের মাতৃভাষা, কিন্তু ভারতের পোড়োদের পক্ষে তা বিদেশী ভাষা। ব্রিটেনে বিদ্যালয়গুলিতে যে-পদ্ধতিতে ইংরেজী শেখানো হয় তাতে এখানে ভারতীয় ভাষাগুলি শেখানো যেতে পারে। ইওরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমাদের কিছু সুযোগ নেবার থাকে তো তা এই: ব্রিটেনে যে-পদ্ধিতিতে ফরাসী বা জার্মান ভাষা শেখানো হয় অথবা ইওরোপের দেশগুলিতে যে-কৌশলে ইংরেজী শেখানো হয় আমরাও ইংরেজী শেখাবার সেই পন্থা নিতে পারি। বিশেষত স্কান্‌ডিনেভীয় দেশগুলি ইংরেজী শেখানোর এক ভালো উপায় উদ্‌ভাবন করেছে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যে-ভাবে বহু বিদেশীয়কে ইংরেজী শিখিয়ে নিয়েছিল আমরা সে-অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে পারি। অল্প সময়ের ভেতর বিদেশীয়দের ইংরেজী শেখাবার ব্যাপারে বেশ সাফল্য লাভ করা গিয়েছিল। উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে, এবং বিশেষ করে, সমরকালে উদ্‌ভাবিত কৌশলের ব্যবহারে আমরাও অল্প সময়ের ভেতর আরও ভালো করে ইংরেজী শেখাতে পারি।

এর সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখলে সুবিধা হয়। অভিজ্ঞতা

থেকে জানা যায় যে, একটা ভাষা-জ্ঞানের ভিত পোক্ত হলে আর-একটা ভাষা শিখতে আরও কম সময় লাগে। আগে কি হত?—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পোড়োরা নিজেদের ভাষা ভালো করে শেখার আগেই ইংরেজী পড়তে শুরু করে দিত। এর পরে কি হবে?—আপন ভাষায় দখল হলে তারা ইংরেজী শিখবে। বলা হয়েছে, এখন ইংরেজী-শেখার জন্যে সময় কমিয়ে দিতে হবে। এই ত্রুটিটার পূরণ হবে শিক্ষাপদ্ধতির উন্নয়ন আর আপন ভাষার ব্যুৎপত্তি দিয়ে।

মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী-শিক্ষা থাকবে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা-হিসেবে। তার মানে এ নয় যে, তাতে কোন রসকষ থাকবে না। আসলে, ভাষা-শেখানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভাষাকে তার পাঠকের আনন্দের বিষয় করে-তোলা। সেইজন্যে ইস্কুলের পাঠ-সূচীতেও ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে সাহিত্যেরও স্থান থাকা দরকার; কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, সে-সাহিত্যের বিষয় যেন পোড়োদের বোঝবার মতো হয়। কিছুকাল আগে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইংরেজীর অধ্যাপকদের এক সম্মেলনে এই সম্পর্কে যে-সব প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল তার একটি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁদের সে-প্রস্তাবটি ছিল এই যে, ইস্কুল-স্তরে শুধু আধুনিক ইংরেজী গদ্য-রচনার কতকগুলি সহজ নিদর্শন বিশদ ভাবে পড়ানো হোক। প্রায় হাজার দুই বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দের মধ্যে সেগুলি রচিত হওয়া দরকার। এর সঙ্গে অবশ্য থাকা চাই দ্রুতপাঠের জন্যে নির্বাচিত গদ্যপদ্য-রচনার বই। এ-বইগুলি হবে সাহিত্য-গুণান্বিত।

আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে যদি ইংরেজী-ভাষা-সাহিত্যের কাছ থেকে কিছু নিতে হয় তবে আমাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক এমন ব্যক্তি থাকবেন যাঁরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ভালো করে পড়াশোনা করবেন। আর-কিছু না হোক, শুধু এই-রকম পড়াশোনাটাই হবে লাভের। ইংরেজী ভাষায় যে-সুন্দর সাহিত্য আছে তেমনটি পৃথিবীর খুব কম ভাষাতেই আছে। নাটক,

গীতিকবিতা, কাব্য, রম্যরচনার ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। উপন্যাস, ছোটোগল্প এবং প্রবন্ধেও ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর যে-কোন উন্নত ভাষার সাহিত্যের পাশে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ নিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়বেন তাঁদের সামনে তো এক নতুন লোকের সিংহদ্বার হবে মুক্ত। এই রকমে পাঠকদের কেউ-কেউ তা থেকে অদ্ভুত উৎসাহ-প্রেরণা পেয়ে নিজেদের ভাষায় চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক ভারতের সব বড়ো-বড়ো লেখকই ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব অনুভব করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির মতো লেখকদের কথা তো বিশেষ করে বলবারই দরকার নেই; তাঁরা তো ইংরেজী ভাষাকেই নিজেদের লেখার প্রধান বাহন-রূপে ব্যবহার করেছেন। যাঁরা প্রধানত কোন-একটি ভারতীয় ভাষাতেই লিখেছেন তাঁরাও ইংরেজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে মধুসূদন দত্ত, মায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলার বহু লেখকই ইংরেজী সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই সাহিত্য-পাঠে তাঁদের মন এমন-কিছু পেয়েছিল যার ফলে তাঁদের আপন ভাষায় খুব উঁচুদরের সাহিত্য রচনা করার আনুকূল্য হয়েছিল। গুজরাটী সাহিত্যে আধুনিক গদ্যরচনার প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী। ইংরেজী ভাষায় রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মৌলানা আজাদ ছিলেন লেখকও। তিনি ইংরেজী ভাষা কোন ইস্‌কুলে-কলেজে পড়ে শেখেননি বটে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় তা পড়েছিলেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এই ধারার বিরতি হয়ে যায় নি, এ চলছেই। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজী ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বিস্তীর্ণ সম্পর্ক ভারতীয় সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছে, নব-নব পথ খুলে দিচ্ছে নব-নব বিকাশের। সৃষ্টিমূলক সাহিত্য ছাড়া মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মের অন্যান্য

ক্ষেত্রেও ইংরেজী ভাষা অনেক সারবস্তু এনে দিচ্ছে আমাদের কাছে। দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও ইংরেজী সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাছাড়া, এর অনুবাদ-সাহিত্যের মারফৎ আমরা পাই পৃথিবীর নানা উন্নত ভাষার সম্পদও। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ভাষার মাধ্যমে আধুনিক যুগের মানব-মনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় আমরা পেতে পারছি। এইভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির সাধনায় ইংরেজী ভাষার পঠন-পাঠনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নির্মাণ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানের দিক থেকেও ইংরেজী ভাষা-শেখার যথেষ্ট দরকার আছে আমাদের। এ-দু'টি বিষয়ে কোন দেশ পিছিয়ে থাকলে তার সমৃদ্ধি এমনকি তার অস্তিত্বই হবে বিপন্ন। আর, বিষয় দু'টির আধুনিকতম বিকাশের সঙ্গে পরিচয় থাকলে শুধু যে শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় তা-ই নয়, দেশের রাজনীতিক ও সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। যে-সব রাষ্ট্র পররাজ্য আক্রমণ করতে চায় না, তাদেরও আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থাকা চাই। নির্মাণ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানে যদি ভারতকে এগিয়ে যেতে হয়, যদি পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাকে বিশিষ্ট ও স্বকীয় কিছু জিনিস দান করতে হয় তবে ইংরেজী ভাষার চর্চা তার ছাড়া চলে না। ইতিহাসের খেয়ালেই হোক, আর ভারতের রাজনীতিক বিপর্যয়-দুর্ভাগ্যের ফলেই হোক, ইংরেজদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল ইংরেজী ভাষাও। আর, সে-ভাষার আগমন শুভই হয়েছে ভারতের পক্ষে। ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা ও জাতীয়তা-রক্ষার অন্যতম উপায়-হিসেবে ইংরেজী ভাষাকে প্রয়োজনীয়, চাই কি, অপরিহার্য বলে পাঠ্য করে রাখতেই হবে।

শেষ কথা এই যে, ইংরেজী হচ্ছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী-বিকাশের একটি উপায়। আধুনিক ভারতীয় মানুষ যে বিচারশীল, যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক হয়েছে সে তার ইংরেজীর সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। এই

সংস্পর্শের মূল্যবত্তা-নিরূপণ সহজ নয়। অতীতে পরিবর্তনের চেয়ে রক্ষণশীলতার ওপর, পরীক্ষণ-প্রমাণের চেয়ে নির্বিচারে চিরাচরিত মত-সিদ্ধান্তের স্বীকৃতির ওপরেই ভারতীয় মনের ঝোঁক ছিল বেশি। ইংরেজী ভাষার দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক। আমাদের মানস-সত্তার রক্ষণশীলতা-স্থবিরতার দোষ শোধন করে তাকে যুক্তিনিষ্ঠ, স-তর্ক, বৈজ্ঞানিক এবং পরিবর্তনগ্রাহী করে তুলতে হলে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা বিশেষ দরকার। একথা মানতেই হবে যে, গত দেড়শো বছরে ভারতীয় মানস-সত্তার প্রাণচাঞ্চল্য গিয়েছে বেশ বেড়ে। এটা এমনই হয় নি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যে-নবজীবনের চেতনা-প্রবাহ এসে পড়েছিল আমাদের চৈতন্য-তটে—এ তারই ফল।

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক কারলাইল একদা বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর শেক্‌স্‌পীয়র—এই দু'টি জিনিসের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হলে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে নেবেন শেক্‌স্‌পীয়রকে। কারলাইলের একথার তাৎপর্য যাঁরা ঠিক ধরতে পারবেন না তাঁদের এটা খুব আশ্চর্যের বলে মনে হবে। অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও মহিমা-গরিমার তুঙ্গতম গগনে আরোহণ করে অবরোহণ করবে অনস্তিত্বের ঘন তমসায়। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্য?—মানব-মনের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে তা; যুগযুগান্তর উত্তরণ করে চলবে তার জয়রথ। তাই কারলাইল ভুল করেন নি। ব্রিটিশ সাম্রজ্যের চেয়ে শেক্‌স্‌পায়রের সাহিত্য-সৃষ্টির বেশি মূল্য দেবার কথা বলে তিনি কালোত্তর, মৃত্যুঞ্জয় বিষয়েরই প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শেক্‌স্‌পায়রের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি এমনি শ্রদ্ধানিবেদনে কোন বিদেশীয়ের পক্ষেও বাধা নেই, কেননা, ভাব আর রসের রাজ্যে শাসক ও শাসিত, প্রভু ও ভৃত্য বলে কিছু নেই, আছে শুধু সর্বমানবীয় শাশ্বত সম্পদ-সংগ্রহণের উদ্দেশ্যে সহযাত্রা।

ফেব্রুআরি, ১৯৫৫

সপ্তম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্র

বিগত একশত কি তারও কিছু বেশি কাল ধরে ভারতে ঘটেছে নীরব বিপ্লব। প্রধানত ভাব ও চিন্তায় হয়েছে তার প্রকাশ। এরই পরিণতি হল ভারতের রাজনীতিক মুক্তি। ঐ-কালপর্বটা ছিল বিক্ষোভ, অসন্তোষ, উত্তেজনা আর আন্দোলনের, এককথায় নবজীবন বা নবজাগরণের। এই নবজাগরণের প্রকাশ কখনও-কখনও হয়েছিল চিরাচরিত রীতি ও ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। কোথাও বা হয়েছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিল্পকলার চর্চা ও সৃষ্টিতে, কোথাও সামাজিক ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলনে। এই যে অতৃপ্তি-বিক্ষোভ—এ যেন এক জন্মবেদনা। এই রকমটাই হয়। একটা নতুন কিছুর সৃষ্টি হওয়ার আগে এমনি আলোড়ন-বিলোড়নের সৃষ্টিই হয় বটে। নবীন সূর্যের আবির্ভাবের আগে নক্ষত্রে-নক্ষত্রেও সংঘর্ষ হয়।

ভারতের সর্বত্রই তখন দেখা দিয়েছিল অশান্তি-অতুষ্টি। তাই তখনকার শিল্পকলায় কারুকৃতি ও সৌষম্যের চেয়ে প্রকাশ পেয়েছিল নব-নব আঙ্গিক ও রীতির প্রয়োগ-প্রয়াস। নানা কারণে ব্যক্তিবাদের চেতনা জেগেছে আধুনিক ভারতে। এই ব্যক্তিবাদের উগ্রতার ফলে সমাজের সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক সংহতি-রক্ষায় আনুকূল্য করে দেশের আচার-ঐতিহ্য। সমাজের সংসক্তি হতে হলে দরকার সামাজিক লক্ষ্যের কাছে ব্যক্তির অভিরুচি ও ক্ষমতার সমর্পণ। ব্যক্তি যদি সমাজের ওপরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। বিগত শতকে ভারতের অবস্থা হয়েছিল তা-ই। রাজনীতিক মুক্তিলাভের পর এর গতি বেড়েছে বৈ কমে নি।

ভারতীয় জীবনে ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য ও সমাজ-সংহতির ভাঙনের নিদর্শন মাঝে-মাঝে দেখা যায় চিত্রকলা এবং সাহিত্য প্রভৃতি কতকগুলো শিল্পকলার অভাবিত বিকাশে। সমাজের এই অবস্থায় আবার নাট্যসাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্পের, এবং বলতে পারা যায়, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিরও স্ফূর্তি ব্যাহত হয়।

কাব্য এবং চিত্রকলা প্রধানত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এদের সাধারণ বা নির্বিশেষ বলা মানে এদের নিন্দিত করা। পক্ষান্তরে, স্থাপত্যশিল্প এবং তার চেয়ে কিছু কম পরিমাণে নাটকের উৎকর্ষ প্রায় পুরোপুরিই সামাজিক ভাব-অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। কবি তাঁর ঈপ্সিত আদর্শে পৌঁছবার জন্যে আপন মনের তরণীতে চড়ে একাই যাত্রা করতে পারেন। চিত্রকরও পরম-রমণীয় ছবি আঁকতে পারেন একান্ত নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাপন করে। সংগীতশিল্প ব্যক্তিসত্তাকে উত্তরণ করে যেতে পারলেও তার উৎস হচ্ছে ব্যক্তি-মানসের আহ্লাদ। কিন্তু স্থাপত্যশিল্পকে প্রতি যুগেই নির্ভর করতে হয় সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার ওপর। উঁচুদরের মন্দির, সৌধ, মিনার, গম্বুজ, মহল, মঞ্জিল নির্মাণ করতে হলে বহু মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা চাই-ই চাই। তার জন্যে কেবলমাত্র প্রধান নির্মাতারই শিল্প-নৈপুণ্য থাকলে চলবে না, থাকতে হবে তার সকল সহকর্মীরও। এই উক্তি অল্প-বিস্তর প্রযোজ্য অভিনয় সম্বন্ধেও। যে-সময়টার কথা বলা হচ্ছে তাতে ব্যক্তিবোধের প্রাধান্য থাকায় কাব্য, চিত্র ও সংগীতে যে-পরিমাণে নব-নব পরীক্ষণা-প্রযোজনা দেখা যায় সে-পরিমাণে দেখা যায় না স্থাপত্য ও নাট্য-শিল্পে।

ভারতের মুক্তিলাভের পর উত্তেজনা-আন্দোলন বেড়েছে বৈ কমে নি। যে-প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা-লাভ হয়েছে তা এখনও বর্তমান। রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক—কোন ক্ষেত্রেই এখনও নতুন ভারসাম্য আসে নি। সেইজন্যেই স্বাধীন ভারতের কাব্য, চিত্র ও সংগীতকলায় সেই আগেকারই জের চলেছে। সর্বত্রই নবজাগ্রত

শক্তির একই লক্ষণ লক্ষিত হয়। কিন্তু নবলব্ধ সম্পদের যে-সুব্যবস্থা ও সংস্থাপন নবীন সৃষ্টিপর্বের সূচনা করে তা দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ কঠোর সংগ্রামের পর ভারত জয়লাভ করে। তাই স্বাধীনতা-লাভের পরও যদি অতীতের কিছু-কিছু অনুবর্তন চলে তো তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই; কখন থেকে যে নতুন জিনিসের ঠিক সূচনা তা নিশ্চিত বলা যায় না। যখন বিপ্লবের ফলে অতীতের বহু জিনিসই যায় গুঁড়িয়ে তখনও যদি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তো বোঝা যাবে যে, অতীতের কোন-কোন ভাবগতিকের টুকরো-টাক্‌রা থেকে গেছে এখানে-ওখানে। বিপ্লব তো আর সমাজ-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বিপ্লব হচ্ছে বিবর্তনেরই দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার সুসংবদ্ধ অথচ দ্রুত রূপ। পৃথিবীর বড়ো-বড়ো রাজনীতিক বিপ্লবের ইতিহাসে এই সত্যের প্রমাণ মিলবে। দেশের ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকেই জেগে ওঠে বিপ্লব আর তার পরবর্তী ভাবগতিক।

অবিরতি বা অচ্ছেদ-ধারার এই নিয়ম আরও বেশি সক্রিয় মানুষের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে। সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির ইতিহাসের নির্যাস। বহুযুগের অভিজ্ঞতা পরিস্রুত হয়ে রূপ নেয় বিশিষ্ট ধারা-ধরনের। সংস্কৃতি হল এই সবের মিলিত রূপ।

অতএব, নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নবযুগের সূচনা হবে—এ প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত নয়। বহু দশকের সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির ফলেই সম্ভব হয়েছে এই সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা। জাতীয় জীবনের শক্তিহীনতার ফলেই হয়েছিল ভারতের অধঃপাত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারই একটা প্রকাশ হয়েছিল ভারতের রাজনীতিক পরাধীনতায়। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে অবনতিও জাতির দৌর্বল্যের ফলে ঘটেছিল। একটা দেশের পুনরুজ্জীবন শুরু হলে উজ্জীবিত উদ্‌বোধিত প্রাণশক্তির প্রকাশ যে কেবল রাজনীতিক মুক্তির সংগ্রামেই হয় তা

নয়, হয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণতর, পর্যাপ্ততর প্রকাশের উদ্দীপনাতেও।

এটা মনে রাখবার মতো কথা যে, ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের সর্ব নেতাই সাংস্কৃতিক উজ্জীবনেরও পুরোধা। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের অন্যতম প্রথম রাজনীতিক নেতা; কিন্তু তিনি আবার বাঙলা গদ্যেরও স্রষ্টা ছিলেন। শিক্ষা-সংস্কার এবং নারীমুক্তি-আন্দোলনেরও পুরোহিত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু একজন বড়ো কবি-শিল্পী ছিলেন তা-ই নয়; তিনিই অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাতীয় চরিত্র-গঠন আর পল্লী-সংগঠন ব্যতিরেকে ভারতের রাজনীতিক মুক্তি আসা অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা-সৌধের প্রধান স্থপতি ; গুজরাটী ভাষায় আধুনিক গদ্যসাহিত্য-রচনারও স্রষ্টা ছিলেন তিনি। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি যে-মর্যাদার আসন পেয়েছে তার মূলেও তিনি। নবীন ভারতের জীবিত নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যেমন নির্ভীক সংগ্রামী তেমনি সাহিত্যস্রষ্টা।

২

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা-লাভের পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ কয়েক দশক আগে আরব্ধ ব্যাপারেরই অনুক্রমণ হবে। মুক্তিপূর্ব যুগে এই-সব জিনিস ছিল প্রধানত অনুরাগী ব্যক্তি বা দলের মধ্যে আবদ্ধ। মুক্তিলাভের পর থেকে এ-বিষয়ে উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটল: সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের কাছে পেল স্বীকৃতি ও আনুকূল্য। আগেই বলা হয়েছে, প্রাক্-মুক্তি যুগেও ভারতে ছিলেন প্রখ্যাত লেখক, শিল্পী, সংগীতশিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তখন সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় আনুকূল্য করার মতো পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না রাষ্ট্রের। একথা অবশ্য সত্য যে,

রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের কেউ-কেউ কখনও-কখনও উৎসাহ প্রকাশ করতেন এ-সব বিষয়ে, কিন্তু তা ছিল সাধারণত ব্যক্তিগত। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ছিল না তাতে।

দেশের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানকে আনুকূল্য দেয়া যে কর্তব্য সে-বিষয়ে এখন রাষ্ট্রের অবহিতি বেড়ে চলেছে। অনেক প্রদেশেই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ওপর শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্ব ছাড়াও বর্তেছে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বও। এ ঠিকই হয়েছে। শিল্প ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক রূপে প্রকাশিত মানুষেব বিবিধ প্রচেষ্টা যথার্থ শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। শিক্ষার অর্থ যদি হয় মানুষের অন্তর্নিহিত সৎ শক্তির উন্মোচন তবে শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে আবদ্ধ থাকবে না, তার সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ হবে জীবনের বিশাল বিচিত্র মুক্ত ক্ষেত্রে, সে-কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই একটুও। বস্তুত অভিজ্ঞতা থেকে একথা জানা গেছে যে, বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা শিক্ষার সঙ্গে যদি জীবনের ঐ-বিচিত্র প্রকাশকে দেয়া যায় মিলিয়ে তবে সে-শিক্ষা হয় আরও ফলপ্রসূ। এই কারণেই এখন একথা স্বীকৃত হয় যে, শিল্পকলা বিলাসের বস্তু নয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় তার অপরিহার্য প্রয়োজন। তাদের যদি স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়া হয় তবে তাদের বিকাশ হয় ত্বরিত। এই যে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের সুযোগ—এই তো শিল্পকলার মুকুলিত রূপ। তাছাড়া কী?

সুতরাং ভারতসরকারের শিক্ষা-বিভাগটি (এখন যাকে বলা হয় শিক্ষামন্ত্রণালয়) একটি স্বতন্ত্র সত্তা-হিসেবে গুছিয়ে নেয়া ভালোই হয়েছে। এর নাম হওয়া উচিত শিক্ষা ও কলা-বিভাগ। নানা কারণে ভারতের মুক্তিপূর্ব যুগে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা-বিকাশের বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তখন যাঁরা শিল্পকলা-চর্চায় অনুরাগী হতেন সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে

সম্পর্ক তাঁদের ছাড়তে হত। আবার, যাঁরা সাধারণ শিক্ষা নিতেন তাঁদেরও শিল্পকলায় দৃষ্টি দেবার সুযোগ থাকত না। এই বিচ্ছেদের জন্যে শিক্ষার্থীদের মানস-জীবনে দেখা দিয়েছে অসমতা ও অসংগতি। সাধারণ শিক্ষাধারায় শিল্পকলা ও রসের দিক অবহেলিত হওয়াই যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সে যা-ই হোক, বিগত মহাসমরের শেষের দিকে শিক্ষা-প্রসারের যে-পরিকল্পনা করা হয় তাতে শিল্পকলাকে যুদ্ধোত্তর কালের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করাব প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। বাঙলার 'এশিআটিক্ সোসাইটি' প্রস্তাব করেছিল যে, ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন রূপের উৎসাহ এবং বিকাশের জন্যে ভারতসরকারের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। প্রস্তাবটির মূলনীতি গৃহীত হয়েছিল। তাব ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনাও করা হল। সেই অনুসারে তিনটি আকাদেমি স্থাপিত হল: (১) সাহিত্য আকাদেমি, (২) দৃশ্যশিল্প আকাদেমি, এবং (৩) নৃত্য-নাটক-সংগীত আকাদেমি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ দ্রুত ও সহানুভূতিশীল হতে হবে বলে পরিকল্পনা-রচয়িতারা প্রস্তাব করলেন, ঐ-প্রতিষ্ঠান যেন স্বতন্ত্র হয়; তার যেন নিজস্ব অর্থভাণ্ডার থাকে।

একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সাধারণ পরিকল্পনা ছাড়া প্রাক্-মুক্তি যুগে ভারতের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার উন্নতির জন্যে বিশেষ কিছু করা হয় নি। এ অবশ্য সত্য যে, কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লখ্‌নউ-এ কতকগুলি কলাভবন খোলা হয়েছে; কিন্তু শিল্প-কলা যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনাদৃত হয়ে আছে তা অস্বীকার করা যাবে না। সংগীত, নৃত্য ও নাটকের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। এই-সব শিল্পের শিল্পীরা তো সমাজের কাছে নিন্দিতই হয়েছেন সাধারণত; ঔদাসীন্য ছিল রাষ্ট্রেরও। ভারতে শিল্পকলা যে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি তা মুষ্টিমেয় শিল্পী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের কল্যাণে।

নানা ভিন্নধরনের ছাঁদের বিনিময়ে সংস্কৃতির বিকাশ হয়। কিন্তু নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের যে দীর্ঘকালের সম্পর্ক তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে সেই সম্পর্ক আবার স্থাপিত হল। তা করলেন রবীন্দ্রনাথ, ভারতের মুক্তিলাভের বহু আগেই। আপন বাসনা আর সামর্থ্যের প্রেরণাতেই তিনি তা করলেন। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে তিনি ভারতের চিত্তের প্রসার ঘটালেন। ইওরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গা, সোভিএট রাশিআ, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিআ, চীন, জাপান, ইরান প্রভৃতি দেশ ঘুরে তিনি ভারতের সম্মান-গৌরব অর্জন করে এলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই সম্পর্ক আবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কেননা, এ হয়েছিল সম্পূর্ণ তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টায়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই শতকের তৃতীয় দশকের কাছাকাছি সময়ে সারা ইওরোপ ভ্রমণ করলেন। তাতেও বাইরের মানুষ ভারত সম্বন্ধে সচেতন হল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র, রামন, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির গবেষণার ফলেও ভারতের নাম ছড়াল। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় চিন্তাধারার স্বকীয় ভাবে পরিচায়ন-পরিবেশনও পৃথিবীর বহু সুধী কোবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পশ্চিমের বেশির ভাগ দেশেই সংখ্যায় কম হলেও শ্রীঅরবিন্দের একদল ভক্ত ছিলেন। আধুনিক জগতে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবও মানুষের বিবেককে উদ্‌বোধিত করল; তার ফলে মানব-সমাজের সংস্কার ও উজ্জীবনের জন্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্য মানুষ বুঝতে পারল।

যা-ই হোক, এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতের স্বরাজ-লাভের আগে ভারত সম্বন্ধে বাইরের লোকদের আগ্রহ ছিল অতি সীমিত ও অস্পষ্ট। স্বাধীন ভারতের আবির্ভাবের পর সারা পৃথিবী স্বীকার করল, ভারত একটা দেশের মতো দেশ বটে; এ-ই একমাত্র দেশ যে শুধু স্বাধীনতা লাভ করে নি, তা লাভ করেছে

বিশিষ্ট শিষ্ট উপায়েঃ ইতিহাসে কোথাও তার তুলনা নেই। স্বাধীন ভারতসরকারেরও প্রতীতি হল যে, পৃথিবীকে যদি কিছু দিতে হয় তো তার দেয় হচ্ছে সংস্কৃতি ও নীতির সম্পদ। তাই তার রক্ষণ-পোষণের দিকে দৃষ্টি পড়ল সরকারের। বহু শতাব্দী পরে আবার রাষ্ট্র-হিসেবে ভারত শিল্পকলা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে সাক্ষাৎভাবে মন দিল, শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও।

৩

ভারতের রাজনীতিক মুক্তি-লাভের পর এ-বিষয়ে ভারতসরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের 'শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান'-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে প্রথমে একটি জাতীয় কমিশন গঠিত হল। রাষ্ট্রপুঞ্জের 'শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ে। এর প্রতিষ্ঠাতারা যে ছিলেন উদারহৃদয়, উন্নতমনা ও দূরদর্শী ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, জাতিতে-জাতিতে যে-ঈর্ষা-দ্বেষ ও সন্দেহ-অবজ্ঞার বিষবাষ্প জমে উঠেছে, যার ফলে মানব-সমাজে এত ভেদভাগ—তা না অপসারিত হলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি কিছুতেই স্থাপিত হতে পারে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের সংবিধানের সূচনাতেই বলা হয়েছে এই কথাঃ সব সমরের বীজ থাকে মানব-সমাজের মনে; সে-সমাজে শান্তি যদি স্থাপন করতে হয় তবে সর্বপ্রথম করতে হবে সেখানে। এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস এই যে, জাতিতে-জাতিতে সদিচ্ছা-সদ্‌ভাব-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি শুধু সরকারগুলির হাতে দিলে চলবে না। সরকার হচ্ছে দেশের শাসনযন্ত্র; রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে তার কাজ-কারবার, তাই মত-পার্থক্য সেখানে অপরিহার্য। এই জন্যেই রা-শি-স-স (রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি) প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ

এই যে, অপর দেশের ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সদিচ্ছা-সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি সদস্য-দেশে একটি করে জাতীয় কমিশন গঠন করতে হবে। এতে রাজনীতিক বিষয়ের বাধা-বিপত্তি থাকবে না বলে সরকারী প্রতিষ্ঠান-প্রতিভূর চেয়ে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পত্তন করা এর পক্ষে বেশি সুবিধার হবে।

ভারত রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান ও উদ্দেশ্য-নীতি সে শুরু থেকেই মেনে আসছে পূর্ণ আগ্রহে। এর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে ভারতসরকার '৪৯-এ এক অন্তর্বর্তিকালীন কমিশন গঠন করেছিল; ১৯৫৩-তে তাকে স্থায়ী ভিত্তিতে গড়া হয়। স্থায়ী জাতীয় কমিশনের প্রথম সম্মেলনের অধিবেশন হয় ১৯৫৪-তে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার উদ্‌বোধন করেন। এশিআ এবং আফ্‌রিকার নানা দেশের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাতে। আসলে এই সম্মেলন হয়ে দাঁড়িয়েছিল রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের এক আঞ্চলিক সম্মেলন। এ-ই প্রথম ক্ষেত্র, যাতে একটি জাতীয় কমিশন এরকম সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই কমিশন সরাসরি নিজেও কাজ করে, আবার শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফত-ও করে। বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত; তাই তার বিশদ বিবরণ দেবার দরকার নেই। সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে।

বঙ্গীয় এশিআটিক সোসাইটির পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। এর প্রস্তাবগুলি শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের প্রখ্যাত প্রতিনিধিদের একাধিক সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। বিশিষ্ট প্রাচীন ও বর্তমান ভাবধারা আর দৃষ্টিভঙ্গীর রক্ষণ ও উন্নয়ন, তথা নবযুগের ভাবানুসারী পরিবর্তনের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে সম্মেলনগুলিতে। স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে তিনটি জাতীয়

আকাদেমি স্থাপিত হয়েছে। নব-নব বিকাশের ব্যবস্থা, যোগ্য মানের রক্ষণ ও উন্নয়নের ভার ন্যস্ত হয়েছে এই আকাদেমিগুলির ওপর।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-প্রসারের ব্যাপারেও ১৯৪৭-এর পর থেকে বেশ কাজ হয়েছে। নানা কারণে প্রাক্-মুক্তি যুগে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না ভারতের। আর, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ভেতর ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল বেশি। যা-ই হোক, বিদেশের সঙ্গে নতুন করে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা-ভাবনায় নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে আগেকার বহু যুগের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই প্রথম কর্তব্য বলে বিবেচিত হল। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষসময়ের দিকে ইরান থেকে এল এক শুভেচ্ছাবাহী দল। তার ফলে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হল ভারত-ইরান সাংস্কৃতিক সমিতি। এই সমিতিটি প্রথমে ছিল ছোট। স্বাধীনতা-লাভের পর এই সমিতিটিকে বড়ো করা হল শুধু ইরানের সঙ্গে নয়, অপরাপর দেশের সঙ্গেও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়াবার জন্যে। এর নাম দেয়া হল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-সংসদ। সংসদের উদ্‌বোধন করে প্রধানমন্ত্রী একে শুভেচ্ছা জানালেন, বললেন, এ হল ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। সংসদটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; একটি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্দিষ্ট, একটি দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিআর সঙ্গে, আর একটি আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে। ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে আরও বিভাগ খোলারও সংকল্প রাখা হল।

এই সংস্কৃতি-সংসদ অনেকরকম প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছে। তার মাত্র কতকগুলির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংসদ একটি লাইব্রেরি আর একটি পাঠাগার স্থাপন করেছে।

কতকগুলি পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য বিষয়েরও প্রকাশের কাজে সাহায্য করছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে পণ্ডিত ও অধ্যাপক-বিনিময়ের এবং শিল্পী-দলের সাংস্কৃতিক সফরেরও ব্যবস্থা করেছে সংসদ।

সংসদের কাজ ছাড়াও স্বাধীন ভারত অন্য ভাবেও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়াবার চেষ্টা করেছে; মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, চীন, ইরান, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিআ, তুরস্ক, জাপান, সোভিএট রাশিআ এবং আফ্রিকায় পণ্ডিত এবং কৃতবিদ্য অধীয়ানদের পাঠিয়েছে, আবার, এইসব দেশের বিদ্বান ও জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ করে এনেছে ভারত। টাস্‌মানিআ, জানজিবার, আফগানিস্তান্‌, মালয়, ইথিওপিআ এবং সুদানে শিক্ষক পাঠাবারও ব্যবস্থা করেছে ভারত। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর লেখা বহু গ্রন্থ নানা দেশের নির্বাচিত গ্রন্থাগারে পাঠানো হয়েছে। ভারতের কতকগুলি লাইব্রেরিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং এর বিশেষভাবে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা রাখা হচ্ছে। সবরকম সরকারী প্রকাশনের বিনিময়ের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়েছে।

দেশে-দেশে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নত ও সুন্দর করবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থী ও বিদ্বজ্জন-বিনিময়। এইরকম বিনিময়ের আর বহু বৃত্তি ও সাহায্যদানের ব্যবস্থাও ভারত করেছে। 'ফুলব্রাইট্‌-প্রোগ্রাম' নামে এক পরিকল্পনা অনুসারে বহুসংখ্যক মারকিন ও ভারতীয় শিক্ষার্থীর বিনিময় হয়েছে গত পাঁচ বছরে। যুক্তরাজ্যের পক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা করছে ব্রিটিশ কাউন্‌সিল। ফ্রান্স্‌, ইজিপ্‌ট্‌, ইটালি, ইরান, জারমানি, যুগোস্লাভিআ ও চীনের সঙ্গেও বৃত্তি-বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এশিআ, আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের যে-সব অঞ্চলে বহু ভারতীয় উপনিবিষ্ট হয়েছে সেখানকার জন্যেও সাংস্কৃতিক বৃত্তির ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সম্প্রতি ভারত ইরান, আফগানিস্তান এবং ইন্‌দোনেশিআয়

কতকগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক দল পাঠিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় শিল্পকলার কতকগুলি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছে ভারত নানা বেসরকারী সংস্থার সাহায্যে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিআ, চীন, ফ্রান্স্, ইন্দোনেশিআ প্রভৃতি দেশের সরকারী-বেসরকারী অনেকগুলি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতে। ভারতের বিভিন্ন শহরে রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনীতে আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি দেখানো হয়েছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিআ, জার্মানিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের রচিত যে-সব শিল্পবস্তু পাঠানো হয়েছে এবং 'শংকরের সাপ্তাহিক পত্রিকা'-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপিত যে-শিশু-শিল্পকলার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রতি বছর দিল্লিতে হয়—তার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের স্বাধীনতা-লাভের ঠিক আগেই লন্ডনের 'রয়েল আকাদেমি' ভারতীয় শিল্পকলার যে-প্রদর্শনী করেছিল আজ পর্যন্ত তা-ই হচ্ছে বৃহত্তম। পাঁচহাজার বছর ধরে ভারতীয় শিল্পকলার যে-বিকাশ হয়—এ ছিল তারই এক স্পষ্ট নিদর্শন। এই প্রদর্শনী যে অমন অতুলনীয় হয়ে-উঠেছিল তার কারণ মিউজিঅমগুলি, অবিভক্ত ভারতের বহু কলারসিক ব্যক্তি ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন এতে। প্রদর্শনীটি ভেঙে দেবার আগে দিল্লিতে দেখাবার প্রয়োজন অনুভূত হল। প্রদর্শনীর সাফল্য প্রেরণা যোগাল এটিকে জাতীয় মিউজিঅমের বীজরূপে ব্যবহার করতে। যতদিন মিউজিঅমের নিজস্ব সদন নির্মিত না হয় ততদিনের জন্যে কতকগুলি প্রদর্শনীয় সামগ্রী রাখা হয়েছে রাষ্ট্রপতি-ভবনে। মিউজিঅমটি যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তার জন্যে ভারত-সরকার বিদেশ-স্থিত ভারতীয় শিল্পকলার দামী জিনিসগুলির একটি পরিচায়িকা তালিকা তৈরি করার ব্যবস্থা করেছে। বিদেশ-স্থিত ভারতীয় শিল্পকলার এই নিদর্শনগুলি পাওয়ার জন্যে যথাসম্ভব

চেষ্টা করার কথা হয়েছে। আসলগুলি না পাওয়া-গেলে রূপদক্ষদের দিয়ে করানো তাদের প্রতিরূপগুলি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূল্যবান শিল্পকলা-সামগ্রী অবাধে যাতে ভারত থেকে রপ্তানী না হতে পারে তার জন্যে বিধান তৈরি করা হয়েছে। মিউজিঅমের স্থায়ী সদনের ভিত্তি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। আগেকার জয়পুর-হাউস-এ আধুনিক ভারতের শিল্পকলার একটি কলাকক্ষ করা হয়েছে। সেখানে একটু-একটু করে শিল্পসামগ্রী সংগৃহীত হচ্ছে। কয়েকটি রাজ্যসরকারের সহযোগে একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার করা হয়েছে মূল্যবান শিল্পসামগ্রী কেনবার জন্যে।

ভারতে সাংস্কৃতিক অনুশীলনের অন্যতম সরকারী প্রচেষ্টা হচ্ছে সারা পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস-রচনা। ভারত-সরকারের প্রবর্তনায় প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বমানবের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস। অবশ্য, এখনও অবধি যা বেরিয়েছে তাতে কোন দেশ বা অঞ্চলের দার্শনিক চিন্তার কথা আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের দর্শনের ইতিহাসে শুধু মাঝে-মাঝে ভারতীয় বা আরবীয় দর্শনের উল্লেখ আছে; আবার, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-প্রসঙ্গে হয়তো অন্য দেশ বা কালের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির সর্বকালীন চিন্তাপ্রবাহের সিংহাবলোকন—পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও ঠিক হয় নি। এরকম আলোচনা সবযুগেই দরকার, কিন্তু এই আধুনিক যুগে—যখন বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি সন্নিহিত হচ্ছে—তখন তো পারস্পরিক বোঝাপড়ার সুবিধার জন্যে এর প্রয়োজনের কথা বলে শেষ করা যায় না। তাই ভারতসরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ ছিল 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস'-প্রণয়ন ও প্রকাশন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ষাটজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এই কাজ।

৪

একথা সত্যি যে, কোন সরকার সচরাচর শিল্পকলা সৃষ্টি করতে পারে না। কেউ-কেউ বলেন, সরকার শিল্পকলার উন্নতিও করতে পারে না, কারণ, সরকারী পোষকতা মানুষের শিল্পকলা-প্রচেষ্টাকে ভুলপথে চালিত করতে পারে। এই বিপদ থেকে সাবধান হওয়ার জন্যে ভারত তিনটি জাতীয় আকাদেমি গঠন করেছে। নানা ক্ষেত্রের শিল্পীরা তাদের সভ্য। তাহলেও একথাও অস্বীকার করবার নয় যে, রাষ্ট্র উৎসাহ-অনুকূল্য দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে শিল্পকলার বিকাশ ঘটাতে পারে, আর, তা উচিতও। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে এর প্রয়োজন আরও বেশি। আগে কৃষি বা ব্যবসায়ে যাঁরা টাকা করতেন তাঁরাই শিল্পকলার পোষকতা করতেন। এই গণতন্ত্রের পরিবেশে এরকম ব্যক্তিরা হয় লোপ পেয়েছেন নয় তো পেতে বসেছেন। কাজেকাজেই এখন শিল্পকলার পোষকতা করার ভার রাষ্ট্রেরই নেয়া উচিত।

তরুণ শিল্পীদের অভাব থেকে মুক্ত রাখবার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বছরের জন্যে তাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে ভারতসরকার এক নতুন ব্যবস্থা করল। আর-একটি পরিকল্পনায় প্রথিতযশা শিল্পীদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হল, যাতে তাঁরা বিবিধ শিল্পকলার সমবীক্ষণ করে ক্ষয়িষ্ণু-মরিষ্ণু শিল্পকলার নানা নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চিত্রপত্র, চিত্রগ্রন্থ, অ্যাল্‌বাম প্রভৃতি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে সাধারণের ভেতর শিল্পকলা-প্রীতি উন্মিষিত করবার জন্যে। তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্যে মাঝে-মাঝে এঁদের চিত্রসমূহের প্রদর্শনীও করা হচ্ছে। প্রবীণ, নামকরা যে-সব শিল্পী এখন অভাবে পড়েছেন তাঁদেরও পেন্‌সন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সাহিত্য আকাদেমিও অনুরূপ কাজ করে যাচ্ছে সাহিত্যিকদের সম্পর্কে। এই আকাদেমি একটি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী রচনা করার ভার

নিয়েছে। •অতীত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ-প্রকাশেও সাহায্য করছে এই আকাদেমি। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির শ্রেষ্ঠ রচনার একটি করে সংকলন-গ্রন্থ-প্রণয়ন ও তাদের অন্য ভাষায় অনুবাদ করানোরও সিদ্ধান্ত করেছে এই আকাদেমি। এই অনুবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য-রিক্‌থ গড়ে-তোলা।

সংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের সময় এসেছে অতীত সৃষ্টির পুনর্মূল্যায়ন করার। এ-বিষয়ে নব-নব পরীক্ষণা করার তাগিদ দেখা যায় না সংগীতকারদের। তবে ঐকতান এবং সুরসংগতি-সৃষ্টির সূচনা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সংগীত বহুকাল ধরে অতীতের সম্পদ-গৌরব নিয়ে তৃপ্ত হয়ে আছে। অবশ্য, মাঝে-মাঝে সংগীতে কিছু-কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা যে না দেখা গিয়েছে তা নয়। এই প্রসঙ্গে নাম করা যেতে পারে আমির খুশরু, তানসেন ও সুরদাসের এবং হাল আমলে রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের মূল আদলের কোন পরিবর্তন হয় নি প্রায় পাঁচশো বছর ধরে।

ব্যক্তি বা মণ্ডলীর স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা ছাড়া এখন বিভিন্ন ঘরানার সংগীতকারেরা যাতে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করে নতুন রীতির উদ্‌ভাবন করতে পারেন তার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করিয়ে ভারত-সরকার ভারতীয় সংগীতের নবীন বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে। একথা বহুবিদিত যে, ভারতীয় সংগীতের দু'টি প্রধান ধারা হচ্ছে উত্তর-ভারতীয় এবং দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীত। দু'টি ধারাই আপন-আপন পথে বিকশিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত-বৈশিষ্ট্যের বিকাশের উদ্দেশ্যে জাতীয় আকাদেমি খোলার কথা হয়েছে। লখ্‌নউ-এ হিন্দুস্থানী সংগীত আকাদেমি এবং দক্ষিণ-কর্ণাটী সংগীত-সদনকে দু'টি অঞ্চলের সংগীতের প্রাচীন ঐতিহ্যের ন্যাসরক্ষক বলে ধরা হবে। এই কেন্দ্রদু'টির সংগীত-প্রচেষ্টায় নব-নব পরীক্ষণার স্থান হওয়ার নির্দেশ আছে। হিন্দুস্থানী সংগীত আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পরই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে আবেগ-উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে সংগীতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা। কোন্ স্বরগ্রাম, সুর ও সুরসংগতি ছেলেমেয়েদের মনে কোন্ ভাব সৃষ্টি করে তা নির্ণয় করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য। এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলেই ইস্কুলের প্রচলিত পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন করা হবে এর আলোকে।

নৃত্যেরও একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে ভারতে। ব্রিটিশদের আগমনের পর সে-ঐতিহ্য প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। অনেককাল ধরে নৃত্যশিল্প পেশাদার নর্তক-নর্তকীদের ভেতর ছিল সীমাবদ্ধ। সমাজে এঁদের স্থান ছিল না সম্মানের। এই শতকের ত্রিশের কোঠায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে উজ্জীবন হল নৃত্যশিল্পের। বহু প্রাচীন রূপ ও রীতির উদ্ধার করলেন তিনি; তার ফলে নৃত্যশিল্প আবার পেল মর্যাদা। এই শিল্পের উদ্ধার-সংস্কার-বিষয়ে উদয়-শংকরের দানও উল্লেখ্য। বিদেশে ভারতীয় নর্তনকলার মর্যাদাবৃদ্ধির জন্যে অনেক কিছু করেছেন তিনি। রাজনীতিক মুক্তি-লাভের পর নানা রীতির নৃত্যকলায় মানুষের অনুরাগ বেড়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে ভারতসরকার বিশিষ্ট নৃত্য ও সংগীত-সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। এই উপায় যে এইজাতীয় প্রাণবন্ত শিল্পকলার ধারা বজায় রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় তা বেশ বোঝা গেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখা যায়, সকল ভারতীয় ভাষাতেই লেখার যেন প্লাবন নেমেছে। সব সাহিত্যই নতুন জিজ্ঞাসা-সন্ধিৎসায় অনুপ্রেরিত, নবজীবনের চঞ্চলতায় অধীর। প্রাচীন প্রকাশ-রীতি আধুনিক পরিবেশের যোগ্যতার মাপে হচ্ছে পরীক্ষিত এবং প্রায়ই অসমর্থ বলে অনুযুক্ত। ভাষার বুনুনি নিয়েই কত পরীক্ষণা-প্রচেষ্টা চলছে। বাঙলায় তো দু'টি প্রান্তিক ভাবগতিক দেখা যায় এক্ষেত্রেঃ একটি আধুনিক, অপরটি পুরোনো; দুই-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে প্রাধান্য-লাভের। অন্যান্য ভাষার

বিকাশমান সাহিত্যগুলিতেও অনুরূপ ভাবগতিক লক্ষিত হয়। সাহিত্য-বিকাশের প্রচেষ্টায় একটা শুভসূচক ব্যাপার হল এক ভাষার সম্পদ অপর ভাষায় অনুবাদ করিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করা। অতীতে এ-রকমটা হতে পারে নি। জাতীয় সরকার এটা করতে পারে, আর করছেও। আগেই বলা হয়েছে, রা-শি-স-স প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় জাতীয় কমিশন এবং সাহিত্য আকাদেমি ঐ-কাজকে তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেছে।

নতুন-নতুন সাইক্লোপিডিআ বা বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করার আয়োজন হয়েছে: উদ্দেশ্য—সাধারণ মানুষের কাছে তার আপন ভাষায় আধুনিকতম জ্ঞানের বিষয় পৌঁছে দেয়া। তামিল আকাদেমি তামিল ভাষায় একটি সাইক্লো-পিডিআ বা বিশ্বকোষ-প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছে। তেলেগু আকাদেমিও ওর সঙ্গে সহযোগ করে তেলেগু ভাষাতে একটি সাইক্লোপিডিআ রচনা করার ব্যবস্থা করেছে। বাঙলা এবং মহারাষ্ট্রেও অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে। ভারতসরকার তো হিন্দী ভাষায় একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করবার সিদ্ধান্ত করেছে। সরল ভাষায় নানা জ্ঞাতব্য বিষয়কে সাধারণের লভ্য করে তোলা এবং অন্যান্য ভাষায়ও এইরকম বিশ্বকোষ রচিত হওয়ার একটা নমুনা বা আদর্শ স্থাপন করাও এর লক্ষ্য। নবশিক্ষিত বয়স্কদের জন্যে যে-সাধারণ ব্যবহার্য বিশ্বকোষ তৈরি করা হয়েছে তার কথাও এখানে না বলে পারা যায় না।

৫

ভারতের নবজাগরণের প্রকাশ হচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে তাদের বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি নামকরা সাহিত্যিকদের সম্মানিত করায়ও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। এক সাহিত্যের বৈচিত্র্য-সম্পদ অন্য সাহিত্যের লোকদের

কাছে উপস্থিত করারও চেষ্টা হচ্ছে। খুব উঁচুদরের সংগীতকারদের বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। নাটক, ভাস্কর্য, স্থাপত্যেও অনুরূপ পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা হচ্ছে। তরুণ শিল্পীদের বৃত্তি দিয়ে সরকার কর্তৃক উৎসাহ-দানের ফলও ভালো হয়েছে। দেশে শিল্পকলা-প্রদর্শনীর সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে ; এর কতকগুলো তো এক-একজনেরই শিল্পসৃষ্টির প্রদর্শনী হয়ে পড়েছে। জাতীয় কলাভবনের জন্যে বাছা-বাছা শিল্পসামগ্রী কিনেও শিল্পীদের উৎসাহিত করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পকলার সব রূপেই বিদেশীদের আগ্রহ-অনুরাগ উল্লেখ্য রকমে বেড়ে গেছে।

আধুনিক ভারতে শিল্পকলার সৃষ্টি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও আনুকূল্যের এ একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু, এ থেকেও বোঝা কঠিন নয় যে, এ-বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজন, প্রচেষ্টা-পরীক্ষণ যত হয়েছে, সাফল্য তত হয় নি। এ কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। অন্তরস্থ সংগতি-সামঞ্জস্যের ফলেই জন্ম নিতে পারে উচ্চকোটির শিল্প-সাধনা। এখন ভারতের সংগঠন এবং সংহিতির যুগ। এই সংহিতি বা সিন্‌থিসস্ পূর্ণ না হলে বিভিন্ন শিল্পকলার পরীক্ষণা অপ্রাপ্ত বা অ-পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শের অন্ধকারে হাতড়ানোর ভাব হয়েই থাকবে ; স্বপ্নদৃষ্ট লক্ষ্যের পানে প্রত্যয়শীল চরণে চলার ভাব তাতে থাকতে পারে না। যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও নতুন সাফল্যের জন্যে চাই বিচারশীল, মননশীল মন এবং মানসিক নিষ্ঠা-সততা। ভারতের ইতিসাসে যে-বিপর্যয় ঘটেছে তা প্রায়ই এই বিচারশীলতা ও বৈশ্লেষণিকতার অভাবে। দু'হাজার বছর আগেকার বহু ভাবধারা যে এখনও চলে আসছে তার কারণ তাদের আধুনিক যুগোপযোগিতা-সম্বন্ধে কেউ কোন তর্ক তোলে নি, প্রশ্ন করে নি। মোহেন্‌জোদরোর যুগ থেকে গৃহস্থের ব্যবহার্য আধার-পাত্রের রূপে তেমন-কোন পরিবর্তন হয় নি। সন্ধিৎসু, প্রাণবন্ত ও সক্রিয় মনের প্রকাশ হয় নব-নব আবিষ্কার-কর্মে। ভারতের রন্ধন-শিল্পে, আবাস-নির্মাণ-

পদ্ধতিতে এবং পরিধান-রীতিতে কোন উদ্‌ভাবনী বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষিত হয় না।

স্বাধীনতা যে ভারতের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কলাকৃতি ও সৃষ্টির উৎকর্ষ-লাভে কী প্রভাব রেখেছে তার বিচারের সময় এখনও আসে নি। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। এই মুক্তি বহু বাধা-নিষেধ অপসারিত করেছে এবং সুপ্ত শক্তির স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ স্ফুরণের অনুকূলে আবহাওয়া গড়ে-তুলেছে। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, যখনই অনাবশ্যক বাধাবিপত্তি সরিয়ে ফেলা গেছে এবং মানুষের তুষারায়িত প্রতিভার বিগলন-নির্ঝরণ হতে পেরেছে আনন্দে-স্বচ্ছন্দে তখনই সৃজন-প্রতিভার বিবিধ-বিচিত্র উৎসারণ ও প্রকাশ হয়েছে। এখানেও সেই ইতিবৃত্তেরই আবৃত্তি না-হওয়ার কোন সংগত যুক্তি নেই। তা যখন হবে তখন তার ফলও হবে সুদূর-প্রসারী। ভারতীয় অতীত সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে এই নবপ্রাণিত উৎসাহ-জোয়ারের যোগ ঘটে সংস্কৃতির যে মুঞ্জরণ ও প্রস্ফুরণ হবে তা শুধু ভারতীয় কৃষ্টি-রিক্‌থকেই সমৃদ্ধ করবে না, করবে সমগ্র মানব-পরিবারের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারকে।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষার্থীদের অনিয়মবর্তিতা

কিছুকাল ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুরুতর রকমের বিশৃঙ্খলা ও অ-নিয়মাচারের কতকগুলো প্রকাশ দেখা গেছে। সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী ও নেতারা তা লক্ষ্য করেছেন। কতকগুলো ক্ষেত্রে আবার ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা পরীক্ষার লক্ষকেরা আক্রান্ত হয়েছেন। কোথাও কোথাও পুলিশের বা জনসাধারণের একটা অংশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছে। এইরকম উগ্র অ-নিয়মাচারের উদাহরণ ছাড়া তরুণ সম্প্রদায়ের বেশির ভাগের ভিতর একটা উদ্দামতা আর বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন উত্তেজনা, বিক্ষোভ, অশান্তি মাথাচাড়া দিয়েছে প্রাচীন আদর্শ-নীতির ভাঙন আর নতুন মূল্যবোধের মান প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে। শিক্ষার্থীদের ঐ-দুঃশীলতা ও অ-নিয়মনিষ্ঠা তারই একটা অংশমাত্র। অবশ্য, ভারতে কতকগুলো বিশেষ কারণ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়েছে অসন্তোষ ও অমাননা। এই অবস্থাটা নিশ্চয় দুর্ভাবনার, কিন্তু এ যে সব ব্যবস্থার একেবারে বাইরে তা নয়; সে-রকম কার্যকর উপায় অবলম্বন করলে যে শিক্ষার্থীদের ভাবগতিক সহজ-স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, ঠিক এই অবস্থাতেই যদি এর প্রতিকার না করা হয় তবে সমস্যা এমনই সংকট-সংকুল হয়ে উঠতে পারে যে, তাতে জাতীয় জীবনের ভিত পর্যন্ত নড়ে-যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

১

কিন্তু প্রতিকার করতে হলে স্পষ্ট করে জানতে হবে এই বিশৃঙ্খলা-বিচ্যুতির হেতুগুলি কী, আর, যথার্থ অবস্থাটাই বা কী। সব হেতুর কথাগুলো বলতে হলে কেবল তারই জন্যে

একটা আলাদা গ্রন্থ রচনা করতে হবে। তা এখানে করা সম্ভব নয়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হেতুগুলোর কথাই বলা যেতে পারে :

॥ অ ॥ শিক্ষকদের হাত থেকে নেতৃত্বের অপসরণ ॥

ভারতের সমাজে শিক্ষকদের স্থান কোথায় তা জানতে হবে। তার সঙ্গে পোড়োদের মনোভাবের যথেষ্ট সংস্রব আছে। ওটা না জানলে তাদের অ-নিয়মানুগত্যের কারণ ধরা যাবে না। এর অন্যতম কারণ নিহিত আছে ওতেই। শিক্ষাব্যাপারের কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব যেখানে শিক্ষকদের হাতে সেখানে পোড়োদের ভেতর অ-নিয়মবর্তিতা দেখাই দেয় না। দুঃখের বিষয়, অতীত ভারতে শিক্ষকরা যে-শ্রদ্ধা-সম্মান, যে-প্রীতি পেতেন এখনকার শিক্ষকদের ভাগ্যে তা জোটে না। এর জন্যে যে তাঁরাই দায়ী তা নয়। শিক্ষকদের নেতৃত্ব হস্তচ্যুত হওয়ার প্রধান কারণগুলো এখানে বলা যাচ্ছে :

(ক) ১৯২০-র সময় থেকে ভারতে রাজনীতিক চেতনা বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার্থিরাও রাজনীতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তারা এই সংগ্রামে সুনির্ধারিত নীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও রাজনীতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ-ভাব এবং জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামের সংকল্প বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতাদের ব্যক্তিত্ব ছাত্রসমাজের মনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। নানা কারণে শিক্ষকরা রাজনীতিক সংগ্রামে নামতে পারেন নি এবং তার জন্যে শিক্ষার্থীদের মনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা খানিকটা গিয়েছিল নষ্ট হয়ে।

(খ) গত ত্রিশ বছর ধরে প্রচলিত শিক্ষাধারার অবিরাম নিরঙ্কুশ সমালোচনা হয়ে এসেছে। সমালোচনা নিয়েছে নিন্দার

রূপ। এই নিন্দার হাত থেকে শিক্ষকরাও রেহাই পান নি এর ফলে তাঁদের প্রত্যয় ও মনোবলের ভিত্তি যায় নড়ে, আর শিক্ষাবৃত্তির ওপর জনসাধারণের শ্রদ্ধাও নষ্ট হতে থাকে। এতে শিক্ষাধারা আর শিক্ষকদের ওপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব গড়ে-ওঠে পোড়োদের মনে ; তাই, শিক্ষার সদ্‌ব্যবহার করার পক্ষে তাদের বাধা হয়।

(গ) এই সময়ে আর-একটা কারণেও শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে থাকে। সেটা হচ্ছে তাঁদের উপার্জন-মানের অবনমন। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে খুব কম ভারতীয়েরই উঁচু সরকারী পদ পাওয়ার আশা থাকত। শিল্প-বাণিজ্যেও পথ তেমন খোলা ছিল না। অন্য দিকে আয়ের পথ মুক্ত হওয়ার পর বেশির ভাগ আয়-কামী লোক সেই পথে যেতে থাকলেন ; যাঁদের সে-সব পথ ছিল না তাঁরাই শিক্ষাবৃত্তি নিতে বাধ্য হতেন।

(ঘ) যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালীন মুদ্রাস্ফীতির জন্যে বেশি-অর্থকর পদের চাহিদা বেড়ে গেছে। শিক্ষকদের যে-বেতন আগেই ছিল অনুপযুক্ত তা এখন তো আবার কোনোরকমে জীবন-ধারণেরও অনুপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য উপায়ে আয়ের দিকে শিক্ষকদের মন দিতেই হল, বিশেষ করে বড়ো-বড়ো শহরে। বহু প্রবীণ শিক্ষক এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এদিকে তরুণেরাও এ-বৃত্তি নিতে উৎসাহ বোধ করেন না। শিক্ষকরা এখন যে শুধু দরিদ্র তা-ই নয়, তাঁরা ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য-বোধে প্রায় বিধ্বস্ত। এতে যে তাঁদের শুধু সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ বা নষ্ট হয় তা-ই নয়, এই অবস্থা সারা সমাজের পক্ষেও তাঁদের বিপজ্জনক করে-তোলে।

(ঙ) শিক্ষা-সুযোগের প্রসার খুবই বাঞ্ছনীয়। তা হয়েছেও। কিন্তু এর ফলে এখন শিক্ষকের মর্যাদা নেমে যেতে বসেছে। তার কারণ দু'টি : এক, এই কাজের পারিশ্রমিক কম হওয়ায়

আর শিক্ষকের চাহিদা বেড়ে-যাওয়ার ফলে বহু অযোগ্য লোক এই কাজ নিতে থাকলেন। দুই, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিস্তর বেড়ে-যাওয়ার দরুন শিক্ষকদের সঙ্গে পোড়োদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক বলতে কিছুই রইল না। আগে কিন্তু এটা থাকত বলে শিক্ষকরা পোড়োদের শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করতেন তাঁদের পাণ্ডিত্য অথবা চরিত্রগুণে। এখনকার এই নতুন পরিস্থিতিতে অযোগ্য শিক্ষকদের আর সে-সম্মান-শ্রদ্ধা-লাভের কোন উপায় নেই, কারণ, তাঁদের সে-পাণ্ডিত্য বা চরিত্রশক্তি—কোনটাই নেই, তার ওপর আবার পোড়োদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কের সুযোগের তো অভাব আছেই।

(চ) শিক্ষাব্যাপারের ওপরও শিক্ষকদের কোন হাত নেই। রাজনীতিক নেতারাই বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়-পরিচালনার ক্ষমতা অধিকার করে থাকেন। এমন কি, পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষা-ব্যাপারের নির্ধারণ-কর্তৃত্বও শিক্ষকদের হাতে থাকে না। শিক্ষাধারায় পরীক্ষা-প্রথাকে অযথা গুরুত্ব দেয়ায় শিক্ষকরা হয়ে দাঁড়ান পরীক্ষা-লক্ষ্যের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করার কর্তামাত্র।

(ছ) বহুশিক্ষক একেবারে পাইকারী দরে টুইশানি করেন। এর জন্যেও তাঁদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হয়েছে হাতছাড়া। এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা বিদ্যালয়ের কাজের চেয়ে গৃহশিক্ষকতার কাজে বেশি সময় ও মন দেন। বলা বাহুল্য যে, বাইরে ঐ-খাটুনির পর শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে এসে আর খাটতে পারেন না। তাছাড়া, পোড়ো বা তার অভিভাবকের কাছে থেকে হাতে-হাতে পারিশ্রমিক নেয়ার জন্যেও কেমন-একটা ব্যবসাদারির সম্পর্ক গড়ে-ওঠে। তাতেও পোড়োদের ওপর শিক্ষকদের কর্তৃত্ব যায় কমে।

(জ) ওপরে যে-কথাগুলো বলা হল তাতে শিক্ষকদের শিক্ষকতা ও অন্যান্য গুণের মান নেমে-যাওয়ার কথা আছে। একবার শিক্ষকদের গুণ-যোগ্যতা নেমে-যাওয়ার পর পোড়োদের ওপর থেকে তাঁদের সে-প্রভাব বা কর্তৃত্বও দ্রুত গেল চলে। এইভাবে

দেশের শিক্ষাব্যাপারে একটা দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হল। একদিকে শিক্ষকদের হাত থেকে নেতৃত্ব চলে-যাওয়ার দরুন যোগ্যলোক এ-বৃত্তি থেকে সরে যেতে থাকলেন, অন্যদিকে যোগ্যলোক এ-বৃত্তি না নেয়ার জন্যেও শিক্ষকদের কর্তৃত্ব ও অধিকার হতে-লাগল হাতছাড়া।

॥ আ ॥ অর্থনীতিক সংকট-বৃদ্ধি ॥

যে-কোন যুগেই শিক্ষকদের নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়াটা ভাবনার কথা। কিন্তু এখন অর্থনীতিক সংকট বাড়তে-থাকায় ব্যাপারটা জটিলতর সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। দেশে এখন অবশ্য উৎপাদন-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে। তার ফলে মানুষের কাজকর্মেরও সুযোগ বেড়েছে। রোজগারের সুযোগ হয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু, দেশের অর্থনীতিক কষ্ট যে মোটের ওপর বেড়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এটা অবশ্য সারা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থারই একটা খণ্ডপ্রকাশ। গত দ্বিতীয় মহাসমরে দেশে-দেশে ধন-সম্পদের বিনষ্টি ঘটেছে বহু। তার ফলে অভাব দেখা দিয়েছে সর্বত্র। এমন অবস্থায় শিল্পে-বাণিজ্যে, অর্থে-বিষয়ে যে-সব দেশ উন্নত ও অগ্রগামী তাদেরই যদি অপ্রাচুর্য ও অনটন দেখা দেয় তবে ভারতে যে অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটবে—সে আর বেশি কথা কী। দেশে জনসংখ্যাও বেড়েছে। তারপর, আগে যে-অবস্থায় মানুষ মেনে-মানিয়ে থাকত এখন আর তা থাকতে চায় না। এর প্রভাব দেখা যায় ছাত্রসমাজেও; নানা রূপে তার প্রকাশ ঘটছে। তার কতকগুলি এখানে বলা হচ্ছেঃ

(ক) এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে-চলেছে। এমন অনেক পোড়ো আছে যাদের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। নিতান্ত দরকারী জিনিসের অভাব মেটাবার মতন আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। তাই এই অভাবের চাপ তাদের অনুভব ও সহ্য

করতে হয় তরুণ বয়সে। বহু পোড়োকে তো নিজেদের খরচা চালাবার টাকা নিজেদেরই রোজগার করে নিতে হয়। আগে পোড়োরা সংখ্যায় ছিল কম। সাধারণত অবস্থাপন্ন বা ধনী ঘরের ছেলেরাই পড়াশোনা করত। কাজেকাজেই অর্থনীতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হত না তাদের।

(খ) অধ্যয়নকালেই তো তাদের বইতে হয় এই অভাব-অনটনের বোঝা, সইতে হয় তার জন্যে মর্মজ্বালা ; তারপর সে-পর্ব যখন সমাধা হয় তখন তো অবস্থা হয় দারুনতর। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কি কলেজের বেশির ভাগ পোড়োরই তো কোনো ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা নেই, লক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট কোন ছক নেই। পড়াশোনা শেষ হলে কী যে তারা করবে তার কিছুই জানে না। অর্থাৎ, শিক্ষা যেন উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন ; আর, সেইজন্যেই এ-শিক্ষা তাদের কোন কাজের যোগ্য করে তোলে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইস্কুল থেকে কলেজে, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঢোকে তাদের আর কোনও গতি নেই বলে, তাদের উচ্চতর শিক্ষা নেয়ার যোগ্যতা আছে বলে নয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন গতি বা কাজকর্মের কথা তারা ভাবতেই পারে না , মনে কেমন একটা আবছা ধারণা, যদি কোনভাবে কিছু ঘটে যায়। উচ্চতর শিক্ষায়তনে প্রবেশের ফলে অবস্থাটা হয় শোচনীয়তর, কেননা, তখন শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা হয়ে পড়ে উঁচু। ইস্কুল থেকে বেরোনোর পর যে-কাজ পেলে তারা তুষ্ট হতে পারত তখন আর তা হওয়ার মত মন থাকে না। অবিরত নিরঙ্কুশ বিরূপ সমালোচনা ও নিন্দার ফলে প্রচলিত শিক্ষাধারার ওপর অশ্রদ্ধা, লক্ষ্যহীনতা, সামর্থ্য ও প্রত্যাশার অসংগতি—এইসব মিলে তরুণদের মনে সৃষ্টি করে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা-বোধ, আর এতে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে তাদের চরিত্রবল। এই যে নৈরাশ্যজনিত মানসশক্তির বিচ্যুতি-বিভ্রান্তি—এতে কি সমাজের ভিতে নোনা না ধরে পারে ?

(গ) সমাজে স্থায়ী আর্থিক অনিশ্চয়তা-বোধ থাকার দরুন অর্থনৈতিক সংগ্রাম যায় বেড়ে। ছাত্রজীবনে পোড়োরা যে-রোজগার করে তা অতি অকিঞ্চিৎকর ও অনিশ্চিত। অধ্যয়ন-জীবনের পরেও অর্থার্জনের সম্ভাবনা অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন। আশপাশের বেশির ভাগ লোকের শোচনীয় দারিদ্র্য এই মানসিক দুঃখবেদনাকে তোলে তীব্রতর করে। ইস্‌কুল-কলেজের শিক্ষার্থী-নিবাসগুলোতে যদি-বা কিছু বসবাসের সুবিধার উপকরণ থাকে তো প্রাইভেট মেসগুলোতে তা-ও থাকে না। কাজেকাজেই, অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে জীবন কাটাতে হয় নানা অসুবিধা, বাধাবিপত্তি নিয়ে, সংকীর্ণ ও নোংরা পরিবেশে। ফলে তাদের মনে অসন্তোষ, বিরক্তি ও বিক্ষোভ থাকে জমে। তার ওপর যুগের হাওয়ার যোগান তো আছেই। অল্প-সংখ্যক ধনিসন্তানের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে তারা যদি সমাজের প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে তো সে কি খুব আশ্চর্যের কথা?

॥ ই ॥ বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটি ॥

প্রচলিত শিক্ষাধারায় যে দোষত্রুটি আছে তা মানতেই হবে। তা স্বীকার না করলে তার প্রতিকার করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে দোষত্রুটির শুধু নিরঙ্কুশ নিন্দা করলেই চলবে না। তবে সেগুলো কী তা ভালো করে জানতে হবে, জেনে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কোন শিক্ষাধারা নেই যা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। কিন্তু তাই বলে দোষত্রুটি ধরা পড়লে তার সংশোধন করতে হবে না—এ কোন কাজের কথা নয়। প্রচলিত শিক্ষাধারার কতকগুলো জিনিস ছাত্রসমাজের বিশৃঙ্খলার জন্যে সাক্ষাৎ ভাবে দায়ী। এইগুলোই তাদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে অসন্তোষ ও নৈরাশ্য আনে। এগুলোর ভেতরে আশু সংশোধন দরকার যেগুলোর, পরের তিনটি পৃষ্ঠায় সেগুলোর উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(ক) বর্তমান শিক্ষাধারা প্রধানত গ্রন্থগত ও তত্ত্বমুখী। যারা উচ্চশিক্ষার অভিলাষী তাদের পক্ষে এ-শিক্ষা উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু যাদের প্রবণতা হচ্ছে নন্দনকলা, কারিগরি বা ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে তাদের পক্ষে এ-শিক্ষায় যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নেই। এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য কেরানী তৈরি করা—একথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না। তবে, এ যে আরামের কাজের দিকে মনের ঝোঁক সৃষ্টি করে তা অস্বীকার করা যায় না। এই ধারা দৈহিক শক্তিসামর্থ্য এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশে আনুকূল্য করে না, বরং অবহেলা করে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের দেখা যায় শারীরিক শ্রমে বিমুখ হতে; অতি সাধারণ শ্রমসাধ্য কাজ করতেও তারা অক্ষম। নৈতিক মূল্যবোধ এবং চরিত্র-গঠনের ওপরও এই ধারা উদাসীন।

(খ) তত্ত্বমুখিতার দিক থেকেও যে এ-শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ তা-ও বলা যায় না। অবশ্য, এমনিতে দেখতে পাঠ্যবিষয়ের তালিকা বেশ চমৎকার; আর, সেইমতো শিক্ষা যদি হতে পায় তবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা আর সমঞ্জস বুদ্ধির শক্তি বাড়ার কথা। কিন্তু, আসলে কাজে কী হয়?—কাজের বেলা দেখা যায়, পোড়োদের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করার যতখানি ঝোঁক হয় ততখানি হয় না বোঝবার। এর একটা প্রধান কারণ হল অন্ত্য পরীক্ষার ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করা। পোড়োদের বিদ্যাবুদ্ধির বিচার হয় অন্ত্য পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে; অথচ এ-পরীক্ষার মানে যতখানি স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা ততখানি বুদ্ধিবিচারের নয়। এই জন্যে পোড়োরাও সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার সপ্তাহকয়েক আগে যত পারে মুখস্থ করে কোনমতে পাস করতে চেষ্টা করে। এতে নানা অবাঞ্ছনীয় ফল দেখা দেয়। সারা বছর ধরে পোড়োদের প্রাণশক্তিকে ব্যাপৃত রাখা হয় না বলে তার প্রকাশ হতে থাকে অন্য আকারে; তার অনেকগুলোই হয় সমাজ-বিরোধী। এই ধারায় স্থায়ী ও শ্রমসাধ্য-কাজ করার ব্যবস্থা নেই, আছে থেকে-

থেকে, ছাড়া-ছাড়া ভাবে কাজ করার পোষকতা।. সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অন্ত্য পরীক্ষার ফলাফলকে অমন এক চরম মূল্য দেয়ার রীতি থাকায় অন্যায় উপায়েও পরীক্ষা পাস করার সহজ পথ নেয়ার চেষ্টা হয়।

(গ) সরকারী বা বেসরকারী ভালো চাকরি পেতে হলে ডিগ্রী একান্ত দরকার—এই ধারণা ফাইনাল পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ার কুফলকে করেছে পুষ্ট। ডিগ্রীর মোহ সামর্থ্য-অসামর্থ্য বিচার না করতে দিয়ে হাজার-হাজার পোড়োকে টেনে নিয়ে ঢোকাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার নিকেতনগুলোতে। এই স্তরের শিক্ষার অনেকটাই বোধগম্য হয় না বহু শিক্ষার্থীর। আর, বহু অনমুরক্ত বা অযোগ্য, অথবা এই দু'রকমেরই পোড়ো থাকায় শিক্ষার মান উন্নত হতে পায় না, নেমে যায়। তাতে সমর্থ শিক্ষার্থীদের কাজও আগাতে পায় না। শুধু তা-ই নয়, কর্তৃপক্ষের সামনে কতকগুলো নতুন সংকট-সমস্যা উপস্থিত হয়। পোড়োরা পাঠ্যবিষয়ে অনুরক্ত হলে পাঠকক্ষে কোন গণ্ডগোল হয় না। যে-সব পোড়োর পাঠনে অনুরাগও নেই সামর্থ্যও নেই তাদেরই গল্প করতে ইচ্ছে করে; তাতে পাঠনে বাধার সৃষ্টি হয়। আর, এটা যে শুধু পাঠনকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। সেখানে নিয়ম-অমাননার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেলে অন্যত্রও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

(ঘ) ভারতীয় শিক্ষাধারায় শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অসহিষ্ণু কর্তৃত্বের মনোভাবও তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অ-নিয়মবর্তিতা বাড়ার অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে জ্যেষ্ঠ বা ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অনমনীয়, অভ্রান্তম্মন্য, কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাবের এ এক প্রকাশ। এদেশের ধারাটা এই: জ্যেষ্ঠরা সাধারণত কনিষ্ঠদের মতামতের দাম দিতে চান না, কনিষ্ঠদের মতান্তর বা মতস্বাতন্ত্র্যকে ঔদ্ধত্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু, তাতে যে

তরুণচিত্তের স্বনির্ভরতা এবং আত্মপ্রত্যয় আহত ও দমিত হয়, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে বাধা হয়—সেকথা ধরা হয় না। এর ফলে, কি পাঠ্যবিষয়ে, কি পাঠ্যেতর বিষয়ে তারা শুধু অন্যের আদেশ-নির্দেশ পালন করেই তুষ্ট থাকে। এই জন্যেই বিদ্যালয়গুলোও গণতান্ত্রিক রীতির ঠাঁই না হয়ে আছে কড়া কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাবের জায়গা হয়ে। এখানে প্রতি পদে পোড়োদের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে। যতদিন শিক্ষা রোজগারের অনুকূল হয়ে ছিল ততদিন তবু এর এবং এই ধারার কর্তৃপক্ষের ওপর শ্রদ্ধা-আনুগত্য রাখা সম্ভব ছিল, ততদিন এর বিরুদ্ধে কোন তর্ক ওঠে নি তরুণদের মনে। কিন্তু শিক্ষিতদের বেকার-সমস্যা দিন-দিন বাড়তে থাকায় এই মামুলী বিধিব্যবস্থার ওপর থেকে চিরাচরিত স্বীকৃতি-সমর্থন চলে যেতে থাকল। তাছাড়া, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিদ্রোহ-বিক্ষোভের মনোভাব তরুণদের মনের চাপা বিরক্তিকে করল আত্মঘোষণায় প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ। মুক্তিসংগ্রামের আইন-অমান্য আন্দোলনের উত্তেজনায় সংগত ও অসংগত বিধি-বিধানের পার্থক্য-বোধ হল লুপ্ত বা স্তিমিত। যা-ই হোক, তরুণচিত্তে একবার প্রচলিত কতকগুলো বিধি-রীতির অমাননা করার অভ্যাসের ফলে আর-সব বিধিবিধানেরও অপালন করার মানোভাব বাড়তে লাগল। এখনকার শিক্ষার্থীদের অ-নিয়মবর্তিতার অনেকখানিই জাতীয় সংগ্রামের ভাবধারার জের।

॥ ঈ ॥ আদর্শবাদের ব্যাপক বিচ্যুতি ॥

দারিদ্র্যের অবিরাম চাপে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো যায় শুকিয়ে। নানা কারণে এখন আদর্শবাদের ভিত্তি গেছে নড়ে। এতে অর্থনীতিক দুর্দশার মন-কুরে-কুরে-খাওয়ার শক্তি বেড়ে গেছে। গত বিশ-ত্রিশ বছরে সারা পৃথিবীতে ঘটনার গতি এমনই হয়েছে যে, তাতে অপ্রত্যয়, সংশয়, লোভ আর বিদ্রোহের ভাব উদ্দীপ্ত

হয়েছে। এর কতকগুলো প্রধান কারণের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে :

(ক) বিশ শতকের প্রথমার্ধেই দু'টি মহাসমর ঘটে গেছে। তাতে মানব-সমাজে একটা ব্যাপক নীতিভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছে। এই মহাসমরদুটিতে প্রথম বলি হয়েছিল সত্য। তখন বিদ্বেষ আর জুগুপ্সাই মানুষের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে একশ্রেণীর লোক যে-কোন হীন উপায়েও অর্থ উপার্জন করতে সংকোচ করে নি। আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দুঃখদুর্দশা হল। তাতে আদর্শের প্রতি মানুষের অনুরাগ-নিষ্ঠা কমে যেতে থাকল। সমাজে চোরাকারবার, কালোবাজার, উৎকোচ, মুনাফাবাজি প্রভৃতি দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

(খ) ঐ-লড়াইদু'টিতে সাধারণ ভাবে আদর্শনীতির মান নেমে-যাওয়া ছাড়া আর-একটা ক্ষতিকর ব্যাপার হল বেশির ভাগ পোড়োর সংকল্প-শক্তির বিনষ্টি। সমরকালে কতকগুলো উৎপাদন-শিল্প এবং কারবারের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটেছিল। সরকারী কাজকর্মও বেড়ে গিয়েছিল ঢের। তার জন্যে অনেক অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক দিয়েও কাজ চালাতে বাধ্য হতে হয়েছিল সরকারকে। অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে উঠল যে, যোগ্যদের চেয়ে অযোগ্যরাই উন্নতি করার সুযোগ পেতে লাগল। চরিত্র, যোগ্যতা, এমনকি কর্মঠতারও তেমন কোন স্বীকৃতি থাকল না। এরকম পরিস্থিতিতে যে শিক্ষার্থীরাও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে, তাদের শিক্ষার মান যাবে নেমে তাতে আর আশ্চর্য কী?

(গ) বস্তুতন্ত্রী চিন্তাধারাও মানুষের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করেছে। এতে উপায়ের চেয়ে লক্ষ্যকেই বড়ো করে ধরা হয়, বলা হয়, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে যে-কোন উপায়ই অবলম্বনীয়। সমাজবাদী ভাবধারার সামাজিক বিচারের দাবি তরুণচিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে; তাতে তারা ন্যায়-

প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনা খুঁজে পায়। সমাজবাদের এই আদর্শ তাদের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রোহকে করে তোলে তীব্র। অর্থনীতিক দুর্দশা, অর্থার্জনের উপায়াভাব ও নৈরাশ্য-ব্যর্থতার পটভূমিকায় নৈতিক আদর্শচ্যুতি, এমন কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা-লুপ্তির ভয়েও তরুণ শিক্ষার্থীরা ভীত হয় না। তার কারণ, তারা মনে করে, জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তার জন্যে এ-মূল্য তাদের দিতেই হবে।

(ঘ) যে-আর্থিক অনিশ্চয়তার জন্যে শিক্ষার্থীরা জীবনে বিপন্ন বোধ করেছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাদের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফল হয়েছে সুদূর-প্রসারী। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কার-প্রত্যয় গেছে ধ্বসে। তার ফলে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয় দৃঢ় ভিত্তির অভাব ঘটেছে। একদা ছিল যৌথ পরিবার-প্রথা। ব্যক্তি-মানুষ তারই পরিধিতে ঘুরত-ফিরত, কাজ করত তারই বাঁধনে। এখন শুধু যৌথ পরিবার-ব্যবস্থাই ভেঙে যায় নি, সবরকম পারিবারিক বন্ধনই গেছে শিথিল হয়ে। তাই, ছেলেমেয়েদের সামাজিক করে-তোলার একটা শক্ত জিনিসই আল্‌গা হয়ে পড়েছে। তার জায়গায় নতুন কোন শক্তিই হয় নি স্থাপিত। ছেলেমেয়েরা হারিয়েছে বাইরের সেই কল্যাণপ্রদ নির্ভর। তাদের চলতে হয় আপন খেয়ালে; রক্ষণাবেক্ষণ তাদের নেই বললেই হয়। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অ-নিয়মবর্তিতার অনেকটাই তাদের এই অ-নিরাপত্তাবোধের ফল।

(ঙ) আর-একটা অশুভ পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ হল আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সাফল্য। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে তরুণেরা যে-সব নেতানায়কের প্রশংসায় মুখর ছিল তাঁরা ছিলেন মুক্তি-সংগ্রামে নির্যাতিত, দুঃখবরণকারী মানুষ। তখন কংগ্রেস আর জাতীয় নেতারা দুঃখবরণ আর ত্যাগের যে-আদর্শ তুলে-ধরেছিলেন তাদের সামনে তারই বাতাবরণে মানুষ হয়ে উঠছিল

তারা। এখন মুক্তিলাভের পর সংগ্রামের কাল হয়েছে অতীত। তখন যাঁরা ছিলেন সংগ্রাম-নায়ক তাঁরাই এখন রাষ্ট্রধুরন্ধর। এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, একশ্রেণীর তরুণের মনে এসেছে অশ্রদ্ধার ভাব, বিশেষ করে যারা ঐ-সব নায়কের সংগ্রামী রূপের সঙ্গে পরিচিত নয়, যারা তাঁদের দেখছে শুধু ক্ষমতা আর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত।

(চ) শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নেমে-যাওয়াতেও পোড়োদের আদর্শচ্যুতির অন্যতম কারণ ঘটেছে। শিশুরা ছেলেবেলা থেকে বই-এ পড়ে—শিক্ষকমশায়দের মান্য করা উচিত, কিন্তু বাস্তবে তারা কী দেখে?—ঠিক তার উল্‌টো। এতে করে তাদের মনেও কথা আর কাজের অসংগতিকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে নেয়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। তাদের ধারণা জন্মে যায় যে, বই-এ যা পড়া হয় তা বই-এরই কথা, কাজের জগতে তার কোন মানে নেই। মনীষী প্লেটো বলেছেন, মানুষের জীবনে সবচেয়ে শোচনীয় অভিশাপ হচ্ছে মানস-সত্তায় মিথ্যার অস্তিত্ব। আমাদের বর্তমান সমাজে মানস-সত্তায় মিথ্যার অস্তিত্বকে আনুকূল্য দেয়া হচ্ছে শিক্ষকদের মর্যাদা নষ্ট করে বা হতে দিয়ে।

(ছ) ওপরে যে-সব ব্যাপারের কথা বলা হল সেগুলোর ফলে একমাত্র সাফল্যকেই মূল্য দেয়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। আর, সাফল্য-কথাটার মানেও হয়ে গেছে সংকীর্ণ; শুধু পার্থিব বা বৈষয়িক সুখসম্পদের সাফল্যকেই সাফল্য বলে মনে করা হয়। শিল্পকলা-সৃষ্টি অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা-আবিষ্কারের যে-সাফল্য শ্রমসাধ্য এবং অধ্যবসায়-লভ্য তার চেয়ে বৈষয়িক-আর্থিক সাফল্যের মর্যাদা দেয়া হয় বেশি।

২

ভারতের শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও অ-নিয়মবর্তিতার মূল হেতুগুলোর কথা আগে বলা হল। এখন সেগুলির নিরাকরণের

উপায়ের কথা বলা হচ্ছে। সবগুলোই যে এখনই নিরাকৃত করতে পারা যাবে তা নয়। বহু বছর ধরে এই দোষগুলো শেকড় গেড়েছে। কাজেকাজেই, এগুলোর উৎপাটনও হতে হবে ক্রমে-ক্রমে। কোন্‌গুলোর প্রতিকার আগে করতে হবে কোন্‌গুলো পরে তা নিয়েও মতভেদ হবে। তবে, আমার মতে এ-কাজ শুরু করা উচিত শিক্ষকদের নেতৃত্ব-চ্যুতি-ব্যাপারটার প্রতিকার দিয়ে। এ-ব্যাপারটা সাক্ষাৎ শিক্ষাসমস্যা; অন্যগুলোর প্রতিকার করতে হলে চেষ্টা চালাতে হবে বহু ক্ষেত্রে। শিক্ষকের অগ্রবর্তিতা-পৌরোহিত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে আর-সব সমস্যার সমাধান অনেক-খানি সহজ হয়ে উঠবে। পোড়োদের ভেতর যে-নৈরাশ্য-বিমুখতার ভাব দেখা দিয়েছে তার অপসারণে সাহায্য করতে পারে শিক্ষকদের সম্মান ও সন্তোষ। আর, একবার শিক্ষার্থীদের মানস-স্বাস্থ্য ফিরে এলে সমাজের অন্যত্রও তার প্রভাব ছড়াবে।

॥ অ ॥ শিক্ষকদের নেতৃত্ব-উদ্ধারের উপায় ॥

আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা হবে নানা স্তরের শিক্ষকদের নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সংস্কারের এই প্রচেষ্টায় মনে রাখতে হবে, যেন বর্তমান ব্যবস্থার নির্বিচার নিন্দাই না করা হয়। আগেই বলা হয়েছে, এরকম অন্ধ উগ্র দোষ-দর্শনে হিতের চেয়ে অহিতই হয় বেশি। তাতে শিক্ষকদেরও মানস-প্রশান্তি নষ্ট হয়, শিক্ষার্থী-দেরও ব্যর্থতা-বোধ আনে। শিক্ষা-সংস্কারের উপায় অবশ্যই অবলম্বন করে চলতে হবে অবিরাম, কিন্তু উপস্থিত শিক্ষাধারার ত্রুটিবিচ্যুতির অতিরঞ্জন না করে। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের ভেতর যেন কোন ফাটল না দেখা দেয়। নবীন শিক্ষকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, আত্মপ্রত্যয় ও আশাবাদ অবশ্যই প্রশংসনীয় বলে মানতে হবে, কিন্তু তাতে যদি প্রবীণ শিক্ষকদের প্রতি ঔদাসীন্য, অবহেলা প্রকাশ প্রায়, যদি তাঁদের

অসংশোধনীয় অপাঙ্‌ক্তেয় বলে ভাবা হয় তবে ফল খুব শুভ হতে পারে না।

শিক্ষাসংস্কারের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও গুণের উন্নয়নের ব্যবস্থা। আর, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাতটাও কার্যোপযোগী হওয়া দরকার। যতকাল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য ও ভালো মানুষ না আসছেন ততকাল শিক্ষার যথার্থ উন্নতির কোন আশা নেই। আর, গুণী শিক্ষক এলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতটা ঠিকমতো না হলে ভালো কাজ হতে পারে না। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতেই হবে, বাড়াতে হবে শুধু শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্যে নয়, তাতে দেশের মনোভাবের শুভ পরিবর্তন হবে বলেও। কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরেই জাতীয় শিক্ষার জন্যে শিক্ষক লাগবে প্রায় ২৭ লক্ষ। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ৬ লক্ষ। অতএব, শিক্ষার প্রয়োজনীয় প্রসারের ব্যবস্থা হলে আরও প্রায় কুড়িলক্ষ শিক্ষককে নিযুক্ত করা যাবে। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরেও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়বে। এখনকার তরুণদের ব্যর্থতা-বোধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষিতদের বৃত্তিহীনতা বা বেকার-সমস্যা। আর, যদি চারলক্ষ শিক্ষককে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদানকার্যে নিয়োগ করতে পারা যায় তবে শিক্ষিত তরুণদের বেকার-সমস্যা প্রায় ঘুচে যাবে। এতে তরুণদের ভেতর আশা আর বিশ্বাস, সাহস আর প্রেরণা সঞ্চারিত হবে। তার ফলে দেশের মানসিক আবহাওয়ারও অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেবে।

শিক্ষকদের গুণের মান এবং সমাজে তাঁদের স্থান উন্নত করার জন্যে অর্থনীতিক সুব্যবস্থা খুবই দরকার সন্দেহ নেই, কিন্তু, এই সুব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মাইনে বাড়ালেই তা হতে পারবে। কেউ কেউ মনে করেন, তাঁদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা বাড়ালেই তা হবে। আবার,

আর-এক শ্রেণীর লোকের ধারণা যে, তাঁদের আদর্শবাদ উদ্দীপ্ত করতে পারলেই তা হতে পারে। আসলে, এই তিনটি উপায়ই অবলম্বনীয়। এই তিনটি উপায়ের সহযোগেই কার্যসিদ্ধি হতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষকদের গুণের মান ও মর্যাদা বাড়ানোর এই উপায়গুলি-অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে:

(ক) এখন যোগ্য-সক্ষম ব্যক্তিরা সাধারণত শিক্ষকবৃত্তি নিতে চান না। এর কারণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দু'টি: এক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবাদর্শের অবনমন; আগেকার সেই যথার্থ বিদ্যাচর্চার পরিবেশ আব তেমন দেখা যায় না। দুই, গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষকদের বেতনের হার অতীব অল্প; প্রায় অন্য যে-কোন বৃত্তির পারিশ্রমিকের চেয়ে এই বৃত্তির মান নীচু।

সুতরাং, প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিদ্যাচর্চার সেই ভাবাদর্শের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে সেখান থেকে রাজনীতিক দলাদলি আর ছলচাতুরী সরিয়ে ফেলতে হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য অফিসারকে নিয়োগ করতে হবে গুণের বিচারে, দলীয় নীতির বিচারে নয়। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের নির্দেশ-অনুযায়ী উপাচার্য-নির্বাচনের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্‌ডিকেট ও সেনেট-পুনর্গঠনের নীতি গ্রহণ করলে ঐ দোষগুলি বহুলাংশে অপসারিত হবে। ঐ-নির্দেশগুলি গ্রহণ করতে হলে অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংক্রান্ত অনেক বিধানের সংশোধন করে নিতে হবে। তাতে অর্থব্যয়ের বিশেষ কোন দায়ে পড়তে হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিমণ্ডল-পরিবর্তন ছাড়াও শিক্ষকদের দক্ষিণা বাড়াতেই হবে, বিশেষ করে প্রথম দিকে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই দেশের নানা ক্ষেত্রের গুণী ও যোগ্য লোকদের একটা মোটা অংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি সরকারী-বেসরকারী ভালো চাকরির প্রাথমিক বেতনের মতো বেতন দিতে পারে, তবে অন্তত কতকগুলি যোগ্যতম ব্যক্তি যে তরুণ

বয়সেই শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর, একবার এ-দিকে এলে, এসে এই বৃত্তিতে আপন-আপন বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরক্ত হলে সরকারী-বেসরকারী চাকরিব মোটা মাইনে যে তাঁদের প্রলুব্ধ করে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তা মনে হয় না। যদি পারে তো সে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে, যাঁদের শিক্ষকতা-বৃত্তির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এমনি সুখসুবিধা আছে যে, একবার জীবনের মূল প্রয়োজনগুলো মিটলে অন্য চাকরির মোটা মাইনের লোভ অনেককেই টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভিজ্ঞতা থেকে এ-আশা করা যায়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও প্রাথমিক পারিশ্রমিকের অঙ্কটা যদি মোটা হয় বা অন্ততপক্ষে প্রশাসনিক কাজের পারিশ্রমিকের মতো হয় তো অনেক গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে টেনে আনা যাবে. ধরে রাখাও যাবে।

শিক্ষকদের পারিশ্রমিকবৃদ্ধি ছাড়া কতকগুলি বিশেষ উপায়েও শিক্ষাবৃত্তির মানসম্ভ্রম বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, যেমন, অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জন্যে জাতীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা। এই-সব পদের মাইনেও হবে মোটা। আর, এতে করে অনন্যসাধারণ গুণ ও সাধনা-সিদ্ধির হবে স্বীকৃতি। এ-সব পদের সংখ্যা যে বিশ্ববিদ্যালয়-হিসেবে বাঁধা থাকবে তা নয়, কারণ, আপন বিষয়ে অসাধারণ অধিকার না থাকলে কাউকে এইজাতীয় অধ্যাপক করা যাবে না। জাতীয় নির্বাচন কমিটির পরামর্শে এই-সব পদে অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে। একবার কোন ব্যক্তি এইরকম পদে নিযুক্ত হলে তিনি সারাজীবন এই পদে বহাল থাকবেন এবং যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করতে পারবেন। এমন হতে পারে যে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় অধ্যাপক হওয়ার মতো ব্যক্তি একজনের বেশি থাকবেন না, কোন-কোনটায় হয়তো একজনও থাকবেন না। তাহলেও এরকম পদ থাকার ফলে অনেক অধ্যাপকের মধ্যে সাধনা-

গবেষণা করার প্রেরণা আসবে এবং অধ্যাপনা-বৃত্তির সম্মান বাড়বে। এর একটা প্রত্যক্ষ ফললাভ হবে এই যে, এতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগ্য লোকদের ছেড়ে-যাওয়াটা বহুলাংশে বন্ধ হবে।

(গ) শিক্ষকদের বিশেষ স্বীকৃতি-সম্মানের আর-এক বিশেষ উপায় হচ্ছে—যে-সব শিক্ষক সমাজ-সঙ্ঘ-গঠনে দক্ষ, ছাত্রদের ওপর প্রভাব আছে যাঁদের, তাঁদের স্বীকৃতি-সম্মান দেয়া। এখনকার এই দুদিনেও এমন কোন কোন শিক্ষক আছেন যাঁরা ছাত্রদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও গুরু। অনেক শিক্ষকের যে শুধু ছাত্রদের ওপর প্রভাব আছে তা-ই নয়, আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা ছাত্রসমাজের ওপর। এইরকম শিক্ষকদের যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিলে শিক্ষকদের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক সুবিধা হবে। শিক্ষার্থীরা এখন যে-উদ্দেশ্যহীনতা, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা-বোধের দ্বারা পীড়িত তা থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেন এই শিক্ষকরা।

(ঘ) শিক্ষাবৃত্তিকে স্বীকৃতি-সম্মান দেবার অন্য একটি উপায় হচ্ছে—শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের শিক্ষাদানের বিশেষ ক্ষমতা আছে তাঁদের স্বীকৃতি দেয়া। অনেকেই স্মরণ করতে পারেন, এমন কোন-কোন অধ্যাপককে শিক্ষাজীবনে তাঁরা পেয়েছেন যাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণাশক্তি না থাকলেও যাঁরা চমৎকার পড়াতেন, পোড়োদের ভেতর যাঁরা অধ্যয়নের উৎসাহ সঞ্চার করতে পারতেন। অন্যের মনে উৎসাহ সঞ্চার করে-দেয়া শিক্ষাব্যাপারে এক অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। এ-জিনিস সব অধ্যাপকের থাকে না, বহু পাণ্ডিত্য-বৈদগ্ধ্য থাকা সত্ত্বেও না। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষার্থীদের মনে সমাজের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে তাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্ত করা তাহলে একথা অবধারিত যে, অধ্যাপনার কাজে খাঁটি গবেষকও যেমন থাকা দরকার, তেমনি দরকার খাঁটি শিক্ষকও। এখন মাঝে-মাঝে অধ্যাপকের যোগ্যতা-বিচারে অধ্যাপনা-ক্ষমতার চেয়ে গবেষণা-শক্তির বেশি মূল্য দেয়া হয়।

গবেষণা-বিষয়ের যে মূল্য নেই একথা কেউ-ই বলবেন না, কিন্তু, অধ্যাপকের অধ্যাপনার কৃতিত্বের মান নির্ধারণ করা কঠিন হলেও শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি এক্ষেত্রে প্রায়ই ঠিক বিচারের মানদণ্ড বলে মনে করা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে কখনও-কখনও অধ্যাপকরা শিক্ষার্থীদের গুণাগুণ বিচার যতখানি করতে পারেন শিক্ষার্থীরা অধ্যাপকদের সক্ষমতা-সামর্থ্যের বিচার তার চেয়ে ভালো করতে পারে।

(ঙ) অধ্যাপনা-বৃত্তির মান-উন্নয়নের জন্যে দেশ-বিদেশে বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগের দ্বারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে বৃত্তির ব্যবস্থা থাকলে অনেক যোগ্য তরুণ ব্যক্তি অধ্যাপনাকার্যে আকৃষ্ট হবেন; শুধু তা-ই নয়, তরুণ অধ্যাপকদের নির্বাচিত প্রতীচ্য দেশগুলির উন্নত শিক্ষাপরিবেশে থাকবার সুযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাপরিবেশ উন্নীত হওয়ার আনুকূল্য হবে। একথা মানতেই হবে যে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ অধ্যাপকেরই আর শিক্ষাব্রতিত্বের আদর্শ নেই। কোন-কোন পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে যথেষ্ট। সেখানকার কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কার্যে এমন-সব অধ্যাপক আছেন যাঁরা শিক্ষায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ; বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে বিদ্যার পরিমণ্ডল। এইরকম পরিবেশ আর অধ্যাপকদের সংস্পর্শ যদি তরুণ অধ্যাপকদের হয় তো এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সুফল ফলবে প্রচুর।

বিদেশের কোন নামজাদা অধ্যাপককে যদি অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্যে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে পারা যায় তাহলেও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে। লোকের মতো লোক হলে একজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। বিদেশী অধ্যাপক-নির্বাচন যদি ঠিক হয় তবে তাতে শিক্ষাদানের মানও উঁচু হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও যাবে বদ্‌লে। সবচেয়ে

ভালো ফল পাওয়া যাবে যদি একটা ছক করে তার একদিকে বিদেশ থেকে অধ্যাপক আনানো হয়, আর, অন্যদিকে তরুণ অধ্যাপকদের বিদেশে পাঠানো হয়; এর ফলে হবে কি, বিদেশী অধ্যাপকদের আরব্ধ কাজ বিদেশ-থেকে-ফেরা অধ্যাপকেরা চালিয়ে-যেতে পারবেন।

(চ) শিক্ষার সবস্তরেই পরিবেশ আর শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের উন্নয়ন যে খুবই দরকার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদাও না বাড়ালেই নয়। আর্থিক ও অন্যান্য কারণের জন্যে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনবৃদ্ধি করতে বেশ সময় নেবে। কিন্তু তাঁদের সামাজিক মর্যাদা-বৃদ্ধির বিশেষ উপায়-অবলম্বনে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না। সাধারণত, সরকারী বা বেসরকারী চাকরিতে মানুষের খাতির হতে দেখা যায় মোটা অঙ্কের রোজগারের জন্যে। অবশ্য, এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। ইংরেজ-শাসনকালে কোন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরির মাইনে প্রাদেশিক সরকারী চাকরির চেয়ে কম হলেও তার মান ছিল বেশি। এখনকার মন্ত্রীরা তো সরকারের উচ্চতম স্থায়ী কর্মচারীদের চেয়ে পারিশ্রমিক কম পান, কিন্তু তাতে তাঁদের সম্মানের হানি হয় না, ক্ষুণ্ণ হয় না সামাজিক মর্যাদা।

মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে অবশ্য রাজনীতির ক্ষমতার গৌরবে রক্ষিত হয় মর্যাদা। কিন্তু শিক্ষকদের বেলায়?—কতকগুলি বিশেষ উপায়ে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাচীনকালে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার তেমন-কোন সম্পর্ক ছিল না; এখন সেই ভাবধারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজে। প্রাচীন ভারতে পণ্ডিত বা গুরুরা দরিদ্র হলেও মর্যাদা পেতেন। এই হাল আমলেই আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক হয়েছে ঘনিষ্ঠ।

(ছ) শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির নানা উপায়ের মধ্যে

তুরস্কে অবলম্বিত যে-উপায়টি বেশ ফলদায়ী হয়েছে সেটি আমাদের এখানেও নেয়া যেতে পারে। তুরস্ক সরকার যখনই কোন বিধান নেবার সংকল্প করে তখনই সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বিধানটির সংগতি-অসংগতি বিচার করবার ভার তাঁদের ওপর ছেড়ে দেয়। সরকার অবশ্য তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না; তবে, এ-ব্যাপারে যে প্রথমে তাঁদেরই পরামর্শ নেয়া হয় তাতে অধ্যাপকদের মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে যায় বৈকি। এই রীতিটা যে শুধু শিক্ষানীতির দিক থেকেই ভালো তা-ই নয়, ভালো রাজনৈতিক দিক থেকেও। এতে বাস্তব সমস্যা-বিষয়ে অবধান রাখা এবং অভিজ্ঞতা পোক্ত করার সুযোগ হয় শিক্ষকদের। সাধারণত রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষ হওয়ায় পণ্ডিতজনেরা কোন সমস্যার বিচার করার দরুন সুবিধা হয় ঢের; কেননা, তাতে রাজনৈতিক দলাদলির চাপে পড়ে যে ভুলভ্রান্তি হয় তা হওয়ার ভয় থাকে না।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পারিশ্রমিক, বৃত্তি-বিষয়ক যোগ্যতা এবং সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে যে-কথা বলা হল সে-কথা আরও বেশি করে খাটে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। এঁদের মাইনে তো প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। যাঁরাই শিক্ষকজীবনের মানমর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছুক তারাই এঁদের সামাজিক পদমর্যাদার অবনমনে নিশ্চয় উদ্বিগ্ন। আর, তাঁদের বৃত্তিবিষয়ক যোগ্যতাও যে সাংঘাতিক নেমে গেছে তা-ও অস্বীকার করার নয়। এ-যোগ্যতা দিয়ে শিক্ষাকার্যের ন্যূনতম প্রয়োজন সাধিত হয় না বললেই হয়। এই-সব বাধাবন্ধের কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা এখানে বলা হল:

(ক) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির প্রয়োজন তো সবচেয়ে জরুরী বিষয়। কিন্তু, এই শিক্ষকদের সংখ্যা খুব বেশি বলে বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারটাও খুব কঠিন। কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা এখন ত্রিশহাজার, আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েব শিক্ষকদের সংখ্যা হচ্ছে আট-লাখ। এই শিক্ষকদের অল্পস্বল্প বেতনবৃদ্ধি করতে হলেও টাকা লাগবে প্রচুর। কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের কথা যদি সত্যিই ভাবতে হয় তো এর উপায় বার না করলে গতি নেই।

(খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের চেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সামাজিক মর্যাদার ব্যবস্থা করা বিশেষ করে দরকার। এখন দেশের যা আর্থিক অবস্থা তাতে এই শ্রেণীর শিক্ষকদের মাইনে যে তেমন বাড়ানো যাবে তা মনে হয় না। সুতরাং আর্থিক দিক থেকে তাঁদের মর্যাদাবৃদ্ধির সুবিধে কম। তাঁদের দাবি হচ্ছে প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার মতো মাইনে পাওয়া যাতে অভাবের তাড়নায় তাঁদের অবিরত উদ্বিগ্ন না থাকতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তাঁদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করলেই নয়। সম্প্রতি ভারতসরকার শিক্ষকদের মর্যাদাবৃদ্ধির এক উপায় অবলম্বন করেছে। তাতে খরচও বিশেষ কিছু হবে না। নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি-ভবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের অভ্যর্থনা জানানো হয়। ব্যয় তাতে যৎকিঞ্চিৎ হয়েছে, কিন্তু এতকাল গ্রামের লোকেরা যাঁদের কোন মূল্য দেয় নি তাঁরা অভ্যর্থিত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি-ভবনে—এই সংবাদে সাড়া পড়ে গেছে পল্লী-অঞ্চলে। এইরকম অভ্যর্থনা এবং অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মানিত করার ব্যবস্থা প্রত্যেক রাজ্যসরকারই করতে পারে। রাজ্যপাল এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যদি এই-সব অনুষ্ঠানে এবং যেখানেই পরিদর্শনে যান সেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করেন তবে তাতে জনসাধারণের চোখে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, শিক্ষকবৃত্তির মর্যাদা যে বেশ বাড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(গ) এই উদ্দেশ্যে আর-একটি আবশ্যকীয় উপায় হচ্ছে প্রধান-

শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়ানো। প্রধানশিক্ষকের ওপরই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও উন্নতি। ব্রিটিশ বিদ্যালয়গুলির সাফল্যের মূলে আছে প্রধানশিক্ষকদের যোগ্যতা ও সামাজিক সম্মান। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে ভারতে এমন-অনেক হেড্‌মাস্‌টার ছিলেন যাঁরা শুধু আপন-আপন প্রদেশেই নয়, প্রখ্যাত হয়েছিলেন সারা দেশ জুড়ে। আর আজকাল?—এমন হেডমাস্‌টারই খুব বিরল যাঁরা আপন প্রদেশেও খ্যাত হয়ে আছেন। তাই এখন আমাদের অন্যতম আশু কর্তব্য হচ্ছে প্রধানশিক্ষকদের সামাজিক মান ও স্থান উন্নত করা। তাঁদের শুধু ভালো বেতন দিলেই হবে না, দিতে হবে ক্ষমতাও, শিক্ষকদের নির্বাচন ও পদোন্নতি-বিষয়েও ক্ষমতা আসল কথা হচ্ছে, হেডমাস্‌টারকে বিদ্যালয়ের প্রধান ব্যক্তি-হিসেবে গণ্য করতে হবে, বিদ্যালয়ের উন্নতি-প্রগতির পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে তাঁকে। তাঁর ওপর বিদ্যালয়ের উন্নতির দায়িত্ব দিলে তিনিও তা পালন করতে প্রস্তুত হতে পারবেন।

জাপানে দেখেছি, মাধ্যমিক আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির হেড-মাস্‌টারদের বেতন প্রায় এক। তাঁদের বেতন সরকারী অফিসারদের বেতনেরই তুল্য। তুরস্কে দেখেছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন ২৫০৲ থেকে শুরু হয়ে ৫০০৲ পর্যন্ত বাড়ে, আর সেখানে সরকারের সেক্রেটারিরা পান ১,১০০৲ থেকে ১,৫০০৲ পর্যন্ত। তার মানে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের সঙ্গে উচ্চতম প্রশাসকের বেতনের অনুপাত হচ্ছে ১ঃ৩। ভারতে এই অনুপাত হল ১ঃ৮০।

(ঘ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষামানের উন্নয়নের বড়ো বাধা হল একঘেয়েমি ও বিরসতা। বছরের পর বছর একই বিষয় পড়াতে পড়াতে শিক্ষকদের আগ্রহ আসে কমে। শিক্ষাদানে আগ্রহ ও নিষ্ঠা যাতে না কমে, যাতে একঘেয়েমি না এসে যায় তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্যে শিক্ষকদের

শিক্ষণের কথাও বিশেষ স্মরণীয়, এর প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যায় না। সম্প্রতি ব্রিটেনে দেখা গেছে শিক্ষণের ফলে কত অযোগ্য শিক্ষকও যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শিক্ষকতা-গুণের উৎকর্ষের জন্যে তাই আমাদের দেশেও শিক্ষকদের শিক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা দরকার। এর একটা উপায় হচ্ছে সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষাশিবির ও আলোচনা-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করা। ভারতসরকারের প্রচেষ্টায় ১৫টি রাজ্যের ৫০জন হেডমাস্টারকে নিয়ে ১৯৫৩ সালে এক আলোচনা-সম্মেলন হয়েছিল। এতে ২০,০ ০ টাকাও খরচ হয় নি, কিন্তু এতেই দেশ জুড়ে হেডমাস্টারদের আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্ব-বোধের উদ্‌বোধনে যথেষ্ট সাহায্য হয়েছিল। এর ফলে সারা ভারতে প্রধানশিক্ষকদের এক পরিষদ সর্বপ্রথম গড়ে উঠতে পেরেছিল। প্রধানশিক্ষকদের এইরকম শিক্ষাশিবির ও আলোচনা-সম্মেলন চালিয়ে যাওয়ারই কথা হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এইজাতীয় সম্মেলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে করা হবে বলে স্থির হয় ফোর্ড ফাউনডেশন থেকে পাওয়া অর্থের সাহায্যে।

এক-একটা রাজ্যে হেডমাস্টারদের অনুরূপ শিক্ষাশিবির ও আলোচনা-সম্মেলন করতে খরচা হবে আরও অনেক কম। তাই বছরে এমন দু'টো করে সম্মেলনের ব্যবস্থা করা রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব হবে না। এতে প্রায় একশো করে হেডমাস্টার প্রতি বছর সুযোগ পেতে পারবেন। ফলে কয়েক বছরের ভেতর দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মান হবে উন্নত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারদের এবং অন্যান্য শিক্ষককে নিয়েও অনুরূপ সম্মেলন-শিবিরের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

(ঙ) মাঝে-মাঝে এইরকম শিক্ষণ ও শিক্ষা-সঞ্জীবনের ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জীবনের একঘেয়েমি ও বিরসতা কেটে যাওয়ার উপায় হবে। তাছাড়া, তাঁদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য-সুস্থতার জন্যে অবকাশ-কালীন প্রবাস-স্থিতি এবং স্বাস্থ্যনিবাসেরও বন্দোবস্ত

করতে হবে। অর্থের অভাবে অধিকাংশ শিক্ষকই ছুটি উপভোগ করতে পান না। অথচ, এই অবকাশ-বিনোদন তাঁদেরই দরকার সবচেয়ে বেশি। সারা বছর ধরে পাঠনকক্ষে একঘেয়ে পাঠ্যবিষয় পড়িয়ে-পড়িয়ে তাঁদের উদ্যম ও জীবনীশক্তি যায় ক্ষয়ে। সেইজন্যেই তার মাঝে-মাঝে বিরাম-বিরতি ও অবকাশ-বিনোদনের সাহায্যে ক্ষয়িত শক্তির পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা না থাকলে তাঁদের কাজ প্রাণহীন ও গতানুগতিক হতে বাধ্য; এতে শিক্ষার্থীদের জীবনের সুদূর-প্রসারী বিনষ্টি না হয়ে পারে না। দেশের ভবিষ্যতের কথা যদি ভাবতে হয় তো শিক্ষকদের জীবনের এই একঘেয়েমি ও বিরসতা নির্বাসনের ব্যবস্থা তাই করতেই হবে। মোটামুটি রকমে স্বাস্থ্য-নিবাস ও অবকাশ-বিনোদনের ব্যবস্থা করলেও লক্ষণীয় ফল পাওয়া যাবে। তাতে শিক্ষকরা বুঝতে পারবেন যে, সমাজ তাঁদের কল্যাণ-বিষয়ে অবহিত হয়েছে। তার ফলে শিক্ষাকাজের উন্নয়ন হবেই হবে।

(চ) বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপক সমিতিগুলিও এমন ভাবে গঠিত হওয়া দরকার যাতে দলাদলি একেবারে না থাকে, বা অন্ততপক্ষে, যতদূর-সম্ভব কম হয়। নির্বাচনদ্বন্দ্ব আর দলীয় মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবকে করে কলুষিত, তার নিয়মনীতি-পালনকে করে শিথিল, আর, বিদ্যালয়গুলিতে তার প্রভাব হয় আরও মারাত্মক। এমন কতকগুলো বিদ্যালয় আছে যেখানকার ব্যবস্থাপক সমিতির সেক্রেটারিরা হচ্ছেন এক-একটা খুদে লাট-গোছের; শিক্ষক ও প্রধানশিক্ষকদের ওপর তাঁদের দাপট দেখে কে! বিদ্যালয়-কমিটির ইলেক্‌শন বা নির্বাচন নিয়ে যদি বিদ্যালয়ের দুরবস্থা হয় তো তার সুব্যবস্থা করতে হবে। ইলেক্‌শন বাদ দেয়া যদি সম্ভব না হয় তো ব্যবস্থাপক সমিতির গঠনে, সদস্য-নির্বাচনে এক নতুন রীতি অবলম্বন করতে হবে। সমিতিকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিক মত-নিরপেক্ষ করতে হবে। সমিতির

একজন করে সদস্য বছরে নির্বাচিত হবেন; তার পর কয়েক বছর ধরে থাকার পর একে-একে সরে যাবেন সদস্যরা।—এইভাবে বিদ্যালয়-কমিটির সদস্য-নির্বাচন হলে সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতা-লোভ ও কুচক্রিতা আসতে পাবে না। নিউ ইয়র্কের উচ্চতম শিক্ষাপরিষদ্দ এই ধারার রীতি অবলম্বিত হয়। পরিষদটির নাম পরিচালক পরিষদ (বোর্ড্ অব্ রিজেন্ট্স্)। এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করে রাজ্য-বিধানপরিষদ। তা সত্ত্বেও এই পারষদ রাজনৈতিক দলাদলি থেকে থাকে মুক্ত। তার কারণ, পরিষদে তেরোজন সদস্য থাকেন, প্রতি বছর একজন করে সদস্য নির্বাচিত হন, আর তেরো বছর ধরে সদস্য থাকতে পাবেন। সেখানে রাজ্যের গভর্নরের স্থিতিকাল হচ্ছে চারবছর, আর বিধানপরিষদের সভ্যদের স্থিতিকাল মাত্র দু'বছর, তাই, সেখানে ব্যক্তির ওপর দলের প্রভাব দু'-এক বছরের পর আর তেমন থাকে না।

(ছ) শিক্ষকদের প্রাইভেট টুইশনের জন্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষতি হয় খুব। এই ক্ষতির পথ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু গৃহ-শিক্ষকতা বন্ধ করতে হলে শিক্ষকদের যথেষ্ট মাইনে দিতে হবে। নিয়ম তো এখনও আছে যে, হেডমাস্টারের অনুমতি ছাড়া কোন শিক্ষক গৃহ-শিক্ষকতা করতে পাবেন না। আর, করলেও ক'টা টুইশন করতে পাবেন তারও নিয়ম আছে। তবে এ-সব নিয়ম নামেই আছে, কেউ-ই বড়ো-একটা মানেন না। শিক্ষকদের যুক্তি এই যে, শিক্ষা দেওয়ার আগে বাঁচাটা একান্ত দরকার, আর, ইস্কুলে তাঁরা যে মাইনে পান তাতে তাঁদের নিজেদের বা সংসারের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটে না; তাই, বাধ্য হয়ে তাঁদের টুইশন করতে হয়, শখ করে নয়। শিক্ষকদের বেতনহার বৃদ্ধি করতে পারলে টুইশন-সম্বন্ধে নিয়মগুলো ঠিকমতো জারি করা যেতে পারবে। যতদিন তা না পারা যাচ্ছে ততদিন বিদ্যালয়কে জানিয়ে এবং বিদ্যালয়ে তা করার ব্যবস্থা করতে হবে। ইস্কুলের প্রধান-

শিক্ষকমহাশয় বিভিন্ন বিষয়ে কাঁচা পোড়োদের বিশেষ পাঠানার ব্যবস্থা করবেন। বাছাই-করে-নেয়া শিক্ষকরা তাঁর নির্দেশে কাজ করবেন। এ থেকে যে টাকা উঠবে তা সব শিক্ষকের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, অবশ্য, যাঁরা পড়াবেন তাঁরা ভাগ বেশি পাবেন। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, হেডমাস্টার যেন শিক্ষক-নির্বাচন-বিষয়ে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না করেন। এই ভাবেই এখনকার যত-ইচ্ছা টুইশন করার রেওয়াজ কমে আসবে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে শিক্ষকরা ইস্কুলে শিক্ষাদানের কাজে সমস্ত মন ও উদ্যম নিয়োগ করতে পারবেন। অন্য কোন পরিবর্তন এখন যদি না-ও হয়, শুধু এই পরিবর্তন হলেও ভারতে বিদ্যালয়ী শিক্ষায় হবে অভূতপূর্ব উন্নতি।

॥ আ ॥ পোড়োদের অর্থনীতিক দুর্দশা-নিরাকরণের উপায় ॥

সারা সমাজের অর্থনীতিক দুরবস্থা থেকে পোড়োদের অর্থনীতিক দুরবস্থা আলাদা করে নিয়ে তার সমাধান করা যায় না। সে-দুরবস্থা রাতারাতিও নিবারণ করা সম্ভব নয়। সারা সমাজের অর্থনীতিক অবস্থা ভালো করতে না পারা পর্যন্ত পোড়োদের অর্থনীতিক অবস্থা উন্নত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে এই দুরবস্থাকে যেমন আছে তেমনি থাকতে দিলে চলবে না। ওরই মধ্যে যতখানি সম্ভব শিক্ষার্থীদের অর্থনীতিক দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। তাদের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করার জন্যে সাধারণ অর্থভাণ্ডার থেকে সাহায্য দরকার করবে, তবে সে-টাকার অঙ্ক যে খুব বেশি কিছু হতে হবে তা নয়। এর জন্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি নেয়া যেতে পারে:

(ক) যে-সব বুদ্ধিমান পোড়ো অর্থনীতিক দারিদ্র্যের চাপে অসুবিধাগ্রস্ত তাদের সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এই সমস্যা অবশ্য না-থাকা নয়, তবে, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের স্তরে এ-সমস্যা আরও তীব্র রূপ ধরে থাকে। ইস্কুল-কলেজে এখন অবধি মাত্র শতকরা ১৫ থেকে ২০জন ছাত্রের বৃত্তি, অর্থসাহায্য বা কন্‌সেসনের ব্যবস্থা আছে। গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশে বৃত্তি ও অন্যান্য অর্থসাহায্য-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি। অক্‌স্‌ফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৮০জনের ওপর ছাত্র কোন-না-কোন-রকম অর্থসাহায্য পায়। আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা এখনও ওরকম অর্থসাহায্য দেবার মতো হয় নি, তবে এখনকার চেয়ে বৃত্তি বা অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা যে আরও করা উচিত ও সম্ভব তা মনে রাখতে হবে। আমাদের অর্থসামর্থ্য কম বলে আর কোন্ উপায়ে পোড়োদের অর্থসাহায্য দেয়া যেতে পারে তার কথা ভাবতে হবে। একটা উপায় হচ্ছে পোড়োদের শ্রমকে ইস্কুল-কলেজের কাজে আরও বেশি করে লাগানো। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এর উল্লেখ্য নিদর্শন আছে। সেখানে বহু শিক্ষার্থী ইস্কুল-কলেজের ঘণ্টা-দেয়া, ফাই-ফরমাস-খাটা, সংবাদপত্র সরবরাহ করার কাজ করে থাকে; কেউ-কেউ গ্রন্থাগারিকের সহকারী বা অন্যান্য কর্মী-রূপেও কাজ করে। ইস্কুল-কলেজের সুখসুবিধা-বাড়ানোর কাজেও তাদের লাগানো যেতে পারে। এই-সব সুখসুবিধার কথা পরে বলা হচ্ছে।

(খ) পোড়োদের আর্থিক অসুবিধা দূর করার আনুকূল্য করাই শিক্ষানিকেতনগুলির পক্ষে যথেষ্ট নয়, দেখতে হবে যাতে তারা সুবিধা-সুযোগ নিতে পারে। এখন বহু পোড়োই লক্ষ্যহীন ভাবে লেখাপড়া করে চলে; শিক্ষার সুপরিকল্পনা দ্বারা এই লক্ষ্যহীনতা ঘোচাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার তো একটা মৌলিক অধিকার ঠিকই, কিন্তু, শুধু তাতেই তুষ্ট থাকলে চলবে না; এখন আমাদের শিক্ষার যে অবস্থা তাতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পরের শিক্ষাও অধিকারের বিষয় হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর বেশ ভালোরকম, আর, মাধ্যমিক শিক্ষার পর তো

আরও কড়া বাছ-বিচার হওয়া দরকার। তারপর যে-সব পোড়োর বিশেষ ক্ষমতা বা প্রবণতা আছে বলে বিবেচিত হবে শুধু তারাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী হবে। এই বাছাই-এর কাজ করবেন প্রধানত শিক্ষকেরা। তাঁরা এ-কাজ করবেন পোড়ো আর অভিভাবকদের নির্দেশ-পরামর্শ দেবার জন্যে।

এখন একটা রেওয়াজ হয়েছে পোড়োদের নির্দেশ-পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানীদের সাহায নেয়া। অবস্থাপন্ন দেশেও এরকম বিলাস বাঞ্ছনীয় কিনা সন্দেহ। পোড়োকে আধ ঘণ্টাখানেক দু'-একবার দেখে তার প্রবৃত্তি-প্রবণতা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা অসম্ভব। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার্থীদের এক-এক করে দেখে পন্থা নির্দেশ করা সবচেয়ে ধনী দেশের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আর, ভারতের পক্ষে তো অসাধ্যই বলা চলে।

একথা অবশ্য বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, পোড়োদের পরিচালনার জন্যে কোন উপদেশ-নির্দেশের প্রয়োজন নেই। যে-সব শিক্ষক শিশুকে সারা বছর বা কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত দেখবার সুযোগ পান তাঁরা হয়তো তার প্রবৃত্তি-প্রবণতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। আসলে, পোড়োদের সঙ্গে শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থাকা দরকার। একথা বলাই বাহুল্য যে, এ-বিষয়ের পরিকল্পনা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ছাড়া সফল হতে পারে না। শিক্ষকরা যদি শিক্ষার্থীদের জীবন-গঠনে যথার্থ মনোযোগী হন তবে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পোড়োদের জীবনের লক্ষ্য-নির্ণায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। এর জন্যে অবশ্য দরকার হবে একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার; সে-ব্যবস্থা হচ্ছে এক-একদল পোড়োর পরিচালক-অভিভাবক-হিসেবে এক-একজন শিক্ষককে ভার দেয়া। আবাসিক বিদ্যালয়েই এটা সম্ভব। প্রচলিত পরিবেশে হয়তো এরকম ব্যবস্থা কখনও-কখনও হীনমনা শিক্ষকদের ক্ষমতামত্ত করে তুলতে পারে; তাতে তাঁদের কেউ-কেউ

নিপীড়ক হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা থাকলে সে-নিপীড়ন বা ক্ষমতার অপব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হতে পারবে না।

শিক্ষকরা যদি দূরদৃষ্টি ও জ্ঞান নিয়ে নিজেদের কাজ করে যান তবে এ-রকম ব্যবস্থায় দু'টো উপকার হবে: এক, শিক্ষকদের নেতৃত্বের উন্নতি হবে; দুই, পোড়োদের যথাসময়ে বৃত্তিনির্বাচন ও পন্থা-অবলম্বন হতে পারবে; কোন পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে সকলকেই কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঢুকতে হবে না। এতে উচ্চতর শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও কমবে, অযোগ্যদের উচ্চতর শিক্ষা-নেয়ার অপচয় ও ব্যর্থতা ঘটবার কারণও থাকবে না।

(গ) শিক্ষার্থীদের আর্থিক দৈন্য যে চট করে দূর করে ফেলা যাবে তা নয়। এ-ও সম্ভব নয় যে, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপদেশ-নির্দেশ, পরিচালনা-পরামর্শ সকল পোড়োকে যোগ্যতা-সম্মত পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে। সুতরাং ইস্কুল-কলেজে সুখ-সুবিধা, আমোদ-আনন্দ বাড়ানোর আশু ব্যবস্থা করতে হবে।

এই পরিকল্পনায় প্রথমেই ধরতে হবে স্বাবলম্বন-আত্মনির্ভরের কথা। যতদূর সম্ভব থিয়েটার, বাগান, স্টেডিঅম, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়ভবন তৈরি বা তার উৎকর্ষ-সাধন-ব্যাপারে শিক্ষকদের পরিচালনায় পোড়োরা অংশ গ্রহণ করবে। এটা যে অসম্ভব ব্যাপার তা বলা চলে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসেবা-প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকেই তা বোঝা যায়। বিশেষ-কোন প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে করা বিবেচনার কাজ নয়, কারণ, বহু সমাজ, সংসদ, সংস্থা বহু বিদ্যালয়-ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে শুধু ছাত্রদের শ্রমের সাহায্যে।

শিক্ষকদের পরিচালনায় পোড়োদের দিয়ে কাজ করিয়ে বিদ্যালয়ের আমোদ-আনন্দ ও সুখসুবিধার উৎকর্ষসাধন করলে অনেক উপকার হবে। এতে গরীব পোড়োদের অন্তত আংশিক দৈন্য ঘুচবে।

শিক্ষানিকেতনের বাহ্য পরিবেশও হবে ভালো ; আগেই বলা হয়েছে, এই ভালো পরিবেশের অভাবই পোড়োদের বিরক্তি ও মানসিক বিকৃতির অন্যতম কারণ। বিদ্যালয়কে যদি সমাজ-জীবনের কেন্দ্র-স্বরূপ হতে হয় তবে বিদ্যালয়ে খেলার-মাঠ, বাগান, সভাকক্ষ, বিরামভবন, লাইব্রেরি, পাঠপ্রকোষ্ঠ প্রভৃতি একান্ত দরকার। এইগুলির সাহায্যে শিক্ষকরা পোড়োদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান, তাদের তরুণ শক্তিকে সার্থক-শুভদ কাজে ব্যাপৃত করতে পারেন।

এইরকম স্বাবলম্বনের কাজ ছাড়া ইস্কুল-কলেজে এমন কাজ-কর্মের প্রবর্তন করা যেতে পারে যাতে পোড়োদের শ্রমকে নিযুক্ত করা যায় এবং যার ফলে সমাজের সম্পদ উৎপাদিত হতে পারে। নৈশ বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাধারণের জন্যে উদ্যান, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি নির্মাণের সামাজিক কাজের কথা সহজেই মনে আসে এই প্রসঙ্গে।

অল্প বা বিনাপয়সায় পোড়োদের টিফিন দেবার ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্কুলে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা পোড়োদের সামাজিক সুস্থতা-শান্ততা বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি আনুকূল্য করেছে। নামমাত্র কিছু মূল্য অবশ্য নেয়া যেতে পারে, তবে খুব গরিব পোড়োদের জন্যে বিনাপয়সায় ব্যবস্থাও রাখা দরকার। সম্ভবমতো ক্ষেত্রে বিনাপয়সায় মধ্যাহ্ন-ভোজন-সরবরাহের কাজেও পোড়োরা লাগতে পারে। বুনিয়াদি-শিক্ষাব্যবস্থায় ইস্কুল-ভাণ্ডারে পোড়োদের কিছু-কিছু করে যোগান দেবার সুযোগ থাকে। এই অর্থ তাদের খাদ্য দেবার কাজে ব্যয় করার মতো আর ভালো কাজ হয় না। তাদের খাদ্য দেবার পর যদি এই অর্থভাণ্ডারের কিছু বাড়তি থাকে তবে তা ইস্কুলের পরিধেয় দেবার কাজে লাগানো যেতে পারে।

॥ ই ॥ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ সংশোধন ॥

একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রচলিত শিক্ষাধারার ও ব্যবস্থার ব্যাপক পুনর্গঠন হতে সময় নেবে। তাছাড়া, সে-রকম পুনর্গঠনের কাজ তো বরাবর চলতেই থাকবে, কেননা, শিক্ষার মতো সজীব প্রচেষ্টার রদ-বদলের শেষ হয় না। এই আলোচনার আগের দিকে আমরা আমাদের বর্তমান শিক্ষার যে-সব দোষত্রুটির কথা বিচার-বিশ্লেষণ করেছি সেগুলির কয়েকটির আশু সংশোধন করা দরকার। সে-বিষয়গুলির উল্লেখ এখানে করা গেল:

(ক) কিশোর বয়সের পোড়োদের বিভিন্ন প্রকৃতি-প্রবৃত্তি-অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিভিন্ন রুচিপ্রকৃতির উপযোগী করে গড়ে-তোলার নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটি একধারার হতে পারে, কেননা, এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হল কতকগুলো মূলজ্ঞান দেওয়া এবং শিশুদের কতকগুলো রীতিনীতি ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে-তোলা। কৈশোরে ছেলেমেয়েদের রুচি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য গড়ে-উঠতে থাকে। সেইজন্যে এই বয়সের শিক্ষায় বৈচিত্র্য থাকা খুব দরকার। বর্তমান বিদ্যালয়গুলোকে রূপান্তরিত করে এবং নতুন করে বহুবিদ্যার শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা আছে। এটা স্বাভাবিক যে, এইরকম বিচিত্রবৃত্তির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বহু শিক্ষার্থী গতানুগতিক ভাবে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করা থেকে বিরত হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে চাপ অনেক কমে যাবে। আর, এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষম ও কর্মযোগ্য করে-তুলে শিক্ষাশেষে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচাবে তাদের।

শিক্ষাবিষয়ক এইরকম পরিবর্তন-সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শারীরিক নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা চাই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জাতীয় সমরশিক্ষার্থী-বাহিনীতে (ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর-এ) ঢোকা দরকার। এটা যে শুধু সামরিক শিক্ষার

জন্যে তা নয়, তার চেয়ে বেশি তাদের নিয়মানুগত্য, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বিকশিত ও তাতে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় হবে। সকল শিক্ষার্থীরই সমরশিক্ষার্থী-বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এখন অবশ্য তা সম্ভব নয়, কারণ, তাতে সরকারের ব্যয় হবে কিছু। তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে অন্তত একবছরের জন্যেও ক্যাডেট হতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চয় করা দরকার।

জাতীয় সমরশিক্ষার্থী-বাহিনীতে খরচ বেশি বলে কম খরচায় যাতে সাদাসিধে ধরনের একরকমের শারীরিক এবং নিয়মানুগত্যের শিক্ষা সব শক্ত-সমর্থ শিক্ষার্থীকে দেয়া যায় তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্যাডেট কোর-এ শিক্ষিত ব্যক্তিরা নতুনদের শেখাবার ভার নিতে পারে। তাতে শিক্ষিত ক্যাডেটরা নেতৃত্ব করারও সুযোগ পাবে, আবার খরচও কমবে। যে-সব পোড়ো এর সুযোগ নিতে চাইবে তাদের সবার জন্যে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া, বিকলাঙ্গ না হলে প্রত্যেক পোড়োরই নানাবিধ শারীরিক সামর্থ্যের পরীক্ষায় একটা ন্যূনতম মান রক্ষা করার নিয়ম করা যেতে পারে। শিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ভালো শরীর-গঠনের আবশ্যকতা নির্ধারিত করলে তাদের নিয়মবর্তিতাও বাড়বে, শারীরিক স্ফূর্তিও হবে।

স্কাউট বা গাইড-দলে ভর্তি হলে ইস্‌কুলের পোড়োদের বেশ উপকার হবে। তাতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে ; ছেলে-মেয়েদের প্রচুর প্রাণশক্তির সুস্থ-স্বকৃত প্রকাশের পথ হবে। তারা আত্মনির্ভরশীল ও প্রচেষ্টাশীল হতে শিখবে। তাদের মন সমাজ-সেবার আদর্শে ভাবিত হবে। এই-সব কাজে পোড়োদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না করে, এর সুযোগ এমনই বাড়াতে হবে যে, কারো ইচ্ছে হলে তাতে যোগ দিতে যেন কোন বাধা না থাকে ; এর কাজ এমনই চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে যে, সব পোড়োই যেন এতে আকর্ষণ বোধ করে।

(খ) শিক্ষাধারার সংস্কারে বিষয়-বৈচিত্র্য তো আনতেই হবে, এর সঙ্গে ঢেলে সাজতে হবে পরীক্ষা-ব্যবস্থাটি। এখনকার পরীক্ষা-ব্যবস্থায় অতিরিক্ত জোর দেয়া হয় অন্ত্য পরীক্ষার ওপর। এতে কিশোর পোড়োদের শক্তি সারা বছর প্রায় অব্যাপৃত থেকে সেই পরীক্ষার সময় নিযুক্ত হয়। সারা বছর ধরে পোড়োরা যদি ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে যেতে বাধ্য হয় তবে তাদের মন অন্যদিকে বড়ো-একটা বিক্ষিপ্ত হতে পারবে না। তার ফলে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অ-নিয়মবর্তিতা অনেকখানি কমে যাবে। একনাগাড়ে কিছু-কিছু করে কাজ করে-যাবার অভ্যাসও তাদের হবে। এইরকম অভ্যাস-গঠন তো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। সারা বছরের কাজের হিসেব পরীক্ষা-উত্তরণের ব্যাপারে গণ্য হবে অন্ত্য পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে। এতে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের জীবনে আসবে এক নতুন নিয়মচেতনা।

(গ) আমাদের শিক্ষাধারার পরিবর্তনে ইস্কুল-কলেজের পাঠন-কক্ষে পাঠনের রীতিরও কিছু-কিছু অদলবদল করতে হবে। সাধারণত পাঠনকক্ষে শিক্ষক-অধ্যাপকরা লেকচারই দিয়ে যান; পোড়োরা সে-জিনিস নিচ্ছে কি নিচ্ছে না তা বড়ো-একটা দেখাই হয় না। তাই, তাদের মন সহজেই হয় আনমনা, বিশেষ করে শিক্ষক যদি হন অপটু বা বিষয়টা হয় বিরস। আর, এই বিরসতা এলে বিমুখতা আসতে দেরি হয় না। এরই ফলে ক্লাসে শৃঙ্খলা-শান্তি থাকে না। শুধু তা-ই নয়, দেখতে-দেখতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে তো পোড়োদের মন-বসানো কাজে ব্যাপৃত করতে হবে। বড়ো-বড়ো পোড়োর জন্যে টিউটোরিএল ও আলোচনা-অনুশীলনের ব্যবস্থা করলে ফল হবে। পোড়োদের যেখানে পাঠনকক্ষের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয় সেখানে কাজের নিয়মে তাদের নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে চরিত্র-বিকাশ হয়। তারা হয়ে-ওঠে বিদ্যালয়-সমাজের শ্লাঘ্য সভ্য।

এখনকার প্রচলিত শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীদের কাজের চেয়ে শিক্ষকদের কাজ বেশি। শিক্ষকদের কাজের এই চাপ কমে গেলে তাঁরা পোড়োদের কাজের তদারক করতে পারেন। অনুশীলন-আলোচনার ভালো ব্যবস্থা করতে হলে শিক্ষকের সংখ্যা বেশ বাড়াতে হবে। উপস্থিত অর্থনীতিক অবস্থায় তা সম্ভব হবে না হয়তো। এই অসুবিধা দূর করার উপায় আছে দু'টিঃ এক, লেকচারের জন্যে নির্ধারিত ঘণ্টা দিতে হবে কমিয়ে; সেই সময়টা লাগাতে হবে পোড়োদের কাজের তদারকে। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের দিয়ে কনিষ্ঠদের কোন-কোন কাজের তদারক করানো।

এই উপায়দু'টি সংগত ভাবে অবলম্বিত হলে ক্লাসের ছাত্রসংখ্যাও কমে যাবে; তার ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারবে ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার্থীদের উদ্যম-উদ্যোগ ও শিক্ষা-প্রচেষ্টা উদ্দীপ্ত হওয়ার সুযোগে শিক্ষার মানও হতে পারবে উন্নত। তাছাড়া, শিক্ষকরাও পোড়োদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারবেন। শিক্ষক-অধ্যাপকদের লেকচারের জায়গায় পোড়োদের সাক্ষাৎ প্রচেষ্টার ওপর জোর পড়লে এখনকার শিক্ষাধারার একটা মস্ত বড়ো দোষ হবে অপসারিত।

(ঘ) এক নীচু স্তব ছাড়া, কাজের ব্যাপারে ডিগ্রী-ডিপ্‌লোমার বেশি মূল্য দেয়াও ছাড়তে হবে। গ্রেট ব্রিটেন-এ দেখা গেছে যে, ডিগ্রীর ওপর বেশি নির্ভর না করায় সরকারী কাজের জন্যে যথেষ্টসংখ্যক লোক পাওয়া গেছে। এই ডিগ্রীর ওপর বেশি নির্ভর না করায় যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও সরকারী কাজের পক্ষে উপকারই হয়েছে। এই রীতি অবলম্বন করলে ভারতেও ঐ-ফল পাওয়া যেতে পারে।

ডিগ্রী-নির্ভরতার রীতি উঠিয়ে দিলে শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তিতা এবং সারারণ আবহাওয়ারও উন্নতি হবে আর-এক দিক থেকে। গ্রেট-

ব্রিটেন-এ বিভিন্ন চাকরির বেশির ভাগ দেয়া হয় বয়স-হিসেবে। সেখানে বেশির ভাগ তরুণ ১৯ বছর বয়সের ভেতর বিভিন্ন কাজে ঢুকে যেতে পায়। তারপর কাজে লেগে গিয়ে বিশেষ-বিশেষ কাজের শিক্ষা নিয়ে নেয়। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাকী থাকে অল্পসংখ্যক পোড়ো। ভারতে অনুরূপ রীতি প্রবর্তিত হলে যে-সব পোড়ো অযোগ্য হয়েও অনর্থক উচ্চতর শিক্ষা নেয়ার জন্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারা তা হবে না। কাজেকাজেই সেখানে ভিড় কমে যাবে।

(ও) বিদ্যালয়ের পরিবেশে অধিকতর গণতন্ত্রী রীতির প্রবর্তন হওয়া দরকার। পোড়োরা তাতে যেন আরও বেশি অধিকার ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। শিক্ষার্থীরা কেন অবাধ্য হয়ে ওঠে?—তারা যদি আপন সীমানায় স্বাধীনতা-স্বাচ্ছন্দ্য না পায় তবে ছাড়া পেলেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। যেখানে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় সেখানে তাদের বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা অত দেখা যায় না। সহজ অথচ সুস্থ আত্মপ্রকাশ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হলেই অসামাজিক ও সমাজ-বিরোধী পথ নেয় তরুণচিত্ত। দায়িত্ববোধ থেকে জাগে নিয়মানুগত্য, আর, দায়িত্ব-বোধ জাগে দায়িত্ব দিলে।

কথা হচ্ছে, কী উপায়ে পোড়োদের স্বশাসন বা স্বাধীনতা দেয়া যায়।—বিদ্যালয়ের বেষ্টনীর ভেতর আলাদা-আলাদা কতকগুলি ভবন থাকবে। এক-একটি ভবনে আবার থাকবে কতকগুলি করে ক্লাস। প্রত্যেক ক্লাসের কুড়ি-পঁচিশজন করে পোড়ো থাকবে এক-একজন শিক্ষকের পরিচালনায়। এই শিক্ষকদের সাহায্য করবার জন্যে থাকবে এক-একজন মনিটার। মনিটার-নির্বাচনে পড়াশোনার চেয়ে ব্যক্তিত্ব-চরিত্রই প্রধান গুণ বলে বিবেচ্য হবে। পাঠকক্ষের শৃঙ্খলা-রক্ষায় মনিটারদের যথেষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে। পরিবেশের প্রয়োজন-অনুযায়ী এই রীতির একটু-আধটু অদল-বদল করে নেয়া যেতে

পারে। সব ক্লাসের মনিটারদের নিয়ে সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্যে একটি মনিটার-সংসদ থাকবে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার জন্যে দায়ী থাকবে এই সংসদ। হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপ্যাল মনিটারদের আপন-আপন শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে এবং তাদের সংসদকে যৌথ নেতৃত্ব বলে স্বীকার করবেন। এই রীতির অল্পস্বল্প অদল-বদল করে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবর্তন করা যেতে পারে। তাতে কাজ আরও ভালোই হতে পারে।

মনিটার-সংসদের একটি বিচার-বিভাগও থাকতে পারে। এটি হবে তাদের সম্মানের জিনিস। সম্মান পেলে পোড়োদের দায়িত্ব-বোধ ও নিয়মানুগত্য বাড়বে। সম্মান দিলে যে পোড়োরা উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুঃশীলতা পরিহার করে তা প্রায় সকলেই জানেন। নীচু ক্লাস থেকে শুরু করে উচ্চতম ক্লাস অবধি এই সম্মান-দানের ব্যবস্থা ব্যাপকতর করা উচিত।

পোড়োদের যে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ থাকা দরকার তার আর-একটা কারণ আছে। পরখ আর ভুল করতে-করতেই মানুষ জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকারী বিষয়গুলো শেখে। পোড়োদের জীবনে পরখ আর ভুল করার অনর্থ এমন-কিছু সাংঘাতিক হবে না।

এই-সব অনর্থ পরে হলেই সমাজের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। তাই এগুলো এই সময়ে হয়ে-যাওয়াই ভালো। নিজেদের ক্ষেত্রে বিষয়-পরিচালনার ভার যদি পোড়োরা পায় তো তাতে মুক্তিসংগ্রাম-কালে নষ্ট-হওয়া নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হবে তিনটি উপায়ে: এক, এতে তাদের কাজে নিযুক্ত রাখা হবে, প্রাণশক্তি থাকবে ব্যাপৃত; দুই, এতে তারা নাগরিকতা এবং স্বশাসনের রীতিনীতি শিখবে, ফলে তারা ভাবী জীবনের জন্যে হতে পারবে তৈরী; আর, তিন, সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই যে, নিজেদের নেয়া দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে তারা পাবে আত্মোপলব্ধির আনন্দ।

॥ ঈ॰॥ শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার উপায় ॥

আগেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও অনিয়মবর্তিতা হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীর ব্যাপক বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলারই একটা অংশ। সারা মানব-সমাজেরই মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে বলে পোড়োদেরও আদর্শ হয়েছে ভ্রষ্ট। তারা তো সমাজেরই এক অংশ, শুধু অংশ নয়, ভাবগ্রাহী অংশ। মূল সমাজের চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গেলে তাদের কাছে দৃঢ় মূল্যবোধ আশা করা যায় না। এ থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিক্ষা হচ্ছে এক সামাজিক প্রচেষ্টা: সমাজের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে তার উন্নতি-অবনতি বাঁধা। পোড়োদের মূল্যবোধ যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে যে-সমাজে তারা বাস করছে তাতে যাতে যথার্থ কল্যাণ-বোধ জাগে ও থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তো পোড়োরা সে-আদর্শ নেয়ায় বা অনুসরণ করায় ব্রতী হতে পারবে। সুতরাং, এখন প্রশ্নটা হচ্ছে সমাজে যথার্থ মূল্যবোধ জাগিয়ে-তোলার।

একথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষকদের সামাজিক স্থান নেমে-গেলে শৈশব থেকেই মূল্যবোধ হয় খণ্ডিত। তরুণদের মূল্যবোধ নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই। শিক্ষকদের অবস্থা যেমনটা হওয়া উচিত বাস্তবে দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত। এই যে আদর্শ ও বাস্তবের অসংগতি এতে পোড়োদের মনের প্রত্যয় ক্ষয়-প্রাপ্ত হতে থাকে। অসন্তুষ্ট শিক্ষকদের আচরণ আবার এর চেয়েও ক্ষতিকর। 'শিক্ষাদানের চেয়ে বাস্তব উদাহরণ যে বেশি ফলদায়ী' —এই প্রবাদটি তরুণদের ক্ষেত্রে যত সত্য তত আর কোথাও নয়। নৈরাশ্যধ্বস্ত, অসন্তুষ্ট, দরিদ্র শিক্ষকদের আচরণ পোড়োদের আচরণের মান আনে নামিয়ে। তার ফলে সমাজের মানও যায় নেমে। শিক্ষকদের স্থান ও মান উন্নত করার যে-সব উপায়ের কথা বলা

হয়েছে সেগুলি যদি অবলম্বন করা হয় তবে পোড়োদের আদর্শচ্যুতির অন্যতম কারণ হবে অপসারিত।

শিক্ষকদের মর্যাদা একবার প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষকতাবৃত্তির মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন ভাবতে পারা যাবে পোড়োদের মনে কী করে সামাজিক দায়িত্ব-বোধ জাগানো যায়। সব দেশেই শিক্ষার্থীরা সমাজের কাছ থেকে তাদের ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে। ভারতে মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় তিনশো টাকাও নয়। এখানে ইস্‌কুলের একটি পোড়োর জন্যে বার্ষিক ব্যয় হয় পাঁচ থেকে ছ'শো টাকা; এদেশের পোড়োরা তেমন-কোন সামাজিক সম্পদ উৎপাদন করে না। তার মানে, এখানে এক-একজন পোড়োর খরচার জন্যে দিতে হয় তিন জনের আয়। আর, কলেজের পোড়োর জন্যে তো দিতে হয় চার-পাঁচ জনের আয়। এর জন্যে পোড়োদের ওপর ন্যায়ত এক দায়িত্ব বর্তায়ঃ পাঠকাল শেষ হলে তাদের ব্যবহৃত অর্থের অনেক বেশি ফিরিয়ে দেয়া উচিত সমাজকে। তা যদি না পারে তো সমাজ তাদের জন্যে যে-অর্থ ব্যয় করেছে তা অন্তত পূরণ করে দেয়া কর্তব্য।

পোড়োদের ভেতর দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধ জাগাবার একটা উপায় হচ্ছে সমাজের উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনার কাজে তাদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার উৎসাহ দেয়া। তারুণ্য-প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মনে এই বোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে যে, শিক্ষা হচ্ছে সমাজের দেয়া এক মহৎ অধিকার। তাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যতে সামাজিক ঋণ শোধ করবার জন্যে নাগরিক হয়ে-ওঠার শিক্ষা নেয়া। পোড়োদের নানা সামাজিক অভ্যুদয়ের কাজে নামিয়ে কাজ এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। কোন-কোন দেশে কলেজ ও ইস্‌কুলগুলি প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে নানাভাবে উন্নয়ন-কার্য করেছে। অপর কতকগুলি দেশে পোড়োরা সোজাসুজি জাতীয় পুনর্গঠন ও অভ্যুদয়ের কাজ করেছে। ভারতেও সমাজ-উন্নয়নের কাজে, জাতীয় প্রসার-কর্মে,

অথবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি একান্ত-প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিতে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে পোড়োদের।

গত দু'টি মহাসমরে পৃথিবীতে যে-বিপর্যয় ও বস্তুতন্ত্রী মনোভাবের প্রসার ঘটেছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সমরদু'টির হানিকর প্রভাবের কথা অস্বীকার করবার নয়, কিন্তু সমরের অভিজ্ঞতার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেবা ও আত্মোৎসর্গের যে-সামর্থ্য এসেছে তার কথাও ভোলা উচিত নয়। প্রথম মহাসমরের শেষে তরুণদের মনে সাম্য, মুক্তি ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত শক্তির ভাবনা জেগেছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষে এসেছে বহু মানুষের মুক্তি; দেখা দিয়েছে সামাজিক ন্যায়নীতিকে সভ্য সমাজের অঙ্গ বলে মনে করবার ভাব। যা-ই হোক, কথাটা এই যে, আদর্শবাদ হচ্ছে তরুণচিত্তের বিশেষ-লক্ষণীয় লক্ষণ। জীবনের এই অধ্যায়ে ভাব-অনুভূতি প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তিগুলির জোয়ার আসে সহসা। তখন তারা আদর্শের জন্যে যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হতেও পিছ-পা হয় না। এই বয়সে আপদ-আঘাতের দিকে তাদের কেমন-যেন একটা টান দেখা যায়। তাই এই সময়ে ঠিক আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে তারা যে-কোন মহত্ত্বের যোগ্য হতে পারে।

ধর্ম তরুণচিত্তে আদর্শের অনুপ্রাণনা কতটা জাগাতে পারে সে-বিষয়ে দু'-একটা কথা বলা যেতে পারে। মানুষের মনে জাগে কতকগুলো দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব অসাড় করে চিন্তা ও কর্মশক্তিকে। ধর্মের কল্যাণে তিরোহিত হয় অনেক মানসিক দ্বন্দ্ব। ধর্ম শক্তির সঞ্চার করে মনে। সে-শক্তি মানে না কোনও বাধা-বিপত্তি। ধর্মের প্রেরণায় মানুষ বৃহত্তর-মহত্তর শক্তির সঙ্গে সাযুজ্য বোধ করে। এরই কল্যাণে সে পেরিয়ে যায় হিংসা-দ্বেষের সংকীর্ণ সীমানা। তবে, এই ধর্ম যখন অবনত হয় অপধর্মে, এ যখন হয় আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব তখন এ নিয়ে বাধে কলহ-সংঘর্ষ। কিন্তু ধর্ম যতক্ষণ ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন

ঘুচিয়ে চলে, ততক্ষণ তা থাকে মানুষের উন্নতি-সাধক মহৎ শক্তি-সমূহের অন্যতম হয়ে।

কৈশোরে-তারুণ্যে মানুষের মন থাকে গ্রহিষ্ণু, বৃহৎ ও মহতের সংসর্গের জন্যে মন থাকে প্রস্তুত, তার জন্যে সব-কিছু উৎসর্গ করতেও সংকুচিত হয় না মন। তাই তখন ধর্মের মহান্ আদর্শের সংস্পর্শ থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। ধর্মকে যদি মুক্ত করা যায় অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের জাল থেকে তবে তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবে এমন মহান্ মানবিক আদর্শ যাতে থাকবে সর্বজনীন নীতির অনুশাসন। এইরকম সব মহৎ আদর্শের সঙ্গে সংস্পর্শ ও পরিচয় না হলে জীবন দীনহীন ও লক্ষ্যহীন হতে বাধ্য।

এটা করার একটা উপায় হচ্ছে ইস্‌কুল-কলেজে প্রত্যহ কিছু-ক্ষণের জন্যে পোড়োদের সমবেত হওয়ার ব্যবস্থা করা। মানব-সমাজের সাধারণ সম্পদ ধর্মের যে সর্বজনীন রীতিনীতি ও জ্ঞানবাণী, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ যাতে পোড়োরা পায় তা-ই এর উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র একসঙ্গে সমবেত হওয়ারই একটা মূল্য আছে। এমন কি, কিছুক্ষণের জন্যে মিলিত হয়ে তারা যদি নীরবে থাকে তাতেও তাদের ঐক্যবোধ জাগবে। তাছাড়া, সমবেত প্রার্থনা, অর্চনা অথবা ধর্মগ্রন্থ-পাঠের ফলে তাদের পরিচয় হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে, সুযোগ হবে মানবিক আশা-আদর্শের মৌল ঐক্যকে জানার। একথা সুবিদিত যে, যে-সব ইস্‌কুল-কলেজে এমনি সমবেত হওয়ার সুযোগ আছে সেখানে পোড়োদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও সংহতি অনেক ভালো।

মানবিক আদর্শের মৌল ঐক্যের জ্ঞানের দরুন আমাদের ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্য-বিষয়ে পঠন-পাঠনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পুনর্মূল্যায়-নের বোধ আনা সহজ হবে। আধুনিক পৃথিবীর বহু বিবাদ-বিরোধ ও রেষ-দ্বেষের মূলে রয়েছে ইতিহাসের বিকৃত শিক্ষা। এই সেদিন অবধি ইতিহাস বলতে মানুষ বুঝত যুদ্ধ আর জয়-পরাজয়ের বিবরণ।

সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ ও জাতির গুণাগুণ বিচার করা হত তাদের সমরের জয়-সাফল্যের মাপে, মানব-সমাজে সাংস্কৃতিক অবদানের মাপে নয়। জাতীয় ঐতিহ্যগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে উগ্র জাতীয়তার যন্ত্র-হিসেবে। তাতে ব্যক্তি ও সমাজ জাতির সামরিক বিজয়-লাভের ব্যাপারে মাত্রাছাড়া গর্ববোধ করেছে, ভুলেই গেছে যে, সমর-সংগ্রামে প্রথমে মানুষের বিষয়-সম্পদ নষ্ট হয় অনিবার্য ভাবে, তার পর নৈতিক মান।

পুরাকালে সমর-সংগ্রাম মানব-সমাজের প্রগতিকে করত ব্যাহত, কিন্তু এখন তাতে ধ্বংসের সম্ভাবনা বেশি। এযুগে লড়াই বিপন্ন করতে বসেছে মানুষের অস্তিত্ব ও উদ্‌বর্তনকেই। তাই এখন মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে বোঝাপড়া, সহযোগ ও ঐক্য দরকার। তার জন্যে পোড়োদের অবিকৃত ইতিহাসের জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাদের বুঝতে হবে সারা মানব-সমাজের ইতিহাস হচ্ছে জ্ঞান, মুক্তি ও প্রীতির সাধনার ইতিহাস। এরই জন্যে নর-নারী যুগ-যুগ ধরে একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে—কখন জেনে কখন না জেনে। সাধারণত মানব-সমাজের এই গতির প্রতি সচেতন হয়নি বেশির ভাগ মানুষ, সচেতন হয়েছে বরং যুদ্ধের প্রতি, প্রতিযোগিতার প্রতি। কিন্তু এখন মানুষের বোঝা উচিত যে, তার এই সচেতনতা হচ্ছে অর্ধসত্য, বোঝা উচিত যে, বেঁচে-থাকার সংগ্রামই জীবনের একমাত্র সত্য নয়।

প্রতিযোগিতা কখন-সখন হয়তো প্রগতিকে সাহায্য করেছে, কিন্তু, তার যথার্থ সহায়ক হল সহযোগিতা। মানব-সমাজের উদ্‌বর্তনের জন্যে এই সহযোগিতার নীতি একটা মৌল প্রয়োজন; মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা আরও বেশি। সৃষ্টির ভেতর অনেক প্রাণীর চেয়েই মানুষ ছিল শারীরিক ও ইন্দ্রিয়শক্তিতে হীন। তা সত্ত্বেও যে সে দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্‌বর্তন করেছে, তার কারণ এই সহযোগের নীতি। এই নীতি জানা ছিল

না অন্যান্য জীবজন্তুর। ভাষার কল্যাণে সম্ভব হয়েছিল তার সহযোগ করা। ভাষার জন্যে সে পেরেছিল নির্দিষ্ট-স্পষ্ট ভাবে তার অতুলনীয় অভিজ্ঞতার কথা জানাতে। ভাষা হল মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকার। এই অধিকার হস্তান্তরিত হয় পুরুষানুক্রমে। তাই এর মধ্যে আছে সহযোগের ভাব। শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে ভাষার এই সহযোগ-নীতির সার্থকতা বুঝিয়ে দেয়া।

আগেই বলা হয়েছে যে, তরুণদের বীতশ্রদ্ধতা ও আদর্শচ্যুতির কারণ হল অর্থনীতিক, সামাজিক ও মানসিক অনিশ্চয়তা। তাদের মন থেকে এই অনিশ্চয়তা কেমন করে দূর করা যায় তার কতকগুলো উপায়ের কথাও বলা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের যোগাযোগ যদি আরও বেশি হয় তবে তরুণদের ভেতর সমাজ-বোধ বিকশিত হবে; তাতে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়বে। আর, এই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হলে আর তাদের সইতে হবে না লক্ষ্যহীনতার নৈরাশ্য। যৌথ পরিবার-প্রথায় এখন ভাঙন ধরলেও অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগ পোড়োদের মনে যৌথ পরিবারের ভাবধারা রক্ষা করে চলবে। সমাজে সহযোগের ভাবধারার নিবৃত্তি হওয়া ঠিক নয়; এই ভাব যেন কেবল তত্ত্ব হয়েই থেকে না যায়। দেখতে হবে যাতে প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের ভেতর সহযোগের ভাব স্থাপিত হয়। এখনকার তরুণরা যদি বুঝতে পারে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও সংস্কার এখনও আছে সজীব-সক্রিয় হয়ে তবে তাদের অনাস্থা-অশ্রদ্ধা যাবে ঘুচে।

ঐতিহ্য-সংস্কারকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা উপায় হচ্ছে পরিবর্তনের অনিবার্যতাকে স্বীকার করা। তরুণদের সামাজিক দৃষ্টির বিভ্রমের অন্যতম মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্বপুরুষদের থেকে তাদের মানসিক দূরত্ব। প্রত্যেক যুগের মানুষ নিজের যুগের ভাবধারাকে থাকে আঁকড়ে, পরিবর্তনকে পারে না মেনে নিতে। আধুনিক যুগের

তরুণদের পরিবেশ হয়েছে অন্যরকম; আগেকার কালের ভাবধারা তাদের কাছে ঠেকে বেসুরো। তাই প্রাচীনেরা যদি উপলব্ধি করেন যে, নবীনদের কাছে তাঁদের আদর্শ ও ভাবধারা গ্রহণীয় হতে হলে তা সংস্কৃত ও যুগোপযোগী হওয়া দরকার তাহলে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বের একটা মূল কারণ হয় অপসারিত।

ওপরে যে-সব উপায়ের কথা বলা হল সেগুলো দিয়ে তরুণদের বিশৃঙ্খলা-বিক্ষোভ দূর করা যাবে অনেকখানি। কিন্তু তাই বলে এ-আশা করা অন্যায় হবে যে, ওগুলো গ্রহণ করলে সঙ্গে-সঙ্গে ফল পাওয়া যাবে। এ-ও অসম্ভব যে, ঐ-উপায়সমূহের সবগুলোই একসঙ্গে নেয়া যেতে পারবে। ওগুলো গ্রহণ করলে যে শুধু শিক্ষাবিষয়েরই সংস্কার করা হবে তা নয়, হবে সমাজ-বিষয়েরও। শিক্ষা যদি ভাবী নাগরিকদের তৈরি করবার ক্ষমতা রাখে তো ভাবী সমাজের রূপ-গঠনের শক্তিও তার আছে। এই শিক্ষার মূল্যবত্তা ও উপযোগিতা নির্ভর করে শিক্ষকের চরিত্র ও যোগ্যতার ওপর। তাই বলা হয় যে, সমাজের ভাগ্য নির্ভর করে শিক্ষকদের গুণাগুণের ওপর। একথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষকবা অযোগ্য ও অসন্তুষ্ট হলে সমাজের ভিত ধসে পড়তে বাধ্য। তাঁদের অযোগ্যতা ও অসন্তোষ সংক্রামিত হয় পোড়োদের মনে। তাতে রোপিত হয় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিনষ্টির চারা। দেশের শিক্ষকরা যদি হন আদর্শব্রতী, তাঁরা যদি দেশের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার শপথ গ্রহণ করেন তবে মানব-সমাজকে সবরকম প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়ে আনতে পারেন ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি।

জুলাই, ১৯৫৪

নবম অধ্যায়

শিক্ষার স্থান

প্রায়ই শিক্ষার মূল্যবিচার করতে দেখা যায় তার মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ করার শক্তি দিয়ে নয়, কর্মসংস্থানের শক্তি দিয়ে। একথা অবশ্য সত্য যে, শিক্ষা মানুষকে সমাজের কাজের উপযোগী করে তুলবে, কিন্তু, তাই বলে কর্মসংস্থান-যোগ্যতা দিয়ে তার আসল মূল্যবিচার করতে হবে—এ ঠিক নয়। স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কর্মসংস্থান নয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কী?—শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসামর্থ্য ফুটিয়ে-তোলা, বা বড় জোর, অল্পপরিমাণ জ্ঞান দেয়া এবং সমাজ-সম্মত আচার-অভ্যাস শেখানো। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যই বা কী?—সমাজকে যদি স্থবির না হতে হয় তো এর লক্ষ্য হবে নব-নব জ্ঞান ও নির্মাণকৌশল বিকশিত করার সামর্থ্যযুক্ত তরুণ তৈরি করা, সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে পাকা কারিগর বা মিস্ত্রি তৈরি করা নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বৃত্তিশিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানা যেতে পারে। সমাজকে টিকে থাকতে হলে বৃত্তিশিক্ষা দরকার, কিন্তু সমস্ত শিক্ষাকে শুধু সেইদিকে পরিচালিত করা বিপত্তিকর। কোন-কোন দেশে ধীমান তরুণদের একান্ত-বিশিষ্ট শিক্ষণ দিতে দেখা গেছে; কিন্তু, প্রকৃতির নিয়ম-বিষয়ক জ্ঞানের অথবা উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ঐরকম বিশিষ্ট শিক্ষা অপ্রযোজ্য হওয়ায় বিশিষ্ট শিক্ষণ-প্রাপ্ত তরুণরা হয়ে পড়ে বেকার; এমনকি, তাদের আর কাজে নিযুক্ত করাও সম্ভব হয় না।

উচ্চতর শিক্ষা প্রধানত ভাব ও তত্ত্ব-ধর্মী; ব্যবহারিক সমস্যার সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই তার। এইখানেই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য। শিক্ষার এই ভাবধর্মিতার জন্যে এ-শিক্ষার চরিত্র হয়

ব্যাপক ও মৌল। এইটাই এর বৈশিষ্ট্য ও গৌরব। নির্দিষ্ট কোন সীমানায় আবদ্ধ না থাকার দরুন এ-শিক্ষা এমন কতকগুলো চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে মনকে নিয়ে যেতে পারে যার কল্যাণে প্রথম আভাস পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক লোকের। মানব-সমাজের সর্ব-প্রকার প্রগতির ভিত্তি হচ্ছে এই-সব ব্যাপক ও মৌল সত্য।

১

শিক্ষা মানবজীবনের সাধারণ ব্যাপারগুলি নিয়ে থাকবে, কি বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ যোগ্যতার শিক্ষণ নিয়ে—সে-প্রশ্নের সহজ উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। সোজা করে বলতে গেলে কথাটা এই দাঁড়ায়ঃ জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা বনাম বৃত্তি-সংক্রান্ত শিক্ষা। কথাটাকে এইভাবে দাঁড় করালে আবার প্রশ্ন ওঠে—জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা বলতে কী বুঝি? সাধারণ জীবন বলে তো কোন জিনিস নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি তো একটা বিশেষ সমাজের অংশ; তাকে কতকগুলো বিশেষ-বিশেষ কাজ করতে হয়। জীবনের বিশেষ-বিশেষ বৃত্তির কাজের ওপর জোর দিলে জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ও বৃত্তি-সংক্রান্ত শিক্ষার ভেতর পার্থক্য বলে কিছু থাকবে না।

বৃত্তি-সংক্রান্ত শিক্ষাও একরকমের জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা। সমাজে বৃত্তি-বিষয়ে আমাদের ধারণাও বাঁধাবাঁধি হওয়া ঠিক নয়। তা হলে সমাজ কতকগুলো কড়াকড়ি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে; তাতে একরকমের জাতিভেদ বা শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠবে। এই-রকম বৃত্তিনির্ধারণের অচলিষ্ণুতার জন্যেও জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। সহজেই বোঝা যায় যে, বৃত্তির বাঁধাবাঁধি সমাজকে করে দেবে স্থাণু। সমাজের প্রগতির একটা পথ হচ্ছে বৃত্তির স্বাধীনতার পথ—অনমনীয় শ্রেণী বা জাতির বন্ধন ভেঙে-ফেলার পথ।

জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার মধ্যে সাধারণত

একটা সীমারেখা টানবার চেষ্টা হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ঠিক টানা যায় না। তাই দরকার হয় মাঝে-মাঝে শিক্ষার আসল লক্ষ্য অবধারণ করা। এই অবধারণ হলেই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার সম্পর্ক স্থির করা যেতে পারে। শিক্ষার মূললক্ষ্যের বিশদ বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নয়। মানুষের মানস-প্রকৃতি ও তার গতিবিধির বিশ্লেষণ এবং মানব-মনের সঙ্গে সমাজ ও পৃথিবীর সম্পর্ক স্থির করতে না পারলে শিক্ষার প্রকৃতির যথার্থ অবহিতি সম্ভব নয়। মানস-প্রকৃতির বিশদ বিশ্লেষণ না করে বলা যায়, মোটামুটি চারটি সম্পৃক্ত অথচ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষার। এর প্রথম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। যে-পৃথিবীতে মানুষ বাস করে তার সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়াও শিক্ষার কাজ। শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে সমাজের প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদন করতে পারে তার উপযোগী করে কর্মশক্তি ফুটিয়ে তোলা। এর চতুর্থ উদ্দেশ্যটি ঐ-তিনটির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। এর কাজ হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনার্থের সন্ধান।

এর প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বিশদ ও বিশিষ্ট আলোচনা দরকার। তবে এখানে তা করা সম্ভব হবে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বলতে কী বোঝায়?—ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে মানুষের শারীরিক, মানসিক, ভাবিক, আনুভৌতিক, আধ্যাত্মিক শক্তিসামর্থ্যের পরিণতি। শরীর যদি অপুষ্ট অপটু হয় তো তাতে নানা বিপত্তি-বিঘ্ন দেখা দেয়। অপরিণত মনও তেমনি মানসিক বন্ধনজালে বদ্ধঃ নানা সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, ভয় ও ঘৃণার বাস সেখানে। শিশুকে যদি স্নেহবঞ্চিত করা হয় তো তাতে তার অনুভূতি-আবেগের দিকটা থাকে উপবাসী হয়ে; তার ফলে তার মন হয়ে ওঠে রুক্ষ-রুদ্র। পরে সে বিরোধী হয়ে ওঠে সামাজিক জীবনের। ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক বিকাশ বলতে কি বোঝা যাবে বলা কঠিন। তবে, এইটুকু ঠিক যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও মানব-মন উপবাসী থাকলে

বিনষ্টি ঘটবে; নিজের ও পরের ওপর তার ফল হবে খারাপ। বৃদ্ধি না হওয়া মানে যে যথাপূর্ব অবস্থায় স্থিত তা নয়; তাতে যাত্রাস্থান থেকে অনেক পেছনের অতল গহ্বরে ঘটে পতন।

শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য হল পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং সমাজের ভাবধারা ও আদর্শের জ্ঞান। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষ টিকে থাকতেই পারে না, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা। বস্তুত এই জ্ঞান ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক কাজের অপরিহার্য উপাদান। একথা অবশ্য বলা দরকার যে, মাঝে-মাঝে সংবাদ-সংগ্রহকেই জ্ঞান বলে মনে করা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, শুধু পারিপার্শ্বিক জগতের জ্ঞানই জ্ঞান নয়, নয় ভাবাদর্শেরও জ্ঞান; এই দুই জ্ঞানের সমবায় ও সামঞ্জস্যেই জ্ঞানের পূর্ণতা। জগৎ ও জীবনকে ঠিকমতো জানতে হলে এই দুই রকমেরই জ্ঞান দরকার। যা-ই হোক, বেঁচে থাকতে হলে যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি তার জ্ঞান সবরকম শিক্ষাসূচীর মূলে।

শিক্ষার তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক জীবনের রক্ষা ও উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য-বিকাশ। এর জন্যেও দরকার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এবং পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান। সমাজের পরিবেষ্টনীতেই ব্যক্তি-মানুষ বেড়ে উঠতে পারে। মানুষের বিকাশ ও বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যদি পরিবেষ্টনী পরিবর্তিত হয়ে না চলে তবে সংকটের সৃষ্টি হয়। আসলে পরিবেষ্টনী অনুকূল হলে মানুষের বৃদ্ধি-বিকাশ হয় অবাধ-স্বচ্ছন্দ, আর প্রতিকূল হলে হয় ব্যাহত-ক্ষুণ্ণ। আর, ব্যক্তি-মানুষের উন্নতি-অবনতি সমাজের উন্নতি-অবনতির কারণ হয়। ব্যক্তিকে যদি সমাজের সক্রিয় সহায় হতে হয় তবে শুধু নিজের বৃদ্ধি-বিকাশ হলেই হবে না, সমাজের অভ্যুদয়-উন্নতির জন্যেও কিছু করা চাই। এখনকার সামাজিক পরিবেশে সমাজকে সজীব-সক্রিয় রাখতে হলে মানুষের সমস্ত সীমিত শক্তিকে নিয়োজিত করা দরকার।

আর, প্রগতির জন্যে চাই সমাজের অর্জিত সম্পদের ওপর বাড়তি কিছু অর্জন করা। এখনকার অবস্থায় শুধুমাত্র সাধারণ মান বজায় রাখার জন্যেই দরকার হয় আমাদের শক্তির মোটা অংশটা; তার ওপর পৌঁছতে হলে তো প্রয়োজন অসাধারণ শক্তি-চেষ্টার। তা হলেও প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে এই দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করা। সমাজের প্রতি এ-কর্তব্য না করলে তার কাছ থেকে কিছু আশা করা অসংগত। কিছু না দিলে নিতে পারা যায় না, আবার, কিছু না নিলেও দিতে পারা যায় না।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার ব্যাপারটা অবস্থাকে করে জটিলতর। প্রত্যেক মানুষের আছে এক বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা। অন্তরের আশা-বাসনা চরিতার্থ করতে পেলেই সে পায় সুখ। একে বলা যেতে পারে প্রেয়ের সন্ধান বা আত্মোপলব্ধির পথে যাত্রা। প্রত্যেক মানুষের এমন একটা অংশ আছে যা সামাজিক দাবিকে যায় অতিক্রম করে। শুধু আপন বৃত্তির কাজ করে বা সমাজের দাবি মেনেই মানুষ আত্মোপলব্ধি করতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, জীবনের জন্যে শিক্ষা মানে জীবনের এক বিশেষ বৃত্তিব্যাপারে শিক্ষা। এভাবে ধরলে জীবনের জন্যে শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু এ-পার্থক্য যে নেই তা নয়; আর, তা রাখতেও হবে। একদিকে, সমাজের প্রগতি মানে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে সমাজ-কেন্দ্রিকতার দিকে, সংকীর্ণতা থেকে প্রসারের দিকে গতি। অপরদিকে, সমাজের পূর্বার্জিত সভ্যতা-রক্ষণের জন্যে এখন দরকার করে অধিকাংশ ব্যক্তির প্রায় সমগ্র শক্তি। এমন হতে পারে যে, সামাজিক বিকাশের প্রগতির ফলে জানা যাবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সৃজনীশক্তি বলতে এখন যা বুঝি তা আসলে আরও ব্যাপক। কিন্তু উন্নততর, সুখীতর সমাজেও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সৃজনীশক্তির দীপ্তিতে থাকবে পার্থক্য। ভবিষ্যতে সমাজের সব ব্যক্তিই সমাজের সাধারণ কল্যাণের কাজ

করতে পারে, কিন্তু, সমাজের যথার্থ উল্লেখ্য অগ্রগতি এখনকার মতো তখনও হবে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়। এরকম প্রচেষ্টার আগে অবশ্য এটা দেখতে হবে যে, সেই প্রচেষ্টায় ব্রতী ব্যক্তি বা দল সমাজের সাধারণ মানুষের ধারাটা বজায় রেখেছে। মনে রাখতে হবে যে, আজকের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের সাফল্য-প্রচেষ্টা।

শিক্ষার প্রথম দু'টি লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ ঘটানো এবং পৃথিবী-সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। প্রথম লক্ষ্যের প্রসঙ্গে জীবনের পরের দিকের বিশেষ কাজকর্ম-সম্পাদনের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞতার কথা ভাবার তেমন কোন দরকার নেই। দ্বিতীয় লক্ষ্যের ক্ষেত্রেই তার কথা আসে ; তাতেই লক্ষিত হয় বিশেষজ্ঞতা। অর্থাৎ, বাস্তব পৃথিবী এবং সমাজের ভাবধারা ও আদর্শ-সংক্রান্ত জ্ঞানে প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞতার। শিক্ষার তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন আরও বেশি। আপন রীতিপ্রকৃতি-অনুযায়ী কাজ করতে পেলে মানুষ সমাজের রক্ষণ ও লক্ষ্যে উপনয়নের আনুকূল্য করতে পারে। ব্যক্তিসামর্থ্যের ভিত্তিতেই মানুষের অমনি প্রাচীন সম্পদের উপলব্ধি এবং নবীন জ্ঞানের আবিষ্কারের অবদান হওয়া উচিত। আত্মোপলব্ধি যে ব্যক্তিগত ব্যাপার তা সহজেই বোঝা যায়। ধর্মের কথা বলতে গিয়ে কেউ বলেছেন যে, বিজনতার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই হয় ধর্মের সৃষ্টি ; অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে নিঃসঙ্গ মানুষের সৃষ্টি। দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সম্পদও নিঃসন্দেহে সমাজের জীবনকে সমৃদ্ধ করে ; কিন্তু এই-সব সামগ্রীও বিজন মানুষের সৃষ্টি।

প্রথম ধারণায় মনে হয়, শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য থেকে আসে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান, আর, তৃতীয় লক্ষ্য থেকে বিশেষজ্ঞতার শিক্ষা। দ্বিতীয় লক্ষ্যের অন্তর্গত পৃথিবী-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং

বিশেষ বৃত্তির বিশেষ জ্ঞান। চতুর্থ লক্ষ্যটি দু'টির কোনটিরই অন্তর্গত নয়; এ এক স্বতন্ত্র বর্গ।

শিক্ষার বিবিধ লক্ষ্যের বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এইরকম নির্দিষ্ট পার্থক্যীকরণ যুক্তিযুক্ত নয়। প্রত্যেকটা লক্ষ্যের সঙ্গে অপরটার সাধর্ম্য ও পারস্পরিকতা আছে। এর একটা উদাহরণ হল এই যে, অনেক তাত্ত্বিক গবেষণা-অন্বেষণার ফলেই বাস্তব জীবনের উপযোগী ও সুবিধাকর সামগ্রা-সম্পদের আবিষ্কার বা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে; কিন্তু এদের ভেতর যে কোন সম্পর্ক আছে প্রথম দৃষ্টিতে তা বোঝাই যায় না।

২

এখন আমরা দেখব শিক্ষার এই উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। একটা বিশেষ কোন স্তরের সঙ্গে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের সম্পর্ক দেখানো মানে এ বলা নয় যে, তার সঙ্গে আর কোন স্তরের সম্পর্ক নেই। কথাটা এই যে, একটা বিশেষ স্তরে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের সক্রিয়তা বেশি।

আগের আলোচনা থেকে নিশ্চয় এ-কথা বোঝা গেছে যে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই শুরু হওয়া উচিত ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান-অর্জন। এই ধারাটা চলবে কৈশোরের প্রথম থেকে প্রায় শেষ অবধি। এই স্তরে কোন বিশেষ গুণ বা সামর্থ্যের বিকাশের দরকার নেই। এই সময়ে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বেঁচে-থাকা আর এগিয়ে-চলার জন্যে দরকারী শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণ শেখানো আর সমাজের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত করা। জীবনের এই পর্বটায় বিশেষ বৃত্তিগুণগুলোর সত্তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই এখন শিশুদের সাধারণ শিক্ষার কথা ভাবতে হয়।

শৈশবের এই প্রাথমিক শিক্ষা নির্বিশেষ-সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু, এ-শিক্ষা আবার সবচেয়ে বাস্তবও। শিশুদের যদি জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হয় তো প্রথমে তাদের একেবারে সামনের পরিবেশ-সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। তাদের যদি কোন বিশেষ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হয় তবে সম্মুখস্থ একান্ত পরিচিত পরিবেশের প্রয়োজনীয় বিষয়কে ভিত্তি করেই তা গড়ে-তুলতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি সার্থক ও লক্ষ্যসাধক হতে হয় তবে সমাজের স্থানীয় অভিজ্ঞতার ওপর তাকে দাঁড়াতে হবে। এই অভিজ্ঞতা যে বিশেষ প্রকৃতির তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাঁচটা নির্বিশেষ ও সাধারণ হলেও মোটের ওপর তার মূল প্রকৃতিটা হচ্ছে অন্যান্য স্তরের শিক্ষার চেয়ে বিশেষ-ধরনের।

বুনিয়াদি-শিক্ষার ব্যাপারটি ভারতে সাম্প্রতিক কালে পুষ্টিলাভ করেছে। তাতেও ঐ-ভাবটি স্বীকৃত হয়েছে। বুনিয়াদি-শিক্ষার লক্ষ্য হল হাতের কাজের সাহায্যে শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো; যে-কাজ তার বিশেষ পরিচিত তারই সম্বন্ধে জ্ঞানের মাধ্যমে তা ঘটানো। এই রীতি থেকে এই সত্যটা স্বীকৃত হয় যে, নিছক ভাব বা অবাস্তব তত্ত্ব-বিষয়ের শিক্ষা শুধু অগ্রাহ্যই নয়, অবাস্তবও। বুনিয়াদি-শিক্ষায় হস্তকর্মের স্থান প্রধান হওয়ায় শিক্ষায় কর্মের প্রয়োজনীয়তা হয়েছে স্বীকৃত। তাছাড়া, হাতের কাজ তো সমাজের প্রয়োজনীয় কাজই। তাই, এই হস্তকর্ম-শিক্ষার ফলে ছেলেমেয়েদের সামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, মানে, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ ফুটে উঠতে থাকে। শিক্ষায় স্থানীয় শিল্পকর্মের প্রাধান্য দেয়ার মানে এই কথাটা স্বীকার করা যে, শিক্ষা পরিচিত বিষয় দিয়ে শুরু হয়ে পরে অপরিচিত বিষয়-সম্বন্ধে হওয়া বিধেয়। এইরকম শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নাগরিকতার রীতির শিক্ষালাভ হয়; প্রাত্যহিক জীবনের কাজের মাধ্যমে

সে-শিক্ষা ভালোই হয়। তত্ত্ব ও নীতির মাধ্যমে তেমনটা হয় না।

বুনিয়াদি-শিক্ষার প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ের তফাত হয় স্থানভেদে। মূল কাঠমোটা একরকম হলেও তাদের খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকে; তার জন্যে অনেক সময় খুব সাবধানী দৃষ্টি ছাড়া তাদের মূলগত ঐক্য অন্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। শিক্ষার লক্ষ্য-বিষয়ে সব স্থানের শিক্ষার ভেতর মিল থাকবে, কিন্তু লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়-রীতিতে পার্থক্য ঘটে স্থানীয় পরিবেশের পার্থক্যের জন্যে, কেননা, এই শিক্ষা সম্ভবমতো বিশিষ্ট ও বাস্তব ধরনের।

প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কেন হয় তার একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এ-শিক্ষাকে সাধারণ হতে হয় এই জন্যে যে, *এতে শিশুর ব্যাপক, জাগ্রত কৌতূহল তৃপ্ত করবার ব্যবস্থা* থাকতে হয়। যা-কিছু শিশুর দৃষ্টিতে পড়ে তার বিষয়ই সে জানতে চায়। যে-সব নব-নব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে লাভ করে তার সব-কিছুকেই সে বাঁধতে চায় একটা ঐক্যের সূত্রে। তাই এই শিক্ষাকে হতে হয় সাধারণ। কিন্তু, বিভিন্ন স্থান ও পরিবেশের পার্থক্যের জন্যে শিক্ষার বাস্তব দিকটাকে হতে হয় বিশেষরূপের। সমাজের জীবনের সঙ্গে শিশুর জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাতে হয় বলে *প্রাথমিক শিক্ষাকে হতে হয় সাধারণ, আর, বিশেষ পরিবেশের বিষয়-ব্যাপার দিয়ে শিক্ষা শুরু করতে হয় বলে একে হতে হয় সবিশেষ।*

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে গেলেই *সেখানে আর-এক নিয়মের ক্রিয়া দেখা যাবে। অন্যান্য প্রাণী* থেকে মানুষ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হচ্ছে জ্ঞান-অর্জনে, বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত ও সূত্র-স্থাপনে। শারীরিক দুর্বলতা-অক্ষমতা সত্ত্বেও তাই সে অন্যান্য জীবজন্তুর ওপর জয়লাভ করেছে।

বিশেষ-বিশ্লেষ ব্যাপার থেকে নির্বিশেষ-সাধারণ সিদ্ধান্ত করতে হলে প্রয়োজন অসংগত বিষয়গুলি বর্জন করে সংগত বিষয়গুলি বেছে-নেয়া। প্রতি মুহূর্তে মানুষের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বহু বিচ্ছিন্ন ব্যাপারের। চেষ্টা করে আমরা হয়তো আমাদের মনকে একটা বিষয়ে নিবদ্ধ করতে পারি। কিন্তু, বাইরে থেকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের যে-স্পর্শ এসে-পড়ে মনে, তাকে তো একেবারে বার করে দেয়া যায় না। এই-সব বিচিত্র বিষয়কে যদি আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে দেয়া হয় তবে আমাদের অভিজ্ঞতা সংহতি পায় না। অসংখ্য বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে থেকে সংগত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোকে বেছে-গুছিয়ে-নেয়াতেই অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট স্পষ্ট রূপ পায়।

একথা হয়তো বলা হতে পারে যে, জন্তুরাও তাদের অভিজ্ঞতায় অসংগত বিষয় থেকে সংগত বিষয়কে নেয় আলাদা করে। বাঘ যখন শিকারের সন্ধান করে তখন তার মন থেকে আর সব-কিছুই ফেলে সরিয়ে। কিন্তু পশুদের এই ধরনের গ্রহণ-বর্জনের সঙ্গে মানুষের গ্রহণ-বর্জনের তফাত আছে। পশুদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে জৈব প্রবৃত্তির ক্রিয়া: তাই তাতে দেখা যায় একই ভাবের আবৃত্তি হতে। একই অবস্থায় তার একই প্রতিক্রিয়া হয়; পশুরা তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে পশুদের স্বভাবে-আচরণে আসে বিপর্যয়-বিভ্রান্তি। মানুষের ক্ষেত্রে এই গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারটা চালিত হয় বুদ্ধি দ্বারা, প্রবৃত্তি দ্বারা নয়। এখানে তার রূপ হচ্ছে জটিল, সোজা-সাপটা নয়। তার এই গ্রহণ-বর্জনের ক্রিয়ায় কাজ করে বিশেষ থেকে সাধারণে যাওয়ার ক্ষমতা। এই ব্যাপারে মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে ভেঙে বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক নিরূপণ করে। এই ক্ষমতার কল্যাণে সে অপরাপর প্রাণীর ওপরে। তার ভাব ও অভিজ্ঞতা-প্রকাশের ক্ষমতাতেও তা লক্ষণীয়। পশুপাখীরা যে-সব শব্দ করে তাদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ, একমাত্র মানুষই অস্ফুট ধ্বনি থেকে সৃষ্টি করেছে অর্থপূর্ণ বৈচিত্র্যময় ভাষা।

বিশ্লেষণ-ক্ষমতার জন্যে মানুষ অপরাপর জীবজন্তু থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, এই ক্ষমতা যথেষ্ট না বাড়া পর্যন্ত মানুষ আপন শক্তিমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। অধিকাংশ পশুর জীবন-ধারণের ক্ষমতা অর্জিত হয় তারুণ্য-প্রাপ্তির আগেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না, বিশেষ করে আধুনিক পরিবেশে; তারুণ্যপ্রাপ্তির আগে সে নিজেকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রে এই কালপর্বটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তাই জীবনের জন্যে তার প্রস্তুতি চলতে থাকে সারা শৈশব-কৈশোর জুড়ে, এমন কি, তার পরেও।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটা কাটে এই তরুণবয়সের প্রথম দিকটায়। শৈশবের লক্ষণগুলো মোটামুটি স্পষ্ট। তাই শিশু-কিশোরদের ব্যাপার একরকম বোঝা যায়। তাদের কিছু-কিছু জ্ঞান দেয়া আর কতকগুলো অনুমোদিত আচরণ-ক্রিয়া শেখানো দরকার। বয়স্কদের সঙ্গে ব্যবহারেও কতকগুলো বাঁধা রীতি অনুসরণ করলে চলে, কেননা, তাদের ভাবভঙ্গীও খানিকটা বাঁধাধরা। প্রথম বয়সের তরুণেরা শিশুও নয়, আবার বয়স্ক মানুষও নয়। এই বয়সটায় আশ্চর্যকর দ্রুতগতিতে মানুষের পরিবর্তন হতে থাকে। তখন যে-মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটে চলে, ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার প্রভাব গভীর। তাছাড়া, তারুণ্যের আবির্ভাবে মানুষের শক্তিবৃত্তি ও অনুরাগ-আসক্তি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চায়; তাই দরকার করে প্রশস্ততর, অল্প-বিস্তর স্বাধীন পরিবেশের। সেইজন্যেই এই বয়সে যে-শিক্ষা দিতে হয় তাতে থাকা দরকার বিভিন্ন রুচিবৃত্তি তৃপ্ত করার মতো বিষয়-বৈচিত্র্য; প্রাথমিক শিক্ষার বাঁধাধরা ছক এ-পর্বে চলে না।

আর, এর সঙ্গে-সঙ্গেই আসে বিশেষীকরণের কথা। তরুণদের আপন-আপন রুচি-ক্ষমতা-অনুযায়ী নির্বাচিত পথে শিক্ষা পেতে হলেই তো বিশেষীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। জীবনের প্রস্তুতির জন্যেই দরকার করে এই বিশেষ ব্যবস্থার। একথা বলা হয়ে থাকে যে, শৈশবে মৌল শিক্ষাগুলো আয়ত্ত করতে পারার পর

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তিমুখী শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করা দরকার। তা না হলে এই স্তরের শিক্ষার কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না, এ হয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষারই জের টেনে-চলা। এই মতের লোকেরা বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা হবে বিশিষ্ট বৃত্তিরই শিক্ষা।

আমার কিন্তু মনে হয় যে, মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিশিক্ষার দাবিটা সমর্থনীয় নয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মৌল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে বটে, তবে তা যথেষ্ট নয়, সেটা হয় মোটামুটি রকমের। এই পর্বটাও খুব সংক্ষিপ্ত; কাজেকাজেই, মৌল শিক্ষাগুলো তার মধ্যে স্থায়ী ও গভীর হয়ে বসতে পায় না। এই পর্বটা কিছু না বাড়ালে শেখা বিষয়গুলো ভুলে-যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব।

তাছাড়া, প্রাথমিক স্তরে যে-পরিমাণ জ্ঞানলাভ হয় তা-ও অতিশয় অল্প ও অনিশ্চিত। তাতে জীবনের অগ্রগতি সহজ হয় না। মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব। সে শুধু নিজের অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে না, করে যে-সমাজে সে জন্মগ্রহণ করে তার অভিজ্ঞতার ওপরও। মানুষের কাজকর্ম প্রধানত প্রবৃত্তি-তাড়িত নয়, বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুমান-সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তার দরকার বিচিত্র ও প্রচুর জ্ঞান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের প্রকৃতি-অনুসারেই দরকার সাধারণ শিক্ষার কালপর্বের বিস্তৃতির। এই প্রয়োজন ছিল সব সময়েই, তবে আধুনিক জীবনের বেড়ে-চলা জটিলতার জন্যে তা হয়েছে আরও বেশি। সুতরাং, হয় মাধ্যমিক শিক্ষারূপে অথবা পরে বয়স্ক-শিক্ষারূপে যত বেশি সংখ্যার লোকের সাধারণ শিক্ষার কালবিস্তার সম্ভব, সমাজকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা যে প্রধানত সাধারণ বা উদার নীতির শিক্ষা হবে তার আরও কারণ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, তারুণ্যের সূচনাপর্বটা চঞ্চল, অস্থির। এই সময়েই মানুষের পরিণতির সূচনা হয়। আর, এই পরিণতি দ্রুত চলে কতকগুলো ধারার ভেতর দিয়ে। এক-একটা ধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় ব্যক্তিত্বের এক-একটা

দিক। এই সময়ের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কোন স্থির-নিশ্চয় অনুমান করা সংগত হয় না। তাই, এখন ভবিষ্যতের বৃত্তির ব্যাপার নির্ণয় করে-নেয়া সাংঘাতিক ভুল হতে পারে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের যতখানি সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া বিধেয়। মেজাজ-মর্জি বদলানোর সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা বদলানো সম্ভব নয়। তাই এই সময়ের শিক্ষাকে সম্ভবমতো ব্যাপক ও সাধারণ করে-তোলা দরকার। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের যদি একবার-ঠিক-করা নির্বাচনকে আঁকড়ে-থাকতে বাধ্য হতে হয়, অর্থাৎ, যদি প্রয়োজন-বোধে সে-নির্বাচন সংশোধন করার সুযোগ না থাকে তবে শিক্ষার বিষয়সমূহে বৈচিত্র্য থাকার ব্যবস্থা অনেকটাই হবে অর্থহীন।

ব্যক্তির প্রয়োজন ছাড়া, সমাজের প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, বিচিত্র-বিষয়-সমন্বিত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাতেই সমাজের উপকার হবে বেশি। তারুণ্যের সূচনাপর্বে মানুষের নব-নব শক্তি মোটামুটি হয় প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তিগুলি যদি হয় একান্ত-বিশেষ রূপের তবে তাতে ভয় থাকে ব্যক্তি-মনের বিশেষ ছাঁচে ঢালাই হয়ে দাঁড়াবার। সামাজিক পরিবেশের একটু-আধটু অদল-বদল হলে ঐ-সব শক্তিবৃত্তি বা শিক্ষা আর তেমন কাজে লাগে না; পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর মানসিক নমনীয়তা তাতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অর্জিত জ্ঞান ও ক্ষমতা-যোগ্যতা যদি হয় ব্যাপক তবে বিচিত্র পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ-সম্ভাবনা থাকে বেশি।

মনোবিজ্ঞানীরা এখন এবিষয়ে একমত যে, শিক্ষার সার ক্ষমতাটা হচ্ছে সাধারণীকরণের ক্ষমতা, অর্থাৎ, নানা বিষয় বা ব্যাপার থেকে মৌল সিদ্ধান্ত করার সামর্থ্য। এই ব্যাপক দক্ষতা যদি আয়ত্ত হয় তবে বিভিন্ন পরিস্থিতি বা বিষয়কে আয়ত্তে আনা সহজ হয়। কিন্তু, যদি এই সাধারণীকরণের ব্যাপক দক্ষতা অর্জিত হওয়ার আগেই

বিশেষীকরণের ক্ষমতা মনে খাঁজ কেটে বসে তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে সে-মন দিয়ে তাকে বাগ-মানানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। যে-সমাজ স্থবির তাতে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, শক্তি-সামর্থ্য বাঁধাধরা হলে খানিকটা চলতে পারে, কিন্তু গতিশীল সমাজে তা হলে খুব বিপত্তির ভয় থাকে। আধুনিক সমাজ বিশেষভাবে গতিশীল। আজকের কাজকর্মের ধারা-ধরন কাল বদ্‌লে যাচ্ছে। এইরকম পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিশেষ ধরনের শিক্ষা-জ্ঞানের ছক বেঁধে-দেয়া যদি অল্প বয়স থেকে হতে থাকে তবে তাতে ব্যক্তি-জীবনকে উন্নততর করে-তোলার সাহায্য তো হবেই না, বরং তাকে পরিবর্তমান পরিবেশের সঙ্গে তাল ফেলে-চলার অযোগ্য করে তুলবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-সম্বন্ধে যে-কথা বলা হল তা অল্প-বিস্তর প্রযোজ্য হবে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও। তবে মুখ্য পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, উত্তর-মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যাপক দক্ষতা-প্রতিষ্ঠার তত প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই সে-দক্ষতা অর্জিত হয়ে-থাকবার কথা। ব্যক্তির সাধারণীকরণ ও ভাবতত্ত্ব-গ্রহণের ক্ষমতাও এই স্তরে লাভ করার বিষয়। এই স্তরের শেষের দিকে মানুষের কতকগুলো মৌল গুণের বিকাশ হওয়াও প্রত্যাশিত; তার মধ্যে হচ্ছে চিন্তার স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধ। বিশেষ গুণ-শক্তির ওপর ঝোঁক-দেয়া মাধ্যমিক স্তরে যতখানি বিপত্তিকর তার পরের স্তরে ততখানি নয়। মানুষ যদি শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে নাগরিকের প্রয়োজনায় সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে তো পরে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যেও তৈরী হতে পারে। এই-সব বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষ-বিশেষ বৃত্তির প্রয়োজনে হতে পারে; হতে পারে জীবনে সত্যসন্ধানের প্রয়োজনেও।

এই স্তরের শিক্ষায় বিশেষ দক্ষতা-অর্জনই যে প্রধান লক্ষ্য তা আগে বলেছি। কিন্তু, একথা মনে রাখতে হবে যে, এই বিশেষ ক্ষমতা-অধিকার হওয়া উচিত সমাজ-বোধের গভীরতা-লাভের সঙ্গে। অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে জীবনের

উদ্দেশ্য-বোধ। আর, একথাও মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ শিক্ষা সার্থক হতে হলে তাতে সাধারণ শিক্ষার মৌল সম্পদগুলোও থাকা চাই। মানুষ যে বৃত্তি অবলম্বন করে তা সামাজিক প্রয়োজনে। এই-সব প্রয়োজনের ভেতর কোন্‌গুলো আগের তার নিরূপণই হচ্ছে মূল্যবিচার-বোধ; এই নিরূপণেই বৃত্তির সামাজিক মূল্যবত্তা। এই মূল্যবত্তা বুঝলে ব্যক্তি-জীবন হয় সমৃদ্ধ, বৃত্তির উপকরণগুলিও হয় বাস্তব প্রয়োজন-সাধক। হোআইট্‌হেড্‌ বলেন, বৃত্তিশিক্ষার অন্তর্নিহিত যে-উদার-ব্যাপক মূল্যবোধ তাকে ফুটিয়ে তোলে এই সামাজিক মূল্যবত্তার উপলব্ধি।

আর-একটা সাবধানতা দরকার। এখন যে-ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাতে প্রায়ই মানুষের জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞানও হয় না, আর, এর শেষে যে-চিন্তাশীলতা ও পরিমিত কল্পনাশক্তি হওয়া দরকার তা-ও হয় না। সাধারণত এইটেই হতে দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষা ও ব্যাপক জ্ঞান হওয়ার আগেই সংকীর্ণ পথে বিশেষীকরণ হচ্ছে। কিন্তু এই সাধারণ ও ব্যাপক শিক্ষা না হলে মানুষ সমাজের যথার্থ কর্মী হতে পারে না। তাই, এমন-সব বিশেষজ্ঞ দেখা যায় যাঁরা আপন-আপন ক্ষেত্রের বাইরে বুদ্ধি ও অনুভূতির ব্যাপারে কাঁচা। বুঝতে হবে তাঁদের যথার্থ জ্ঞান হয় নি। আর, আপন বৃত্তি-বিষয়ে মানুষের যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, জীবনের সাধারণ সব প্রয়োজনীয় ব্যাপারে জ্ঞান না থাকলে সে-জ্ঞান উপকারের না হয়ে অপকারেরই হতে বসে। এইজন্যেই শিক্ষার উত্তর-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার যাতে মানুষের পরিবেশ-বোধ ও সাধারণ জ্ঞান পেতে বাধা না হয়। প্রথম তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েদের জীবন ও সমাজের জ্ঞান যদি-বা কিছু হয় তো তার যথার্থ মুল্য বোঝবার মতো বুদ্ধির পরিণতি হয় না।

এই স্তরে শিক্ষার চতুর্থ লক্ষ্যটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। একে আমরা বলেছি মানুষের সত্যসন্ধান বা আত্ম-আবিষ্কারের অভিযান।

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে সাধনা করবেন এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে। কেউ-কেউ আপন-আপন বৃত্তি-সংশ্লিষ্ট কর্তব্য কর্ম করেই তৃপ্ত থাকবেন। এই-সব নানা বৃত্তিকর্মে কোথাও লাগবে শারীরিক, কোথাও বুদ্ধিগত, কোথাও সুকুমার শিল্প-সংক্রান্ত কলাকৌশল। আবার কেউ-কেউ সত্যসন্ধানে বা নবীনতর সৃষ্টিতে ব্রতী হয়ে আত্মোপলব্ধি করবেন। লক্ষ্য যা-ই হোক, আপন বৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় আপন সমাজ-পরিবেশে প্রাপ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে যখন মানুষ আয়ত্ত করতে পারে তখনই সে আপন সাধ্য বস্তুর যোগ্য হয়। যন্ত্র-সম্পদ কী দান এনেছে তা জানলে তো সে নিপুণ যন্ত্রী হতে পারবে। পৃথিবী ও পরিবেশের জ্ঞান-সম্বন্ধে যার দিগ্‌দর্শন করা আছে সে-ই তো পারে আপন বিষয়ের জ্ঞান-পরিধি বিস্তীর্ণ করতে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক, কিন্তু তার বিষয় হচ্ছে বাস্তব। উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্য আর বিষয় দুই-ই ভাবধর্মী বা তত্ত্ব-ঘেঁষা। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যাপক, অভিজ্ঞতার সারা ক্ষেত্রব্যাপী তা বিস্তীর্ণ। উচ্চতর শিক্ষায় জ্ঞানের বিষয়ে চিত্ত হয় আরও বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ, তার সীমানা হয় ক্রমসংকীর্ণায়মান। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান যতই বিশেষীকৃত হোক না কেন, বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যে কী, কোথায় তার ব্যাপক প্রয়োগ-সম্ভাবনা তা দেখতে হয়।

এই-সব আলোচনা থেকে আমাদের কতকগুলি উপস্থিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই: জীবনের শিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষার মধ্যে কোন প্রাচীর তুলে-দেয়া যায় না। শিক্ষার এক-একটা স্তরে এক-একটা বিষয়ের ওপর জোর দেয়া যেতে পারে মাত্র, কিন্তু কোন স্তরেই দু'টোর কোন-একটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। একটা জিনিস স্পষ্ট করে মনে রাখতে হবে: তা হচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষণের মধ্যেকার পার্থক্য। এই দু'টোর তফাত যদি ঠিক রাখা যায় তবে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা তেমন থাকবে না। শিক্ষা কাকে বলে?—

শিক্ষা হল মানুষের ব্যক্তিগত স্বকীয় গুণরাজির প্রকাশ। কিন্তু, ব্যক্তি সমাজ-ছাড়া হতে পারে না বলে শিক্ষায় সামাজিক বিষয়ও না থেকে পারে না। তবে, এই যে সামাজিক বিষয়—এ হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক, ব্যক্তিগত নয়। অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মূলত সাধারণ; ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের দিকে তার দৃষ্টি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে জীবনের উপযোগী করে-তোলা, বিশেষ কোন বৃত্তির উপযোগী করে-তোলা নয়। আর, শিক্ষা হচ্ছে বিশেষ বৃত্তি বা কাজের উপযোগী করে-তোলার প্রস্তুতি। সাধারণ শিক্ষা কিছুটা হলে, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কিছুটা দানা বাঁধলে, ব্যাপক জীবনের বোধ মোটামুটি হলে বিশেষ বৃত্তির শিক্ষা ও জ্ঞান সার্থক হয়ে-উঠতে পারে। তাই, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রধানত শিক্ষারই প্রস্তুতি, আর, মাধ্যমিক শিক্ষার পরের শিক্ষা, অবশ্য দু'-একটা ক্ষেত্র ছাড়া, শিক্ষণেরই শিক্ষা। কিন্তু, বিশেষ পরিবেশের বিশেষ বৃত্তির জীবন ছাড়া সাধারণ জীবন বলে কিছু হয় না বলে প্রাথমিক শিক্ষাতেও শিক্ষণের বিষয় বাদ দেয়া যায় না। আবার, আর-এক দিক থেকে দেখলে, সব বৃত্তি বা কর্ম জীবন থেকেই উদ্ভূত বলে বিশেষ বৃত্তির শিক্ষণেও ব্যাপক ও সাধারণ শিক্ষার কিছুটা না থাকলেই নয়।

৩

সর্বশেষ বিচারে শিক্ষাব্যবস্থার গুণাগুণ নির্ভর করে শিক্ষক-দের যোগ্যতার ওপর। ভালো শিক্ষক না হলে উত্তম শিক্ষা-ব্যবস্থাও ব্যর্থ না হয়ে যায় না। আর, সুদক্ষ শিক্ষক থাকলে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিও অনেকটা শোধরানো যায়। সুতরাং, সর্বপ্রথম দরকার যথার্থ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাকার্যে আকৃষ্ট করে ব্রতী রাখা। তাঁদের যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষণের

ব্যবস্থা রাখা, আর এ-কাজে তাঁদের উৎসাহ বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন পরিবেশ গড়ে-তোলা।

শিক্ষকরা যেমন শিক্ষার উৎকর্ষের সহায়ক তেমনি সমাজের শ্রীবৃদ্ধিরও। সমাজের উন্নতি নির্ভর করে ব্যক্তির গুণের ওপর। আর, ব্যক্তির গুণ হচ্ছে শিক্ষার ফল। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই সমাজের সুব্যবস্থার নির্ধারক। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, হাল আমলের ভারতে, এমন কি, বর্তমান পৃথিবীতেই, শিক্ষক না পান সম্মান, না পান উপযুক্ত প্রতিপত্তি ও পারিশ্রমিক। আর, দুঃখের ব্যাপার এই যে, শিক্ষকের নিজেরই আর তেমন আস্থা নেই তাঁর বৃত্তির ওপর। সমাজ তাঁকে যে-অবস্থায় রেখেছে তা-ই তিনি মেনে নিয়ে চলছেন।

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের শ্রেয়বোধই অনেকটা গেছে ভেঙে। শিক্ষকের প্রতি ঔদাসীন্য-অশ্রদ্ধা তারই এক প্রকাশ। এখনকার সমাজ জিনিসের মূল্য পরিমাপ করে বৈষয়িক মানদণ্ডে। অর্থ আর ক্ষমতা দিয়ে এখন মানুষের যোগ্যতা বিচার করা হয়। অতীত ভারতে ক্ষমতাহীন ও দরিদ্র হলেও শিক্ষক সম্মান পেতেন যথেষ্ট; একালের ভারত কিন্তু অর্থসামর্থ্যকেই বেশি মূল্য দিতে শিখেছে। শিক্ষককে সে সামান্যই মূল্য দেয়। আশ্চর্য লাগে এই অবস্থার কথা ভেবে। বৈষয়িক দৃষ্টির বিচারেও এটা কেমন লাগে যে, যাঁরা দায়িত্বহীন বা অযোগ্য হাতে দামী যন্ত্রপাতি দিতে চান না তাঁরা দেশের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি কি করে অপটু ও অল্পবেতনভোগী শিক্ষকদের হাতে দেন! একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক একবার বলেছিলেন, সমাজ যেমন শিক্ষকদের উপবাসী রাখে, তাঁরাও তার প্রতিশোধ নেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে বঞ্চিত রেখে। কথাটা ভালো নয় সত্যি, কিন্তু, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, এই ভাবটাই আসল অবস্থার স্বরূপ।

আমাদের দেশে যখন কোন মানুষ তরুণ বয়সে শিক্ষকতা-বৃত্তি

গ্রহণ করেন তখন তাঁর মন নৈরাশ্যে-বিষাদে হয়ে-ওঠে বিরক্ত। তরুণ-চিত্তে ভাঙন ধরাতে অনাস্থা ও নৈরাশ্যের মতো দ্বিতীয় বস্তু নেই। তাই, একথা বলা চলে যে, যে-সমাজ তার শিক্ষকদের অবহেলা করে ও হীনাবস্থায় রাখে তার বর্তমানের উন্নতির ভিতও যেমন আল্‌গা করে ফেলে তেমনি ভবিষ্যতের অগ্রগতিরও।

এদেশে যে শিক্ষকরা নিজেদের ওপরও আস্থা হারিয়েছেন সেকথা সত্যি। কিন্তু তা তাঁদের নিজেদের দোষে নয়। সমাজের মূল্যবোধ গেছে বদ্‌লে ; তার ফলে তাঁদের আপন বৃত্তি-বিষয়ে মনোভাব হয়েছে পরিবর্তিত। অন্যান্য অধিকাংশ মানুষের মতো তাঁরাও হয়ে পড়েছেন অর্থমনা। এই বিশ-ত্রিশ বছর আগেও ভারতে এমন অনেক শিক্ষক ছিলেন যাঁরা অবস্থার অসাচ্ছল্য সত্ত্বেও সম্মানিত হতেন চরিত্রগুণে। এমন শিক্ষকের সংখ্যা এখন খুব কম। এখন আবার তার জায়গায় এইটেই দেখা যায় যে, শিক্ষকরা ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মন জুগিয়ে চলেন।

এই অবস্থার জন্যে কেবল সমাজই যে দায়ী তা বলা চলে না। শিক্ষকও কম দায়ী নন। তিনিও তাঁর বৃত্তির মহত্ত্বের কথা ভুলে গেছেন। আদর্শচ্যুতির মতো শোচনীয় ব্যাপার আর হয় কিনা সন্দেহ। দৈন্য আর সামাজিক অবহেলা এই অবস্থাকে হীনতর করেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সেইটেই যে শিক্ষকের দুরবস্থার একমাত্র কারণ তা বলা যায় না। শিক্ষাবৃত্তির সম্বন্ধে কোন ধারণা না নিয়েই অনেকে শিক্ষকতা করতে আসেন। তাঁরা যে শিক্ষক হন সে কেবল আর-কিছু করতে না পেরে। সেইজন্যেই দেখা যায়, অন্যক্ষেত্র হতে বিতাড়িত, অযোগ্য ও হতাশ্বাস বহু ব্যক্তি শিক্ষকতা-বৃত্তি নেন, আর, একরকম অনন্যোপায় হয়েই এই বৃত্তি আঁকড়ে থাকেন। এরকম অবস্থা যতকাল থাকবে ততকাল শিক্ষকদের অবস্থা তথা শিক্ষার মান কেমন করে উন্নত হবে?

শিক্ষার সংস্কার-ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত শিক্ষকদের কাজকর্মের ওপর

নির্ভর করবে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জাতির গঠয়িতা। যোগ্য এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষক না থাকলে শিক্ষাসংস্কারের উত্তম পরিকল্পনাও অকেজো হতে বাধ্য। সামাজিক প্রগতির পরিকল্পনাও যোগ্য কর্মীর অভাবে ব্যর্থ না হয়ে পারে না। কাজই উন্নতির বিধায়ক। কর্মের সাধক ও সহায়ক হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজ-গঠনে যদি কারো দাম সবচেয়ে বেশি থাকে তো সে শিক্ষকের। তাঁরাই উত্তর-পুরুষদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলবেন। সমাজের আদর্শ হবে এমন-সব তরুণ কর্মী গড়ে-তোলা যাদের থাকবে সক্রিয়, ত্বরিতকর্মা মন, থাকবে অনুভূতিশীলতা এবং হাতের কাজে যথেষ্ট তৎপরতা। এই জন্যে যথাসাধ্য প্রয়াস করাও বাঞ্ছনীয়। এই কাজগুলো যাতে সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পায় তার জন্যে দরকার ভালো-ভালো মানুষের। শিক্ষকরা হবেন সেইরকম মানুষ। শিক্ষাদান মানে সংবাদদান নয়। এ সেই এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে জলঢালা নয়। বরং বলা চলে যে, শিক্ষাটা কতকটা একটি দীপ থেকে অনেকগুলি দীপ জ্বালার মতো। যে-শিখা থেকে অন্য দীপ জ্বালা হবে তা যদি বেশ জ্বলন্ত-জীবন্ত না থাকে তবে তা দিয়ে সারা দেশে আলো জ্বালা যাবে কেমন করে?

শিক্ষাব্যাপারে সবচেয়ে যেটা বেশি দরকারী জিনিস সেটা হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। উভয়ের সহযোগে যে-সত্যসন্ধান এবং জ্ঞানসাধনা চলবে তার জন্যে এই সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। এই বস্তুটির অভাব হলে শিক্ষা হবে যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ, তা সে শিক্ষকদের মাইনের হার যতই উঁচু হোক, যতই ব্যাপক হোক শিক্ষণ-ব্যবস্থা, আর, যতই আধুনিক হোক শিক্ষার উপাদান-উপকরণ।

একথা না বলে পারা যায় না যে, শিক্ষকের কাজ যতই দায়িত্বপূর্ণ হোক না কেন, তার পারিতোষিকও আছে। সব

মানুষই চায় আত্মপ্রকাশ কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী সকলেরই অনুপ্রাণনা আত্মপ্রকাশের। এঁদের সবার আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, আত্মোপলব্ধির মতো আর আনন্দ নেই। শিক্ষকেরও আছে সেই আত্মপ্রকাশের বিপুলতম সুযোগ। হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করবার নয় যে, তাঁর দৈনন্দিন কাজে আছে বিস্তর আনন্দহীন গতানুগতিকতা, কিন্তু একথাও মানতে হয় যে, তাঁর সেই কাজে মাঝে-মাঝে ঝলকে ওঠে এমন-সব মুহূর্ত যা অভাবনীয়ত্বের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত। সব যথার্থ শিক্ষকই পেয়ে থাকেন এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার স্বাদ। তাঁরা তখন বুঝতে পারেন যে, অনেক দিনের অনেক গ্লানি ও ম্লানিমা মুছে গেল অমন অভূতপূর্ব মুহূর্তের উদ্‌ভাসনে।

মানুষে-মানুষে সম্পর্কে আছে কিছু-কিছু নবসৃষ্টির আয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তার অন্যতম প্রকাশ। কোন বিধিবিধান দিয়ে তাকে বাঁধা যায় না। অবশ্য, সব সময়ে যে শিক্ষকরা এই দুর্লভ সৃজনের আয়োজন-প্রেরণা নিয়ে থাকতে পারেন তা নয়; ক্বচিৎ কখনও তার সুযোগ আসে। বৈষয়িক দৈন্যই অনেক সময় তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। যে-অবস্থায় তাঁদের কাজ করে চলতে হয় তা এককথায় বলা চলে শোচনীয়। ধরা যাক পাঠনকক্ষে পোড়োদের সংখ্যার কথা। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় কক্ষের আয়তনের তুলনায় তবে শিক্ষক ভালো হলেও সুবিধা করতে পারা সম্ভব নয়। পাঠন-সময় যদি যায় সামর্থ্যকে ডিঙিয়ে, বেতন যদি হয় জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার পক্ষেও অল্প তবে শিক্ষক তাঁর যথাসাধ্য শিক্ষাদানের প্রয়াস করতে কিছুতেই পারেন না। কিন্তু এই-সব বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষক এমন কিছু দিতে পারেন শিক্ষার্থীদের, যার জন্যে তারা থাকবে চিরকৃতজ্ঞ।

৪

সর্বজনীন শিক্ষাধিকারের নীতিটি গৃহীত হয়েছে এই হাল আমলে; এটি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। একে গণতন্ত্র-বোধেরই এক উপধারা বলা যেতে পারে। গণতন্ত্রের মূলকথা হল এই যে, বিধানের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই সমান। কিন্তু, সব মানুষ যদি নিজ-নিজ যোগ্যতা-ক্ষমতা ফুটিয়ে তোলার সমান সুযোগ না পায় তো শুধুমাত্র বিধিবিধানে আর কাগজপত্রে সাম্যনীতি স্বীকৃত থাকার কোন মানে হয় না। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, গণতন্ত্রকে পূর্ণ ও কার্যকর করে-তোলবার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষা। সহজাত শক্তি-সামর্থ্যের তারতম্যে মানুষে-মানুষে তফাত হয় বটে, কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার ওপর এই পার্থক্য নির্ভর করে না। প্রত্যেক মানুষকে যদি পূর্ণ বিকাশের অধিকার দিতে হয় এবং গণতন্ত্রকে যথার্থ সার্থক হতে হয় তবে শিক্ষাকে করতে হবে অবৈতনিক ও সর্বজনীন।

তাই একালে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। আর্থিক ও অন্যান্য কারণে অবশ্য কোন রাষ্ট্রই এক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া এখনও অবধি সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব ব্যবস্থা করতে পারে নি। যে-সব দেশে বহু বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি আছে সেখানে তাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। এ-ব্যবস্থার বাইরে আছে মানুষের নিজেদের করা সুযোগ-ব্যবস্থা। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমাজ এবং শিক্ষা-সচেতন দেশেও মাত্র ১৬ বছর বয়স অবধি বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সুযোগ-সাম্যের দাবিও হয়ে উঠছে তীব্র। এতে করে দু'ভাবে শিক্ষাসুযোগ বাড়াতে হচ্ছে রাষ্ট্রকে: এক, যে-সব অঞ্চলে বা লোকেদের শিক্ষার সুযোগ আগে ছিল না রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের সুযোগ-ব্যবস্থা করা; দুই,

সকলেরই শিক্ষার কালপর্ব রাষ্ট্রকে বাড়াতে হচ্ছে একটু-একটু করে। যুক্তরাজ্যে শিক্ষার কালপর্ব বাড়াবার কথা হয়েছে, হয়েছে সর্বস্তরে আরও বৃত্তিব্যবস্থা করা। এই-সব প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের শিক্ষা-মনস্কতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারত নিয়েছে গণতন্ত্রী সংবিধান। অতএব, শিক্ষাসুযোগের সাম্যনীতিও যে সে গ্রহণ করেছে তা মানতে হয়। ভারতে আগে যে-সব অঞ্চলের লোক কখনও শিক্ষার সুযোগ পায় নি এখন তারা চাইছে তার বিশেষ সুযোগ-ব্যবস্থা—যাতে করে তারা শিক্ষায় অগ্রসর লোকদের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে সমান অবস্থায়। বাধ্যতার নীতিও ধীরে-ধীরে গৃহীত ও প্রসারিত হচ্ছে। গত সাত বছরে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার হয়েছে বিস্তর। এর কালপর্বও হচ্ছে বাড়ানো। এখনও অবধি বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স-সীমা নির্ধারিত আছে ১০—১১। কিন্তু, একথা এখন সকলেই মানেন যে, এ-সীমা বাড়িয়ে ১৪ করা উচিত। আমাদের সংবিধানেও স্বীকৃত হয়েছে তা। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলতেন যে, তাঁর মতে প্রত্যেক নাগরিকের বিশেষ অধিকার থাকা উচিত মাধ্যমিক স্তর অবধি অবৈতনিক শিক্ষা পাওয়ার। ভারতে এখন বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার হচ্ছে স্থান ও কাল উভয়ত্রই।

সেকালের মানুষের সঙ্গে একালের মানুষের সামাজিক পরিবেশের পার্থক্য ঘটেছে বিস্তর। এখন সমস্যা বেড়ে গেছে কত! আগেকার কালে সমাজের নেতৃত্ব ছিল অল্পসংখ্যক লোকের হাতে। বেশির ভাগ লোক শুধু তাদের অনুসরণ করেই ক্ষান্ত থাকত। গণতন্ত্র-প্রসারের সঙ্গে পরিস্থিতি গেছে বদ্‌লে। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে এখন সব নাগরিককে অংশ গ্রহণ করতে হয়। একালে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি হয়েছে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই

আগেকার চেয়ে সাধারণ মানুষেরও এখন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-নির্ধারণের দায়িত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীর এই সংকট-কালে মানুষকে যদি পূর্ণদায়িত্ব পালন করতে হয় তবে প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ থাকা চাই। সব মানুষই যে সমানভাবে সে-দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা নয়। এইজন্যে নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা এই যোগাযোগ-রক্ষার কাজ করবে কতকগুলি মধ্যস্থ নেতা তৈরি করে। এই মধ্যস্থ নেতারা অগ্রণী নেতাদের কল্পনা-পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে দেবেন জনসাধারণকে, আবার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভাবনার কথা জানিয়ে দেবেন অগ্রণী নেতাদের। এই কথাটা বুঝলে বুঝতে পারা যাবে কেন মৌলানা আজাদ সব নাগরিককে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাও দেবার পক্ষপাতী ছিলেন।

শিক্ষার এলাকার স্থান ও কালগত এই যে প্রসার—এ আধুনিক যুগে দরকার আরও বেশি। কেননা, এখন বিভিন্ন সমাজ ও ব্যক্তি এসেছে আরও কাছাকাছি। সব-কিছুরই পরিবর্তন হয়ে চলেছে অবিরাম। সমাজ ও ব্যক্তিরও তাই। অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধিতে ও নব-নব জ্ঞানের অর্জনে পরিবর্তন হয়ে চলছে মানুষের। কালের গতির ফলে বদলে যাচ্ছে সমাজের রূপও; বদ্‌লাচ্ছে ব্যক্তির পরিবর্তনের ফলেও। আমরা আমাদের সন্তানের সামনে আমাদের রীতিনীতি ও আদর্শ তুলে ধরতে পারি, কিন্তু তারা তো সে-সব তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবেই। এই যে নতুন দৃষ্টিতে দেখা এ-ও তো এক রকমের পরিবর্তন। ব্যক্তি ও সমাজ কিছুটা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকলেও তা ঘটবে। আর, যেখানে বিভিন্ন ধারার কৃষ্টি ও সভ্যতায় মেশামিশি হবে সেখানে তো পরিবর্তনের গতি হবে দ্রুততর ও সুদূরপ্রসারী।

আধুনিক যুগে মানুষে-মানুষে বাহ্য সান্নিধ্য হয়েছে বেশি, কিন্তু ভাবিক ও মানসিক ব্যবধান থেকেই যাচ্ছে। এ এক হেঁয়ালি এ-যুগের। কিন্তু এই মানসিক ও ভাবিক ব্যবধান সরিয়ে না ফেললেই নয়। এখন বিভিন্ন পরিবেশের ও ভাব-ধারার সমাজ যদি পরস্পর না মিশতে পারে তবে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর, এখন সংঘর্ষ বাধলে তা হবে সাংঘাতিক। সব সমাজই যদি কিছু-কিছু আপস-রফা ও সমঝোতা করতে না শেখে তবে সংঘর্ষ এড়ানো কঠিন। কালের পরিবর্তন-প্রবাহকে ঠেকাতে গেলে সে-প্রবাহ হবে ভীষণতর; তার ফলে দেখা দিতে পারে বিপ্লব ও উৎক্রান্তি। পরিবর্তন যখন অনিবার্য তখন তাকে রুখ্‌তে যাওয়া মূঢ়তা। তবে, শিক্ষার কাজ হবে এমন অবস্থা ও পরিবেশ গড়ে-তোলা যাতে বাধাবিপত্তি না ঘটে সমন্বয়-সামঞ্জস্য হতে পায়।

গণতন্ত্রের প্রসারের দরুন বিশৃঙ্খলা-বিপত্তি ঘটতে না দিয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা বেড়েছে। যেখানে সুযোগ-সুবিধার অধিকারী সংখ্যালঘু দল, সেখানে তারা তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আবার, যারা সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত তারা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী হয়ে ওঠে। ফলে অ-গণতন্ত্রা সমাজে দ্বন্দ্বের ভাব দেখা দেয়। এই অবস্থার কথা ভেবেই মার্ক্‌স্‌ বলেছিলেন, সামাজিক পরিবর্তনের মূলকথাটা হল শ্রেণীসংঘর্ষ। অবশ্য, মার্ক্‌স্‌ এবং এংগেল্‌স্‌ দু'জনেই স্বীকার করেছিলেন যে, গণতন্ত্রী সমাজে বিষম সংঘর্ষ না বাধিয়েও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন করা যায়।

'বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও ইসলাম' (*'সায়েন্‌স্‌, ডিমোক্রাসি অ্যান্ড্‌ ইসলাম'*) গ্রন্থে আমি দেখিয়েছি বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কি বিপত্তি হতে পারে। সমাজে ভারসাম্য আনবার পক্ষে বিপ্লব বিবর্তনের চেয়ে নিকৃষ্ট উপায়।

বিপ্লব যে সব সময়ে সফল হবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। আর, তা যদি সফল হয়ও তবু তাতে বিরোধের ভাবটা থেকেই যায়। তার ফলে আবার বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সামাজিক পরিবর্তন আনার পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায় যে বরণীয় তার এই হচ্ছে প্রধান কারণ।

বাস্তবিক পক্ষে একথা জোর করে বলা যায় যে, গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যথার্থ ও স্থায়ী প্রগতি আনা সম্ভব নয়। একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রসার লাভ করেছে যে, অন্তত পক্ষে অল্পকালে প্রগতি করতে হলে গণতন্ত্রের চেয়ে ডিক্‌টেটরশিপ বেশি কার্যকর। কিন্তু ইতিহাসে তার প্রমাণ মেলে না। যেখানেই গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রী সমাজের সংঘর্ষ বেধেছে সেখানেই শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রেরই জয় হয়েছে। এটা যে আকস্মিক ব্যাপার তা নয়; ব্যক্তি ও সমাজের স্বভাবেই তার শিকড় গেড়ে আছে। বহু মানবের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন মহৎ কার্য সাধিত হতে পারে না, আর, এই সহযোগিতা স্বৈরতন্ত্রী সমাজে কখনই থাকতে পারে না। গণতন্ত্রী সমাজে প্রথম-প্রথম কিছু সংকোচ ও বিলম্ব দেখা যায় বটে, তবে এতে যে অপকার হয় না ইতিহাসে তার প্রমাণ মেলে। গণতন্ত্রী সমাজে যে সংকোচ ও বিলম্ব ঘটে তার কারণ কোন্ নীতি অবলম্বনীয় তা অনেকেই ঠিক জানেন না। এতে আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ হয় বটে, তবে তাতে অনেক সন্দেহ-সংশয় এবং অনিশ্চয়তাও হয় অপসারিত। চরম কথা হল এই যে, গণতন্ত্র যদি যথার্থ সক্রিয় হয় তবে তার সহযোগী কর্মীদের মধ্যে একটা মূল মতসংগতি নিশ্চয়ই আসে।

ডিক্‌টেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্রে এরকম লক্ষ্যের মতসংগতি আশা করা যায় না। এমন কি, অনেক সময় মোটামুটি *বোঝাপড়াও হয়ে ওঠে না। এইজন্যেই কি সমরে, কি শান্তিতে*

ডিক্‌টেটরশিপ তেমন কার্যকর হয় না। কোন সামাজিক আন্দোলন কি সামরিক অভিযান যতদিন সাফল্যের সঙ্গে চলতে থাকে ততদিন ডিক্‌টেটরশিপের গলদগুলো চাপা থাকে। এইরকম বিজয়-কালে দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা মত-নির্ধারণে উৎসুক ও ইচ্ছুক হন; ডিক্‌টেটর তাঁদের বাধা দিতে চান না। তার কারণ এই যে, যখনই কোন ভুলচুক হয় তখন তিনি তা চাপিয়ে দেন অধীনস্থ নেতাদের ওপর। কোন ব্যর্থতা তিনি তাঁর নামে আরোপিত হতে দিতে চান না। ভাবটা হচ্ছে এই যে, ডিক্‌টেটর কোন ভুল করতে পারেন না, তাঁর ভ্রান্তি মানে ধ্বংস। তাই সংকটকালে তাঁর অনুগামীরা নিজেদের মতে কাজ করতে সাহস পান না। এমন কি, ডিক্‌টেটরের অভিপ্রায়ের বিষয় স্পষ্ট করে জানতেও তাঁরা ভয় পান। কোন জিজ্ঞাসা বা অনুরোধকে তিনি প্রায়ই তাঁর নীতি ও মতের সমালোচনা এবং তাঁর ওপর সন্দেহ ও অবিশ্বাস-পোষণ বলে মনে করেন। কোন ডিক্‌টেটরই তাঁর কর্তৃত্ব-বিষয়ে কোন আলোচনা বা বিচার সইতে চান না। এই কারণেই কোন ডিক্‌টেটরশিপ সাময়িক-ভাবে সাফল্য-গৌরবে ভাস্বর হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত তাকে গণতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। কোন শাসনতন্ত্রে যদি আলাপ-আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ না থাকে তো তাতে মত ও লক্ষ্যের ঐক্য এবং বোঝাপড়া থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এখানেই ডিক্‌টেটরশিপের দোষ। ফতোয়া জারী হয়ে গেল, কিন্তু কী যে তার তাৎপর্য তা জানতে চাওয়ার সাহসও প্রায় কারো হয় না। ডিক্‌টেটরের অধীনে বিভিন্ন স্তরের নেতারা আপন-আপন বুদ্ধিশক্তি-অনুযায়ী তার অর্থ গ্রহণ করেন। তাতে অনেক সময় অবস্থা এমনও দাঁড়ায় যে, আদেশের আসল অর্থ-অনুসারে কাজ হয় না। গণতন্ত্রে একটা কথা

বারবার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এই জন্যেই তাতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সাধারণত দেরি হয়। কোন অপসিদ্ধান্ত যাতে নেয়া না হয় বা কোন ভ্রান্তি না ঘটে তাই এই বিলম্বিত আলোচনা-ব্যাখ্যা। এই নীতি বর্জন করে ডিক্‌টেটরশিপ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে, কিন্তু তাতে প্রায়ই ভ্রান্তি-বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে।

শিক্ষার মূলকথাই হল এই আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে কখনও-কখনও বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষা হচ্ছে এক বিশদ সংলাপ: সংলাপ অতীতে ও বর্তমানে, সংলাপ বিভিন্ন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মানুষে-মানুষে। শিক্ষা কী করে?—শিক্ষা বহুযুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সম্পদ এনে দেয় মানুষের কাছে। শিক্ষা তেমনি মানুষে-মানুষে যোগাযোগ স্থাপিত করে। এই যোগাযোগ-প্রতিষ্ঠা এবং বোঝাপড়াই হচ্ছে শিক্ষার সারতত্ত্ব; গণতন্ত্রেই তার বিকাশের উৎকৃষ্টতম সুযোগ।

অশিক্ষিত ব্যক্তি বাস করে তার সংকীর্ণ পরিবেশের গণ্ডিতে। শিক্ষা তার স্ব-পরিবেশের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে তাকে মুক্ত করে সংকীর্ণতার বন্ধন থেকে। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব-বিষয়ে। শিক্ষার কল্যাণে মানুষ বর্তমানকে দেখতে পারে অতীতের আলোকে। কেন যে দেশে-দেশে কালে-কালে বিভিন্ন পরিবেশে আদর্শ ও নীতির বিশ্বাস ও সংস্কারের পার্থক্য ঘটে মানুষ তা বুঝতে পারে শিক্ষার ফলে। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, শিক্ষার কাজ হল মানুষের সহানুভূতিকে উদার ও প্রশস্ত করে-তোলা আর কল্পনাকে বিচারের আলোকে দীপ্ত করা। এর উদ্দেশ্য হল চিরন্তন সত্যসমূহের নিত্যতা মেনে নিয়ে পরিবর্তনের অনিবার্যতা-বিষয়ে অবহিত করা। এই-সব

সত্যের স্বীকৃতিই হল আধ্যাত্মিকতার সারতত্ত্ব। শিক্ষার কাজ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করা। কেমন করে?—মানুষকে সব যুগের সকল মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী করে।

ফেব্রুআরি, ১৯৫৪

উত্তরলেখ

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী নায়ক মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যু হয়। তিনি যে স্বাধীন ভারতের শুধু প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তা-ই নয়, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও অন্যতম অধিনায়ক। স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতির সর্বাগ্রগণ্য নির্দেশক ছিলেন তিনিই। খ্রীস্টীয় ১৯২১ সাল থেকে শিক্ষা ছিল ভারতের প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যবস্থাপনীয় বিষয়। শিক্ষা-বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের আবশ্যকতা তখন তেমন উপলব্ধ হয় নি। মৌলানা আজাদ কিন্তু তা উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র তাঁর তৎপরতা ছড়িয়েছিল। তাঁর লোকান্তর-গমনের পর ভারতীয় শিক্ষার সমৃদ্ধি ও সংস্কারের একটি ধারার ছেদ ঘটল। তাই, এই উত্তরলেখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল একটি করুণ অথচ বিশিষ্ট ভাব।

১

আগেকার অধ্যায়গুলিতে শিক্ষার যে-অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে তা সব ক্ষেত্রেই আছে অব্যাহত। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে তো পোড়োদের সংখ্যা ক্রমেই বেশ বেড়ে চলেছে। ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের প্রায় শতকরা ৫৫ জন বিদ্যালয়ে যায়। বোম্বাই, কেরল, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলিতে তো শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বেশি। এই সব দেখে-শুনে মনে হয়, অন্তত কতকগুলি রাজ্যে অল্পকালমধ্যে সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে।

ভবিষ্যতের পক্ষে আরও আশা-ভরসার কথা এই যে, শিক্ষার

উৎকর্ষ বাড়াবার চেষ্টা চলছে ঐকান্তিক ভাবে। একথা এখন উত্তরোত্তর বেশ স্বীকৃত হয়ে চলেছে যে, শিক্ষার উৎকর্ষ-বৃদ্ধি নির্ভর করে শিক্ষকের গুণের ওপর। গত তিন-চার বছরে শিক্ষকদের মাইনে, যোগ্যতা এবং সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে শিক্ষকদের উৎকর্ষ বাড়াবার চেষ্টা ক্রমে-ক্রমে বেড়েছে। এই ধরনের উৎকর্ষ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে এসেছে রাজ্যসরকারগুলিকে অর্থসাহায্য দেবার জন্যে। একথা অস্বীকার করবার নয় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও বহু কাজ পড়ে আছে এবং অবস্থাটা খুব সন্তোষজনক না হলেও সমাজের অসাড়তা কেটে গিয়ে যে একটা সাড়া পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর-একটি উন্নতির কথা বিশেষ উল্লেখ্য। স্বাধীনতা-লাভের ঠিক পরের কয়েক বছরে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বুনিয়াদি-শিক্ষার আদর্শ জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করেছিল। অনেকেই চাইছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাধারার জায়গায় বুনিয়াদি-শিক্ষা চালু করা হোক। এই উৎসাহ কাউকে-কাউকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, তাঁরা নির্বিচারে পুরাতন শিক্ষাধারার নিন্দা করতে লেগেছিলেন। এতে কিন্তু শিক্ষকদের অনেকের ভেতরই একটা বিরক্তি ও বিরোধের ভাব-সৃষ্টি হয়েছিল। এইরকম প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি। তাই পুরাতন-পন্থী ও সংস্কার-পন্থীদের মধ্যে একটা অনাবশ্যক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভাব দেখা দিয়েছিল।

এখন সে-ভাব একটু-একটু করে সরে-যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। একথা এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে শিক্ষকের গুণ-যোগ্যতার ওপরেই শিক্ষার যাথার্থ্য নির্ভর করে। শ্রীজওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন যে, তিনি কোন বিশেষ লেবেল-মারা শিক্ষাধারা চান না; তিনি চান এমন শিক্ষা

যা দেশের ছেলেমেয়েদের মনে জাগাবে আত্মনির্ভরতা, নীতিবোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর এ-মত সাধারণ-বোধ-সম্পন্ন সব মানুষেরই মত।

এর ফলে পুরাতন ও নবীন দৃষ্টিভঙ্গীর এক সমন্বয় ঘটেছে। বুনিয়াদি-শিক্ষার সমর্থকেরাও যেমন তাঁদের অতিবাদী মনোভাব বর্জন করেছেন, পুরাতন পন্থীরাও তেমনি বুনিয়াদি-শিক্ষার ব্যবহারিকতার মূল্য স্বীকার করেছেন। পুরানো ধারার বিদ্যালয়গুলোতেও এখন হাতের কাজের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হতে দেখা যাচ্ছে, আবার, বুনিয়াদি-বিদ্যালয়গুলিতেও গ্রন্থ-ব্যবহারের আবশ্যকতা স্বীকৃত হচ্ছে।

এই দুই ধারার শিক্ষকদের মধ্যেকার বিরোধী মনোভাবও অপসারিত হয়ে চলেছে। পুরাতন ধারার শিক্ষকদের বিরোধী মনোভাবের জন্যেই বুনিয়াদি-শিক্ষা প্রথম-প্রথম প্রসারিত হতে বাধা পেয়েছিল। দুই ধারার শিক্ষকদের বেতনের হারের পার্থক্যও বিরোধ বাড়িয়ে তোলার কারণ হয়েছিল। এই পার্থক্য এখন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে; এখন শুধু শিক্ষকদের গুণ-যোগ্যতার মাপে বেতন নির্ধারণ করার নীতি গৃহীত হয়েছে।

সারা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় নিরূপণ-নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে যে-নিখিল-ভারত প্রাথমিক শিক্ষা-সংসদ গড়া হয়েছে তা খুব ভালোই হয়েছে। এই শিক্ষার নানা সমস্যা-বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে এবং শিক্ষা-পরিদর্শক, ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের শিক্ষণের সুবিধার জন্যে একটি জাতীয় বুনিয়াদি-শিক্ষা-নিকেতনও স্থাপিত হয়েছে। এই ধারার শিক্ষার ধারাবাহিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা-আলোচনা হলে এর শিক্ষা-রীতির উন্নতি এবং দোষত্রুটির অপসারণ হতে বাধ্য। আশা করা যায় যে, এই-সব প্রচেষ্টার ফলে বিবর্তিত হবে এমন এক ধারা যার মধ্যে স্থান পাবে পুরাতন ও নবীন ধারার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু।

২

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি লক্ষণীয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে, পোড়োদের সংখ্যাও। ১৯৫৪-তে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ এখন তা বেড়ে হয়েছে ৯০ লক্ষ। ১৯৪৮-এ উচ্চ ও উচ্চতর-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫ হাজারের কম। ১৯৫৬-তে তার সংখ্যা হয়েছে ১১ হাজার।

এই সংখ্যাগত প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে গুণগত উন্নতির প্রচেষ্টা। ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক সম্মেলনে শিক্ষার একটি নতুন ধারার রূপ পরিকল্পিত ও নির্দেশিত হয়। তাতে থাকবে আট বছরের সংহত প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিবিধ-বিষয়-সংবলিত তিন বছরের উচ্চতর-মাধ্যমিক শিক্ষা। তাতে এই নির্দেশও দেওয়া হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে এমনভাবে সংস্কৃত করতে হবে যাতে বেশির ভাগ পোড়োর পক্ষে একটি ধারার শিক্ষা সমাপ্ত হয় এবং অল্পসংখ্যক বাছাই-করা পোড়োর উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকে।

রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করেই এই নির্দেশগুলিকে কাজে পরিণত করা হচ্ছে। বিবিধ ভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, এবং একটি আবশ্যিক শিক্ষণীয় হাতের কাজের বিষয় নিয়ে একটি মূল কারিকুলাম তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর রুচি-প্রবৃত্তি-অনুযায়ী কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, নির্মাণবিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা এবং গার্হস্থ্যবিজ্ঞানও অতিরিক্ত বিষয়-হিসেবে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হবে। প্রায় ৭৫০রকমের বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় রেখে ৫০০টি বহুবিদ্যা-নিকেতন স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলির ভেতর একশোটি হল উচ্চতর-মাধ্যমিক।

১৯৫৫ সালে নিখিল-ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যবলোকন করা এবং এ-বিষয়ে তৎপর প্রতিষ্ঠানরূপে কেন্দ্রীয় ও

প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে উপদেশ-নির্দেশ দেয়া। এই সংসদে আছেন কয়েকজন শিক্ষাবিশারদ। তাঁদের বলা হয় ফিল্‌ড্‌-অ্যাড্‌ভাইসার বা ক্ষেত্র-পরামর্শক। তাঁদের কাজ হচ্ছে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়া। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ হচ্ছেন রাজ্যসরকারগুলির শিক্ষা-বিভাগের অফিসার। একটা নির্দিষ্ট কাল ধরে তাঁরা এই সংসদে থাকেন। এতে থাকার দরুন সুবিধে হয় এই যে, তাঁরা সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা অবলোকন করতে পারেন। তাঁরা আপন-আপন রাজ্যে ফিরে গিয়ে নিখিল-ভারতীয় পটভূমিকায় রাজ্যের শিক্ষানীতি রচনা ও প্রবর্তনা করতে পারেন। শিক্ষাসমস্যা-সম্পর্কে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের উপদেশ-পরামর্শ পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উপকৃত হতে পারে।

শিক্ষণ-নিকেতনগুলির সঙ্গে কতকগুলি বাছাই-করা বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে-তোলার উদ্দেশ্যে যে-প্রসার-কার্য হয়েছে তা বেশ ভালো ও ফলপ্রদ হয়েছে। ১৯৫৫ সালে এর জন্যে প্রথমে ২৪টি শিক্ষণ-নিকেতন বেছে নেয়া হয়। সেগুলিতে শিক্ষকদের সাপ্তাহান্তিক, অল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া, অনুশীলন ও আলোচনা, প্রদর্শনী, লাইব্রেরি এবং দৃষ্টিশ্রুতি-সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থাও আছে। এই ব্যবস্থা এখন রাখা হয়েছে ৫২টি শিক্ষণ-নিকেতনে; এগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। এই ব্যবস্থার প্রসারে যে সুফল ফলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; সন্দেহ কিছু জেগেছে শিক্ষণ-নিকেতনের এলাকার প্রসার-বিষয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করতে হলে উচ্চ ও উচ্চতর-মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যবিষয়েরও সংস্কার করা দরকার। উচ্চতর-মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করার জন্যে রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্য চেয়েছিল। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক কমিটি গঠিত

হয়। কতকগুলি সাব্-কমিটির সাহায্যে কমিটি অনেকগুলি বিষয়ের সিলেবাস তৈরি করে। এই সিলেবাসগুলি সংক্ষিপ্ত ও নির্দেশক-মাত্র। এগুলি দেখে রাজ্যসরকারগুলি আপন-আপন বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা অনুসারে বিশদ সিলেবাস তৈরি করে নিতে পারবে।

ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যগ্রন্থগুলির লক্ষ্যে যে ঐক্যের অভাব আছে সেকথা এখন অনেকেই স্বীকার করছেন। এ-বিষয়ে শিক্ষাবিদ্, গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের মধ্যে লক্ষ্যের মিল নেই, অনেকসময় তার বিরোধই দেখা যায়। উচ্চতর-মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যগ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে; কিন্তু, এ-অভাব শিক্ষার স্তরেই অনুভূত হয়। কোন-কোন রাজ্যসরকার গ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করে সমস্যাটির সমাধান করবার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টার যেমন উৎসাহী সমর্থক আছে, তেমনি আছে বিরূপ দোষদর্শী। পাঠ্যপুস্তকের বিবিধ সমস্যা-বিষয়ে গবেষণা এবং বে-সরকারী প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও রাজ্যসরকারগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় পাঠ্যপুস্তক-গবেষণা-বিভাগ খোলা হয়।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা-পরিষদ-প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠের বিষয়-বৈচিত্র্য মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে প্রবর্তিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার পোড়োদের সুযোগ দেয়া। কিন্তু, তাদের যথাযোগ্য বিষয়ে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা না থাকলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ার আশা নেই। ঐ-কেন্দ্রীয় পরিষদটি গঠিত হয় শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা-বিষয়ে গবেষণা, পরিচালক-সহায়কদের শিক্ষণ এবং দেশের প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীদের প্রবণতা-অনুযায়ী পরিচালনার বিহিত পরিকল্পনার

উদ্দেশ্যে। এর পর কতকগুলি রাজ্যে এইরকম পরিচালন-পরিষদ গঠিত হয়েছে।

আর, ব্যবস্থা করা হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধির এবং শিক্ষকতা-কার্যের অবস্থার উন্নয়নের: উদ্দেশ্য হল যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিদের এই বৃত্তিতে আকৃষ্ট করা। প্রাথমিক শিক্ষার মতো এ-শিক্ষার অবস্থাও এ-বিষয়ে খুব সন্তোষজনক নয়। কিন্তু, এ-আশা করা অন্যায় হবে না যে, অবিলম্বে শিক্ষকদের বড়ো রকমের অযোগ্যতাগুলো অপসারিত হবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও সমস্যাটি হচ্ছে পরিমাণগত প্রসারের সঙ্গে গুণগত উন্নতির সামঞ্জস্যবিধান করা। একথা মানতেই হবে যে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ায় এমন অনেকের পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছে যারা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশেরও আশা করতে পারত না। এই সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মান কিছু কমেছে নিশ্চয়। কিন্তু এর চেয়ে ভাবনার কথাটা হল এই যে, শিক্ষা-প্রসারের জন্যে বেশি শিক্ষকের দরকার হচ্ছে, আর, প্রয়োজনমতো যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনেক অযোগ্য ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে টেনে আনতে হচ্ছে শিক্ষকতার কাজে। দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় যোগ্য লোকেরা চলে যাচ্ছেন সেদিকে। সেখানে পারিশ্রমিকের হার বেশি হওয়ায় তাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনের শিক্ষকতার কাজে আসতে চাইছেন না। সাধারণত সব বিষয়েরই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও নির্মাণবিজ্ঞান-বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকের অভাব যে আরও বেশি, সেকথা তো সহজেই বোঝা যায়। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সব বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়ার ব্যবস্থা না হলে শুধু যে শিক্ষার মান নেমে যাবে তা-ই নয়, সমগ্র দেশের সবরকম শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের পথও হবে রুদ্ধ।

৩

বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাম্প্রতিক উন্নয়নের বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুর কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান-হিসেবে প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৩ সালে হয় এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৪-তে এর ক্ষমতা ও কাজকর্ম বাড়িয়ে দেয়া হয়। ১৯৫৬-র ৫ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুর কমিশন আইন-অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বিধিসংগত ক্ষমতা পায়। এই বিধানের বলে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার মান-উন্নয়নের সবরকম উপায়-নির্ধারণের এবং ব্যবস্থা-নির্দেশের ক্ষমতা পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপন, পরীক্ষা-ব্যবস্থা এবং গবেষণা-কার্য-পরিচালনা তার ক্ষমতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। ঐ-বিধান-অনুযায়ী কাজ করার জন্যে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়ে খোঁজ নিতে পারে এবং দরকারী টাকার বরাদ্দও করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুর কমিশনের উদ্ভবের কথা এক মজার ব্যাপার। এই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা-রক্ষা-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ ও তৎপরতার কথা জানা যায়। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার সামঞ্জস্য-বিধান এবং মান-রক্ষার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভয় হল যে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রস্তাব হল: অর্থ মঞ্জুর করা এবং উচ্চতর শিক্ষা-সংসদের কাজগুলি করার জন্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হোক। একটা খসড়া বিল আগেই তৈরী হওয়া সত্ত্বেও ঐ-নির্দেশ গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিধা করে নি। তারই ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্দেশ-অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুর কমিশন-বিধি অনুমোদিত হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও শিক্ষকের অভাব-জনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন হওয়ায় বহু যোগ্য ব্যক্তি নিচ্ছেন তার কাজ। আরও অনেকে যাচ্ছেন প্রশাসন-বিভাগের কাজে। এই-সব কাজের পারিশ্রমিক বেশি। তাই অনেকক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করতে হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতার লোকদের। আরও ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে অন্যান্য কাজে চলে-যাওয়া। তাই, এই কমিশন গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হয়েছে। কমিশন যে-টুকু করেছে তাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তুষ্ট হয়েছেন তা নয়, তবে এই কমিশন যে বেতনের হারের বহুতর বৈষম্য দূর করেছে এবং বহু অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করছে তা না মেনে উপায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষকদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। অনেক শিক্ষার্থীই শিক্ষা নিত কলেজে। কলেজের সংখ্যাও বেড়ে গেল বেশ। কিন্তু শিক্ষার মান উঁচু না হয়ে বরং নেমে গেল। যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষকের অভাব, উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরির অভাব, যথেষ্ট স্থানের অভাব—এই-সব নানা অসচ্ছলতার দরুন কলেজী শিক্ষার মান গেল নেমে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কলেজের শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করা প্রথম কর্তব্য বলে মনে করেছে।

কমিশন বুঝেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার স্তরে বর্তমান ব্যবস্থাগুলি যাতে ঠিকমতো থাকে এবং আরও ভালো হয় তা দেখা দরকার। কলেজগুলির লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরিগুলো যাতে ভালো হয় তার জন্যে গোড়া থেকেই কমিশন মোটা মোটা টাকার

বরাদ্দ করেছে। হস্‌টেল ও শিক্ষকদের বাসা-নির্মাণের জন্যেও বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদিত কলেজগুলিকে মোটা মোটা টাকা ধার দেয়াও হয়েছে।

বিগত চল্লিশ বছর ধরে ভারতের শিক্ষা-সংস্কারকরা তিন বছরের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা বলে আসছেন। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিশন পাস ও অনার্স-বিষয়ে তিন বছরের প্রথম ডিগ্রার পাঠব্যবস্থা-প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিল। ভারতের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এই নির্দেশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ইন্‌টারমিডিএট ও দু'বছরের ডিগ্রী কোর্স চালিয়ে যাচ্ছিল। গত দশ বছরে এই বিষয়টি আবার আলোচিত হতে থাকে। এখন অধিকাংশের মত হচ্ছে তিন বছরের উপাধি-পাঠের পক্ষে। ১৯৫৫-র জানুআরির শেষের দিকে অনুষ্ঠিত আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষৎ-এর পাটনা অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই নির্দেশ গৃহীত হয়। এই-রকম ঢালাও সমর্থন সত্ত্বেও এই অত্যাবশ্যক সংস্কার নানা কারণে হয়েছে বিলম্বিত। সব বিশ্ববিদ্যালয় এই নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কত ব্যয় হবে তা নিরূপণ করার জন্যে ১৯৫৬-র সেপ্টেম্বর-এ এক কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৫৭-তে কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যায়। এখন কিছু-কিছু করে নির্দেশগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে।

উচ্চশিক্ষার আর-একটা উন্নতির কথা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতা-লাভের পর নগর ও গ্রাম-অঞ্চলের শিক্ষা-সুযোগের বৈষম্য তুলে দেবার দাবি হয়েছে তীব্র। আগে শিক্ষার সুবিধা-সুযোগ বলতে যা-কিছু তা ছিল শহরে-নগরে। 'দি ইন্‌ডিআন হেরিটেজ' ('ভারতীয় উত্তরাধিকার') নামক গ্রন্থে আমি দেখিয়েছি, পল্লী-অঞ্চল থেকে যোগ্য ও সমর্থ লোকেরা শহর-অঞ্চলে চলে-গেলে দেশের সমাজের ভারসাম্য কী ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে পড়বে। পল্লী-অঞ্চলে যোগ্যতার

অবক্ষয় হওয়ায় গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান হয়েছে বিস্তৃত। গ্রামগুলো হতে বসেছে জড়ধর্মী ও মৃতকল্প, আর শহরগুলো হয়েছে আন্দোলন এবং সামাজিক বিক্ষোভের জায়গা।

গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই ব্যবধান সরিয়ে বা অন্তত কমিয়ে-ফেলার প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। পল্লী-অঞ্চলে বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার পরিচয় নিয়ে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ জীবন-মান উন্নত করার মতো উচ্চতর শিক্ষাধারার পরিকল্পনা করার জন্যে ১৯৫৪-তে একটি কমিটি গঠিত হয়। যে-সব গ্রামিক বিদ্যালয় আগে ভালো কাজ করেছে এবং যেখানে অভিজ্ঞ ও অনুরাগী শিক্ষক আছেন সেগুলোর ভেতর থেকে দশটিকে বেছে নিয়ে উচ্চতর গ্রাম্য নিকেতনে পরিণত করার কথা হয়েছে। এই-সব নিকেতনের কাজকর্ম পরিচালন ও পরিলোকন করার জন্যে ১৯৫৬-তে গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষার এক জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। বিভিন্ন মতের লোকদের নিয়ে গঠিত দক্ষ কমিটি দিয়ে সিলেবাস তৈরি করানো হয়েছে। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে সিলেবাসগুলি পরে আবার সংস্কৃত ও উন্নীত হয়েছে।

ভারত এক বিশাল ও বিচিত্র দেশ। নানা তার ভাষা আর সংস্কৃতি। এখানে বিভিন্ন ভাবধারার মিলন খুব সোজা ব্যাপার নয়। প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলির সার্থকতা ছিল এই যে, সেগুলি ছিল মিলনের স্থান এবং ধর্মচেতনার পরিপোষক। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন ভাবধারার লোকদের মিলন ও ঐক্য দরকার আরও বেশি। এখন যানবাহন ও সংবাদ-বিনিময়ের সুযোগ-সুবিধা হয়েছে অনেক। তাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এসেছে কাছাকাছি। কিন্তু, আঞ্চলিক স্ব-শাসনের দরুন আঞ্চলিক ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির মূল্য গেছে বেড়ে। যুগ-যুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এই সভ্যতার সমন্বয়ধর্মিতা তবেই রক্ষিত হতে পারে

যদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতার বৈচিত্র্য ও ঐক্যের ওপর সমান জোর দেয়া হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণ মানুষদের পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার এবং ভারতের সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের পরিচয়-লাভের সুযোগ দেবার জন্যে ১৯৫৪ থেকে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসব নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আন্তঃ-কলেজ যুব-উৎসব থেকে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি বেছে নেয়া হয়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়ী দলগুলি সর্বভারতীয় যুব-উৎসবে যোগ দেয়। এই উৎসবে শিল্প, কলা, নাটক, সংগীত ও নৃত্য-বিষয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছা-বাছা পোড়োর সান্নিধ্যে আসার এবং সখ্য-স্থাপনের সুযোগ হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তরুণদের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করার সুযোগও এতে হয়েছে। এখনকার চেয়ে প্রশস্ততর সুযোগ-ব্যবস্থায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও ভাবধারা-অধ্যয়নের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলকে ঘনিষ্ঠ করে-তোলার সাহায্য যে বিশ্ববিদ্যালয় করতে পারে সেকথাও এখন উত্তরোত্তর বেশি করে স্বীকৃত হচ্ছে। ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, আরবী, পারসী ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগ আছে। এমন খুব কম বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে আপন অঞ্চলের ভাষা ছাড়া অন্য অঞ্চলের ভাষা শেখানো হয়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরকম সুযোগ থাকলেও তা সাধারণত খুবই কম। ভারতে তুলনামূলক ভাবে ভাষা ও সাহিত্য-পঠন-পাঠনের সুযোগ নেই বললেই হয়। বছর কয়েক আগে ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এক অঞ্চলের পোড়োদের অন্য অঞ্চলের ভাষা-শেখায় উৎসাহ দেবার জন্যে কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিল। এইরকম সুযোগ-সুবিধার প্রসার যে শুধু শিক্ষার দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় তা-ই নয় ভারতের বিভিন্ন পরিবেশের মানুষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মানসিক সহযোগের দিক থেকেও।

৪

যতদিন যাচ্ছে তত সামাজিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন এক হিসেবে হয়েছিল ভারতীয় জনসাধারণের সুবুদ্ধি ও বিচার-বোধ নিয়ে জুয়োখেলা। কিন্তু, জনসাধারণের বেশির ভাগ নিরক্ষর হলেও এতে সত্যিই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে আবার প্রমাণ পাওয়া গেল জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির। প্রতিনিধি-নির্বাচনে বেশ বিচার-বিবেচনা দেখা গেল। স্বরাজ-লাভের পর থেকে কংগ্রেস দলই ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করে এসেছে। ১৯৫৭-তেও এর সে-অধিকার বজায় থাকল বটে, তবে এ-দলের কোন-কোন ব্যক্তি আর নির্বাচনে জয়ী হতে পারলেন না।

এই দু'টি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল থেকে খাঁটি জনশিক্ষার আবশ্যকতা ভালো ভাবেই বোঝা গেছে। এতে বিচারবুদ্ধি মোটামুটি প্রকাশ পেলেও কিছুকিছু সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থসন্ধতা নির্বারকমণ্ডলীকে করেছে বিভ্রান্ত। এ থেকে একথাটাও স্পষ্ট বোঝা গেছে যে, সারা দেশের সংস্কার করতে হলে সম্প্রদায়, ভাষা ও অঞ্চলের সবরকম বৈষম্য দূর করতে হবে। এইরকম বৈষম্যের মধ্যে সবচেয়ে যেটা বেশি করে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে গ্রাম আর শহরের মধ্যে ব্যবধান।

প্রায় একশো বছব ধরে ভারতীয় নেতারা মানুষের এই গ্রাম থেকে শহরে চলে-আসার নিন্দে করেছেন। কিন্তু গ্রামীণ জীবনের নানা অসুবিধা তাদের এই শহরমুখো হওয়ার জন্যে দায়ী। তাই নেতাদের অনুযোগে বিশেষ কোন কাজ হয় নি। গত তিনহাজার বছরে ভারতের কৃষি কোন উন্নতি লাভ করে নি। ভারতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে খুব। সঙ্গে-সঙ্গে কৃষির যদি তেমন-কোন উন্নতি না হয় তবে দারুন দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। একালের যান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সেকালের ছোট-ছোট গ্রাম্য শিল্প পাল্লায়

পেরে না উঠে ধ্বংস হতে বসেছে। তাতেও আর্থিক অবস্থা কম শোচনীয় হয় নি। এর ফলে গ্রামগুলি সব দিক দিয়েই দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সেখানে পথঘাটের অল্পতা, শিক্ষাসুযোগের অভাব; চিকিৎসা-ব্যবস্থা তো প্রায় নেই বললেই চলে। শহরগুলির তুলনায় গ্রামের ঘরবাড়ি, নালানর্দমা প্রভৃতি পুরানো ধরনের। অবশ্য, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের শহরগুলির মানও নীচু।

স্বরাজ-লাভের পর গ্রামীণ জীবনের অবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ-ভাবে অনুভূত হল। সামাজিক শিক্ষার ভাবধারা কেমন বাস্তব রূপ নিয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যায় 'সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা' এবং 'জাতীয় প্রসার-কর্ম' নামক প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রচেষ্টায়। তারপর এ-বিষয়ে আরও বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সমাজ-উন্নয়ন-বিষয়েও একটি মন্ত্রণালয় খোলা হয়েছে। যোজনা, সংযোজনা, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি দিয়ে গ্রামগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত করাই হচ্ছে তার লক্ষ্য। গ্রামের কৃষি এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন আর প্রবর্তন হচ্ছে এর প্রচেষ্টার বিষয়। গ্রামীণ জীবনের অবস্থা উন্নত করার জন্যে এই মন্ত্রণালয়ের চেষ্টা হচ্ছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে সহযোগের ভাব সঞ্চারিত করা। গ্রামের শিশু, কিশোর এবং বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা করাও এর কাজ। এই মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় গ্রামের লোকদের স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগে গ্রামে-গ্রামে পথ তৈরী হয়েছে, উন্নতি হয়েছে বাসগৃহের এবং সেচব্যবস্থার।

এই মন্ত্রণালয়ের যোজনা বাস্তবায়িত করতে হলে চাই নানা স্তরের বহু কর্মপটু লোক। এইসব লোকের শিক্ষণ এক বিশাল কাজ। গ্রামের প্রয়োজন-অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়ের নিরূপণ এবং শিক্ষণ-নিকেতনের স্থাপন এই প্রচেষ্টার অন্যতম বৃহৎ সাফল্য। অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা ও কাজ প্রবর্তিত হয়েছে নতুন রকমের, তার কোন পূর্বনিদর্শন ছিল না বললেই হয়। এখন অবধি যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় দু'রকমের কর্মী দরকার এই

কাজে। এক হচ্ছে গ্রাম্য কর্মী : তিনি হবেন গ্রামের মানুষ, গ্রামের বিবিধ সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। আর-এক ধরনের কর্মী, যেমন, কৃষি, স্বাস্থ্য-বিষয়ের অফিসার, ধাত্রী, গ্রাম্য ইন্‌জিনীআর, সামাজিক শিক্ষার কর্মীরা, শিল্পকলার শিক্ষকরা।

সম্প্রতি এই মন্ত্রণালয় গ্রামীণ শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা করেছে। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মিটলে মানুষ মহত্তর ও সুন্দরতর কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। সব জীবনের সাধারণ প্রয়োজন ক্ষুধা ও যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। মানুষ এবং পশু—উভয়েই সংগ্রাম করে উদ্‌বর্তনের জন্যে। এই টিকে থাকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে মানুষ উদ্বৃত্ত জীবনীশক্তি কাজে লাগায় সত্য ও মহত্ত্বের সাধনায়। কেউ-কেউ একথাও বলতে পারেন যে, শুধু মানুষের কেন, সীমিত ও অঙ্কুর-রূপে সত্য ও সৌন্দর্যের বোধ থাকে পশুদের মধ্যেও। তাদের মধ্যে সহযোগের ভাবও যে থাকে না এমন নয়। কিন্তু মনে হয়, তাদের মধ্যে সৌন্দর্য-বোধ কখনও দেখা যায় না। এই সৌন্দর্য-বোধেই মানুষ পশু থেকে স্বতন্ত্র; এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। তাই কেউ-কেউ মানুষকে বিচারশীল প্রাণী বলার চেয়ে বলেছেন কলাকার প্রাণী। সুতরাং, গ্রামজীবনের বিচিত্র শিল্পকলায় উৎসাহ-দানের প্রচেষ্টা রাখা যে সমাজোন্নয়ন-কর্মের পক্ষে বিহিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

ভারতের মতো দেশে চারুকলার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা সংগতই হয়েছে। আমাদের বেশির ভাগ অর্থনীতিক প্রচেষ্টাকে দেয়া হয়েছে রুচি-সুন্দর রূপ। এদেশে তো ফসল-বপন আর শস্য-ছেদনের উৎসবই আছে। ভারতের প্রতিটি ঋতুরও আছে বিশিষ্ট সুর ও ছন্দ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা কাজে শোভা ও মাধুরী আনার সংস্কার আছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য অনেক সামগ্রীরই শ্রী দেখে বিদেশীরা অনেক সময় মুগ্ধ হন। শিল্পকলার বিবিধ মাধ্যমে এদেশের অনেক ধর্মীয় ও দার্শনিক সত্য হয়েছে

রক্ষিত। ললিতকলা যেমন সর্বজনীন তেমনি অনন্য। ভারতীয় জীবনে আছে এই ললিতকলার বহুকালীন ঐতিহ্য। এতে করে গ্রামের মানুষের জীবনেও এসেছে কিছুটা শ্রীবোধ।

ললিতকলার সামগ্রীগুলিকে কিন্তু রক্ষা করা যায় না। এগুলিকে অবশ্য নতুন করে সৃষ্টি করে নেয়া যায়। কলা-সৃষ্টিতে যদি কেবলই প্রাচীনের আবর্তন-অনুবর্তন হতে থাকে তবে তাতে কোন রস পাওয়া যায় না। আবার, এ-ও ঠিক যে, চিরাগত ধারা যদি লুপ্ত হয় তবে কলাশিল্প রূপান্তরিত হয় কৃত্রিমতায়। গত একশো বছর কি তারও কিছু বেশি কাল ধরে গ্রাম্য কলাশিল্পের ক্ষেত্রে এই সংকট চলেছে। আধুনিক যুগে তো বহু প্রাচীন প্রত্যয় হয়েছে বিসর্জিত। উৎপাদনের রীতিও গেছে বদ্‌লে। সমাজের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কলাসৃজন-পদ্ধতির সে-প্রেরণা আর নেই। তাই, গতানুগতিক ছন্দানুবর্তন হয়েছে প্রাণহীন। সমাজ-উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত এবং আধুনিক যুগোপযোগী করে-তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তার জন্যে এমন পরিবেশ-সৃষ্টির আয়োজন চলছে যাতে কলাশিল্প আবার প্রাণময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। পল্লী-ভারতের উজ্জীবন যদি হতে হয় তবে গ্রামবাসীদের নিতে হবে সমন্বয়ের নীতি : সে-সমন্বয় চিরাগত ধারার সঙ্গে নবসৃষ্টির সমন্বয়, ঐতিহ্যের সঙ্গে নব-নব পরীক্ষণার সমন্বয়, আধুনিক যুগের উন্নতির সঙ্গে প্রাচীন যুগের শান্তি ও সন্তোষের সমন্বয়।

ওপরে যে-সামাজিক শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার কথা বলা হল তার কাজ গ্রামীণ অঞ্চলেই নির্দিষ্ট হয়েছে এতদিন। এখন শহর-অঞ্চলেও তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। আজ গ্রাম-গুলিকে মনে হচ্ছে মৃতবৎ, কিন্তু তার এই নিস্পন্দতা এসেছে ধীরে-ধীরে, বলতে পারা যায়, প্রায় অজ্ঞাতসারে। শহরে কিন্তু এই মৃতকল্পতার প্রতিকার অবিলম্বে না করলেই নয়। শহুরে লোকদের বেশির ভাগই একদিকে আগেকার অবস্থান থেকে হয়েছে বিচ্যুত,

আবার অন্যদিকে নতুন অবস্থানেও বসতে পারে নি শিকড় গেড়ে। সাধারণত গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা উদ্যমী ও উচ্চাভিলাষী তারাই সুবিধা-সুযোগের আশায় চলে আসে গ্রাম ছেড়ে। নগরের বিপুল জনারণ্যের বিভ্রান্তিকর পথে তারা চলে নামহারা যাত্রী। সেখানে তারা খুঁজে পায় না পুরানো প্রথা-প্রতীতির সমর্থন। পল্লী-পরিবেশের নীতিবোধ অপরিচিত, বিচ্ছিন্ন নাগরিক পরিবেশে হারায় তার সার্থকতা। অনেক ক্ষেত্রে আবার কর্মহীনতা আর অনশনের করাল কবলে পড়ে তারা। তাই অবস্থা হয় মারাত্মক। এইজন্যেই সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত তড়িঘড়ি। গ্রামের মানুষদের মতো শহরের লোকদেরও সামনে তুলে ধরতে হবে এমন-এক জীবন-নীতি, যার মধ্যে সমন্বয় হবে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, আর, যার বলে মানুষ বৈষয়িক উন্নতি-প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারবে অতীতের সাধনায় পাওয়া নৈতিক ও ভাবিক সম্পদের।

৫

এখানে কারিগরি-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। ভারতে প্রথম কারিগরি-শিক্ষায়তন স্থাপিত হয় এক শতাব্দীর কিছু আগে। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাসমরের আগে পর্যন্ত কারিগরি ও নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নি। গত মহাসমরে কারিগর ও নির্মাণ-বিজ্ঞানীর অভাব বিশেষ অনুভূত হল। তাই কারিগরি-শিক্ষা ও নির্মাণবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি পড়ল। কিন্তু, তখনকার কারিগরি-শিক্ষা হয়েছিল সমর-কালীন প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে। জাতীয় জীবনের বাণিজ্য-শিল্প ও অর্থনীতির মুল প্রয়োজনের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। সে-শিক্ষার যে-টুকু সুযোগ-সুবিধা হয়েছিল তার প্রসারকে স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তিক করে-তোলার চেষ্টা করা হয় নি।

বিগত মহাসমরে ভারতের অভিজ্ঞতা কিছু কম লাভ হয় নি। সে-সময়ে এইটে স্পষ্ট করে বোঝা গেল যে, জাতীয় অর্থনীতির অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর জন্যেও ভারতকে আমদানির পথ চেয়ে বসে

থাকতে হয়। এই অভাব মেটাবার জন্যে সমরোত্তর কালে বিশদ পরিকল্পনা করা হল। তার ফলে বিজ্ঞানকর্মী ও কারিগরদের শিক্ষণের ক্রম-বর্ধমান ব্যবস্থা হতে লাগল। কারিগরি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বৃদ্ধির কথা মানুষ বুঝল। কিন্তু, তখনকার পরিকল্পনা দেশের কারিগরি-প্রয়োজনের হিসেবে করা হয় নি। ১৯৪৫-এর শেষের দিকে এ-বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা হল। তখন প্রতিষ্ঠিত হল নিখিল-ভারত কারিগরি-শিক্ষা-সংসদ। সংসদের কাজ হচ্ছে কারিগরি-শিক্ষার প্রসার ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ে পরামর্শ দেয়া।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রচেষ্টা আরও জোরদার হল। এশিআয় এই প্রথম 'বৈজ্ঞানিক কর্মী-নিরূপণ কমিটী' গঠিত হল। তার কাজ হল দেশে কারিগরি-শিক্ষিত লোক কত আছে না আছে, বা জাতীয় পরিকল্পনার কাজে তার প্রয়োজন কত তা নিরূপণ করা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাগিদে তার প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভূত হল। এখন বেশ বোঝা গেছে যে, বাণিজ্য-শিল্পে, পরিবহণে, যোগাযোগ-রক্ষায়, কৃষিতে এবং বাণিজ্য-শিল্পের গবেষণায় বহু কারিগর মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। গত দশ বছরে তার ফলে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-শিক্ষার বেশ প্রসার হয়েছে।

পরিমাণের দিক থেকে দেখলেও দেখা যাবে যে, কারিগরি-শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অনেক হয়েছে। ১৯৪৭-এ ছিল ৩২টি শিক্ষানিকেতন। এইগুলিই প্রথম ইন্‌জিনীআরিং বা নির্মাণবিজ্ঞান-বিষয়ে উপাধি দেয়। ১৯৫৭-র ভেতর এইরকম শিক্ষায়তনের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৫টি। ১৯৪৭-এ এই নিকেতনগুলিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল তিন হাজারেরও কম। ১৯৫৭-তে সে-সংখ্যা হল প্রায় দশ হাজার। এই হিসেবে বাড়তে থাকলে ১৯৬১-র ভেতর নির্মাণবিজ্ঞানের উপাধি-পাঠের জন্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এগারো হাজারও ছাড়িয়ে যাবে। [illegible]ও যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে না। তাই এই সংখ্যাকে বাড়িয়ে [illegible] করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ডিপ্লোমার জন্যে কারিগরি-শিক্ষার সুযোগ হয়েছে ব্যাপকতর। ১৯৪৭-এ এইরকম নিকেতন ছিল ৫০টি। তাতে শিক্ষার্থী ভর্তি হত চার হাজারেরও কম। ১৯৫৭-তে নিকেতনের সংখ্যা হল ১২৭। তাতে ছাত্রসংখ্যা হল ষোলো হাজার। এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৬১-র ভেতর বার্ষিক ভর্তি-সংখ্যা পঁচিশ হাজার করার চেষ্টা চলছে।

পাস-করা ছাত্রও বেড়েছে অনুরূপভাবে। ইন্‌জিনীআরিং ও কারিগরি-শিক্ষার উপাধিধারীদের সংখ্যাও ১৯৪৭-এর তেরো শো থেকে বেড়ে ১৯৫৬-তে হয়েছে চার হাজারের ওপর। ১৯৪৭-এ পনেরো শোর কম ছাত্র ডিপ্লোমা পেয়েছিল। ১৯৫৭-তে তাদের সংখ্যা হল পাঁচ হাজার। অনুমান করা যাচ্ছে, ১৯৬১-র মধ্যে গ্রাজুয়েট্ হবে সাড়ে আট হাজার, আর ডিপ্লোমা-ধারী হবে পনেরো হাজার।

প্রগতি যে শুধু সংখ্যা আর পরিমাণেই হয়েছে তা নয়। নিখিল-ভারত কারিগরি-শিক্ষা-সংসদ এবং এর আঞ্চলিক কমিটিগুলি মিলে দেশের প্রত্যেকটি কারিগরি-শিক্ষায়তনের কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ করছে, তাদের অসুবিধাগুলি দূর করে কেমন করে সেগুলিকে উন্নত করা যায় তার বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই হিসেব-নিকেশ থেকে জানা গেছে যে, প্রায় সব নিকেতনেই শিক্ষক, উপকরণ ও স্থানের আরও দরকার আছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিয়েছে। তাতে প্রায় সব শিক্ষায়তন উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই হিসেব-নিকেশের পর নতুন-নতুন কারিগরি-শিক্ষায়তনও স্থাপিত হয়েছে। যাতে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিষয়ের অভাব না হয় এবং অযথা একই বিষয়ের আবৃত্তি না হয় তাই রাজ্যসরকার, বাণিজ্যশিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলি এমনভাবে বিষয়ের ছক করে যাতে শিক্ষার মান বজায় থাকে এবং

উন্নত হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যবহারিক শিক্ষা ও শিক্ষানবিশির সুযোগ পায় তার জন্যে বাণিজ্য-শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হয়। সব রাজ্যেই যাতে ইন্‌জিনীআরিং বা নির্মাণবিজ্ঞানের ডিপ্‌লোমা এবং ডিগ্রী-শিক্ষার সুযোগ থাকে তা দেখা রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির অঙ্গ। এই-সব ব্যবস্থার দরুন সুযোগ-সুবিধা বেশ বেড়ে গেছে এবং আঞ্চলিক বৈষম্যও হয়েছে অপসারিত, সম্পূর্ণ না হোক আংশিকও।

কারিগরি-শিক্ষা ও নির্মাণবিজ্ঞানের গুণগত উন্নতির আর-একটি দিক হচ্ছে এ-বিষয়ের বিবিধ শাখায় পোস্‌ট্‌-গ্রাজুএট্‌ বা স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ-সৃষ্টি। ১৯৪৭-এর আগে এ-সুবিধা ভারতে প্রায় ছিল না বললেই হয়। এখন অনেকগুলি বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা রেখে এরকম শিক্ষানিকেতন কয়েকটিই খোলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচশো শিক্ষার্থীর পোস্‌ট-গ্রাজুএট্‌ ক্লাসে কারিগরি ও নির্মাণবিজ্ঞান শেখার ও গবেষণা করার ব্যবস্থা আছে। ১৯৬১ সালের ভেতর অন্তত দেড়হাজার পরিণত শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সুযোগ দেবার কথা হয়েছে।

যে-সব শিক্ষানিকেতন আছে সেগুলির সুযোগের উন্নয়ন ও প্রসার সরকারের লক্ষ্য। ইন্‌জিনীআরিং এবং টেক্‌নোলজিতে উচ্চতম চর্চা ও গবেষণা করার জন্যে রাখা হয়েছে সেই লক্ষ্য। এই প্রচেষ্টার আর-এক প্রকাশ নতুন-নতুন শিক্ষায়তন-প্রতিষ্ঠায়। এই শিক্ষায়তন হচ্ছে দু'রকমের। বিজ্ঞান ও নির্মাণবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করবার জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খোলা হয়েছে জাতীয় পরীক্ষণাগার বা ল্যাবরেটারি। সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক বাণিজ্য-শিল্পের প্রয়োজনীয় কারিগর গড়ে-তোলার জন্যে উচ্চতর নির্মাণবিজ্ঞান-নিকেতনও স্থাপিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যশিল্প-সংসদ এর মধ্যে ১৮টি ল্যাবরেটারি ও নিকেতন খুলেছে। এগুলির কাজ হচ্ছে সব বিষয়ের নতুন-নতুন গবেষণা,

পরীক্ষণা ও নিদর্শায়ন করা, উন্নততর বাণিজ্য-শিল্পের পথ প্রশস্ত করা এবং বৈজ্ঞানিক, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাণিজ্যশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুযোগ দেয়া। জাতীয় জীবনের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছড়াবার কাজও তাদের ভালোভাবেই করার কথা। খড়গপুরে যে-নির্মাণ-বিজ্ঞানের শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা-ও উল্লেখযোগ্য। চারটি জাতীয় টেক্‌নোলজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটুটের একটি হল এটি। মার্‌কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেট্‌স্‌ ইনস্‌টিটুট অব্‌ টেক্‌নোলজি এবং সুইস্‌ ফেডারেল টেক্‌নোলজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটুট্‌-এর আদর্শে গঠিত খড়গপুরের টেক্‌নোলজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটুট্‌টি। এখানে ষোলোশো স্নাতকপূর্ব (আন্‌ডার-গ্রাজুএট্‌) শ্রেণীর এবং চারশো স্নাতকোত্তর (পোস্‌ট-গ্রাজুএট্‌) শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার ও গবেষণা করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই শিক্ষা-নিকেতনটি উচ্চস্তরের নির্মাণ-বিজ্ঞানী তৈরি করবার জন্যে স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের জ্ঞান বিকিরণ করাও এর উদ্দেশ্য। এখানকার পোড়োরা যে শুধু আপন-আপন শিক্ষণীয় বিষয়ের আধুনিকতম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী হবে তা-ই নয়, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতা হওয়ার মতো শিক্ষাও তারা পাবে। আর এই এখানে যে শুধু মৌল বিজ্ঞানগুলি আর নির্মাণবিজ্ঞানেরই বিভাগ আছে তা নয়, ব্যাপক কলা ও সাহিত্যের বিভাগও আছে। ভারতীয় সংসদে বিধান অনুমোদন করিয়ে এই নিকেতনটি স্থাপন করা হয়েছে। এই ধারার বিধান এই প্রথম।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুরেও অনুরূপ তিনটি নিকেতন স্থাপিত হবে। বিশেষ উল্লেখের বিষয় এই যে, বোম্বাই-এর নিকেতনটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সোভিএত ইউনিঅনের সাহায্যে। এ-সাহায্য এসেছে 'উনেসকো'র (জা-শি-স) মারফত। মাদ্রাজের নিকেতনটির নির্মাণে আনুকূল্য আসবে পশ্চিম জার্‌মানির কাছ থেকে। আশা করা যাচ্ছে, কানপুরের নিকেতনটির বেলায় মার্‌কিন

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মোটা সাহায্য মিলবে। এই নিকেতনগুলির প্রত্যেকটিতে পনেরোশো স্নাতকপূর্ব এবং চারশো স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ-ব্যবস্থা থাকবে। আশা করা যায় এই বছরের জুলাই মাসে বোম্বাই-এর নিকেতনটিতে স্নাতকপূর্ব শ্রেণীর শিক্ষার্থী প্রথম ভর্তি করা হবে। ১৯৬১ সাল শেষ হওয়ার আগেই মাদ্রাজ আর কানপুরের নিকেতনত্ব'টি খোলা হবে। এই চারটি নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষানিকেতন যখন পুরোপুরি চলতে থাকবে তখন নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষাবিষয়ে ভারত হবে পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ।

বাঙালোরের বিজ্ঞান-নিকেতনের কথা কিছু না বললে ভারতের নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষার কথা সম্পূর্ণ বলা হবে না। ১৯১১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারমনা, দূরদর্শী জামশেদজি টাটার স্মৃতিরক্ষার্থে এর রচনা। ভারতের মুক্তিলাভের পূর্বেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণায় খ্যাতি লাভ করেছে এই নিকেতনটি। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের মত হল যে, এই নিকেতনেও নির্মাণবিজ্ঞানের উঁচু ধরনের জ্ঞান ও গবেষণার ব্যবস্থা ও সুযোগ রাখতে হবে এবং সেইভাবে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে সহযোগ ও পরিস্পরিকতা বাড়াতে হবে। বিগত দশ বছরে এই নিকেতনটি ইনজিনীআরিং ও টেক্‌নোলজির বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে চারশোর ওপর পোস্ট্‌-গ্রাজুএট্‌ শিক্ষার্থী ও গবেষক এই নিকেতনের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন।

দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্যে বাণিজ্য-শিল্পের উন্নয়ন একান্ত দরকার। আর, বাণিজ্য-শিল্পের উন্নয়নের জন্যে দরকার উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক ও নির্মাণবিজ্ঞানীর, দরকার কারিগর ও দক্ষ কর্মীরও। অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই বা ঠিক তার পরেই কোন বৃত্তি অবলম্বন করবে। বাস্তবিক পক্ষে বেশির ভাগ পোড়োর শিক্ষা

শেষ হবে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে, হবে তাদের বিশেষ প্রবণতা, অনুরক্তি এবং অর্থনীতিক প্রয়োজনে। তাই, মাধ্যমিক স্তরে বিচিত্র শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষাব্যবস্থা এবং নানা ধরনের কারিগরি-শিক্ষানিকেতন-প্রতিষ্ঠা আধুনিক ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার অন্যতম উল্লেখ্য রূপ।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি-শিক্ষার সংহতিসাধন এক সমস্যা। সে-সমস্যা আছে সব দেশেই, শুধু ভারতে নয়। অর্থনীতিক উন্নতি দিন-দিন ত্বরান্বিত হচ্ছে। সেই উন্নতির জন্যে প্রয়োজন বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে-আসা তরুণদের কোন ব্যবসায়ে বিশেষ জ্ঞান এবং একটা নির্দিষ্ট কালের ভেতর ভালো সাধারণ জ্ঞান লাভ করা। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে উপযুক্ত নাগরিকের দায়িত্বপালন করা সম্ভব নয়। আবার, কারিগরি-শিক্ষা না থাকলেও সে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না নিজের ভরণ-পোষণ করতে। উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন সাধিত হবে বহু-উদ্দেশ্যসাধক বিদ্যালয়গুলি থেকে। কিন্তু, এমন অনেক পোড়ো আছে যারা বিদ্যালয়ের পাঠ-শেষে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে চাইবে। এর একটা সমাধানের উপায় ভারতে নির্ধারিত হচ্ছে জুনিঅর টেক্‌নিক্যাল ইস্‌কুল প্রতিষ্ঠা করে। এই-সব বিদ্যালয়ে ১৪ থেকে ১৭ বছরের পোড়োরা তিনবছর শিক্ষা নেবে। এই শিক্ষার পাঠ্যবিষয় হবে কয়েকটি ভাষা, কলা-বিষয়ক বিদ্যা, গণিত, বিজ্ঞান, ইন্‌জিনীআরিং-সংক্রান্ত অঙ্কনবিদ্যা, কারখানা-শিক্ষণ এবং প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্‌জিনীআরিং। এই ধরনের বিদ্যালয়ে মোট সময়ের শতকরা ৬০ ভাগ দেওয়া হবে কারখানার কাজ-শিক্ষায়। প্রথম দু'বছর শিক্ষা হবে সাধারণ; তাতে থাকবে সূত্রধর-বৃত্তি, কর্মকার-বৃত্তি, ছাঁচ-তৈরি, কলকব্‌জা-তৈরি ও লাগানোর শিক্ষা। এর লক্ষ্য হবে পোড়োদের উপকরণের উপাদান-সম্বন্ধে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার-বিষয়ে এবং সূক্ষ্ম কাজের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক

জ্ঞান দেয়া। শেষের বছরটায় হবে পোড়োর রুচিমতো বিষয়ে বিশেষ ও সংহত শিক্ষা।

এই-সব বিত্থালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্ত বাণিজ্যশিল্পে, কলকারখানায় কাজ পাওয়ার উপযুক্ত করে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা। এর জন্যে এই পাঠপর্বের শেষ বছরের কতকটা দেয়া হয় ইন্ডাস্ট্রিতে, কতকটা ইস্কুলে। পোড়োদের পর পর চারদিন থাকতে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে, আর দু'দিন ইস্কুলে। ইন্ডাস্ট্রিতে হয় শিক্ষানবিশি, আর ইস্কুলে হয় সাধারণ এবং কারিগরি-বিষয়ের সূত্রতত্ত্ব-শিক্ষা।

ভারতের অর্থনীতিক কাঠামো এখন কৃষি থেকে বাণিজ্য-শিল্পের দিকে ঝুঁকছে একটু-একটু করে। সব রকমের মুখ্য ও মূল বাণিজ্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্যে জোর চেষ্টা চলছে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পগুলির পোষকতা ও প্রসার ঘটিয়ে ভারতের কৃষির উন্নয়ন এবং পণ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটাবারও চেষ্টা হচ্ছে। এই-সব প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্যে ভারতকে তার সম্পদ ও কারিগরি-সামর্থ্য বাড়াতে হবে, তার যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা তৈরি করতে হবে। দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে জলশক্তি এবং খনিজ-সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। দেশের অগ্রগতির জন্যে বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্য-শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণা-কার্যের সুব্যবস্থা করাও বিশেষ দরকার। বিবিধ প্রকার-প্রণালী, প্রসার ও গবেষণার জন্যে দরকার উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক এবং নির্মাণবিজ্ঞানীও। যে-সব বৈজ্ঞানিক ও ইন্জিনীআর আধুনিকতম গবেষণা-কার্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, যাঁরা সে-সব জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পটু, বিশ্ববিত্থালয় ও উঁচুস্তরের জ্ঞান-নিকেতনগুলি দেশের অর্থনীতিক উন্নতির উদ্দেশ্তে তাঁদের দেবে শিক্ষা।

বাণিজ্য-শিল্প এবং প্রশাসনের মোটা মাইনের কাজ শিক্ষার সব ক্ষেত্র থেকেই যোগ্যতম লোকদের টেনে নেয়। ইন্জিনীআরিং ও টেক্নোলজি সম্বন্ধে আরও বেশি করে প্রযোজ্য একথা। যোগ্যতম

শিক্ষার্থীরা প্রায় পাস করার সঙ্গে-সঙ্গেই ভালো কাজ পায়। গবেষণাকর্মের বৃত্তি বা এই ধরনের কোন আকর্ষণ আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। এ যে শুধু ভারতেরই সমস্যা তা নয়, সব অগ্রসর দেশেরই। বাস্তবিক এই কথাই কখন-কখন বলা হয়ে থাকে যে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তি এবং সঙ্গে-সঙ্গে কর্মে নিয়োগ দেশের নির্মাণ-বিজ্ঞানের অগ্রগতিরই সূচক।

ভারতে এবং অন্যত্রও ইন্‌জিনীআরিং এবং টেক্‌নোলজিক্যাল্ শিক্ষার মূলসমস্যা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল্ বিষয়সমূহের এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অন্যান্য ধারার যথার্থ সামঞ্জস্যের সমস্যা। বৈজ্ঞানিক, নির্মাণবিজ্ঞানী বা ইন্‌জিনীআর হচ্ছেন দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন বৃত্তিজীবী মানুষ। সমাজের ওপর তাঁদের কাজকর্মের ক্রিয়া হয় বৈকি। অনেক সময় তাঁদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা নতুন সমাজ, নতুন অর্থনীতিক ব্যবস্থা আর নতুন পরিবেশ-সৃষ্টির সহায়ক হন। এই কারণে সমাজের নেতৃস্থান নেবার জন্যে তাঁদের প্রয়োজন হয়।

এইরকম দায়িত্বপালন করতে হলে ইন্‌জিনীআরের যোগ্যতা-সামর্থ্য যেমন দরকার, তেমনি দরকার নিজের ও পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞান ও নির্মাণবিজ্ঞান-শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সে-শিক্ষাকে এমন ভিত্তির ওপর স্থাপিত করা যাতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশের সেবার ভার গ্রহণ করতে পারেন। সেইজন্যেই বিজ্ঞান ও কারিগরি-শিক্ষার অনুপূরণ করতে হয় সমাজ-শিক্ষা দিয়ে। এই যে বিভিন্ন অঙ্গের শিক্ষা—এগুলিতে বিজাতীয় ভেদ নেই; এই-সব নানা অঙ্গ নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ। এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাই মানুষের শিক্ষণীয়। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-শিক্ষাকে পুষ্ট করে সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষা। আবার, সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষাকে পুষ্ট করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-শিক্ষা। মানবীয় ও সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যে দিয়ে মানবজাতির চিরাগত হৃৎসম্পদের দিক প্রকাশ পায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চতম শিক্ষানিকেতনের লক্ষ্য হচ্ছে—

এমন শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা যার ফলে মানবিক ইতিহাস ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত বিজ্ঞানী ও নির্মাণবিজ্ঞানী তৈরী হয়। সাধারণত চার বছর লাগে প্রথম উপাধি-লাভের উপযুক্ত হতে। সংক্ষিপ্ত এই চারটি বছরের ভেতর ঐ-উদ্দেশ্যসাধন করতে হলে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ের পরিকল্পনা করা দরকার। শিক্ষণীয় বিষয় এমন হওয়া চাই যাতে জীবনের ব্যবহারিক ও ভাবিক প্রয়োজন উভয়ই মেটে। সুযোগ যদি রাখা হয়, আর তার চেয়ে বড়ো কথা, যদি শিক্ষা ও সেবার ঠিক-ঠিক পরিবেশ গড়ে-তোলা এবং বজায় রাখা হয় তা হলেই ঐ-দু'দিকের প্রয়োজন মেটা সম্ভব। শেষ বিচারে, সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার ওপর। যে-বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যকলা, বিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞান-বিষয়ের সুসমঞ্জস শিক্ষাবিষয় নির্ধারণ করেছে সেখানেও আদর্শ বাস্তবায়িত করা শক্ত হবে যদি শিক্ষকরা সকলে পরস্পর সহযোগিতা না করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমানা যত বিস্তীর্ণ হতে থাকে তত নতুন-নতুন সমস্যা জাগতে থাকে। একমাত্র উচ্চগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই-সব প্রশ্ন-সমস্যা সমাধান করার উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারেন তরুণদের।

বিজ্ঞান ও নির্মাণবিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্যে চাই অধিকতর নিবিষ্ট বিশেষজ্ঞতা। কিন্তু বিশেষজ্ঞতার মোহে যদি মানুষ সামাজিক ও মানবীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে তবে মানুষ হবে প্রাণহীন যন্ত্রের মতো। কেননা, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি জীবনকে করে শোভন-সুন্দর। সমাজ এখন বিজ্ঞান ও নির্মাণ-বিজ্ঞানের ওপর বেশী নির্ভরশীল হয়েছে বলে বিষয়টি হয়েছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এখন এই দাবি করা হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন ভাবী নির্মাণবিজ্ঞানীরা দেশের নেতাও হতে পারেন। এখন মানুষের যে চিত্তের গভীরতা, বুদ্ধির নমনীয়তা এবং অস্পষ্টদৃশ্য ভবিষ্যতে

নানাদিকে যতটা বাড়বার সামর্থ্য থাকা দরকার এর আগে ততটা কখনই হয় নি। যত এর প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভূত হবে ততই অন্যান্য উচ্চশিক্ষা-নিকেতনের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে উপস্থিত হবে বিজ্ঞান ও কলা-বিষয়গুলির সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা। খড়গপুর এবং বাঙালোরের এই সামঞ্জস্য-প্রচেষ্টার কথা আগে বলা হয়েছে। সম্প্রতি সরকার বৈজ্ঞানিক নীতি-বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ-জিনিস এই প্রথম। এতে আধুনিক পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকের স্থান কোথায় তা পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এক নতুন মন্ত্রণালয় খোলা হয়েছে। তার নাম হচ্ছে— বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক-মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞান, নির্মাণ-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির সুসমঞ্জস সমন্বয়ের এ হল প্রশস্ত প্রচেষ্টা।

২২শে এপ্রিল, ১৯৫৮

॥ ওরিয়েন্টের প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য ॥

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি—অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী		৬·০০
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা—ডাঃ তারকনাথ ঘোষ		৫·০০
বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য		২৫·০০
বৈভাষিক দর্শন—অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ		২০·০০
মহামতি বিদুর—মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ		৩·০০
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত		৩·২৫
বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়—কবিশেখর কালিদাস রায়		৮·০০
বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি		৫·০০
কি লিখি ?—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধী		৩·৫০
ভক্ত কবীর—উপেন্দ্রকুমার দাস		৫·০০
বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য		৫·০০
রবীন্দ্র কাব্য-পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য		১৫·০০
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য		১২·০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড—প্রমথনাথ বিশী		৫·০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড—প্রমথনাথ বিশী		৫·০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী		৫·০০
নানা রকম—প্রমথনাথ বিশী		৬·০০
রবীন্দ্র-হৃদয়—রেণু মিত্র		৫·০০
নেহেরু ও পররাষ্ট্রনীতি—অনাদিনাথ পাল		৫·০০
বাঙ্গালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ—অধ্যাপক গোপাল হালদার		৪·০০

॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

কেদার-বদরী—জ্যোতিষচন্দ্র রায়		৪·৫০
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর—	প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮·০০
দুনিয়া দেখছি—কল্যাণী প্রামাণিক		৫·০০
ভারত-ভ্রমণ—রামনাথ বিশ্বাস		৫·০০
দেশে দেশে মোর ঘর আছে—স্বপনবুড়ো		২·৫০
সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে—স্বপনবুড়ো		২·৫০
মহাচীনে শ্রীনেহেরু—বার্তাবহ		৩·৫০
নতুন জাপান—কালীপদ বিশ্বাস		৮·০০
মন্দিরে মন্দিরে—ধীরেন্দ্রলাল ধর		৬·০০

ওরিয়েন্টের শিক্ষানীতির বই

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা—সুধীরচন্দ্র কর	৫·০০
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা—সুধীরচন্দ্র কর	৪·০০
বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১০·০০
শিক্ষা-বিচিত্রা—নিখিলরঞ্জন রায়	৪·৫০
সমাজ-শিক্ষার ভূমিকা—নিখিলরঞ্জন রায়	৩·০০
জনশিক্ষার-কথা—নিখিলরঞ্জন রায়	৫·০০
নূতন শিক্ষা—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	২·০০
সমাজ ও শিশু-শিক্ষা—প্রতিভা গুপ্ত	৬·০০
সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা—প্রতিভা গুপ্ত	৮·০০
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রতিভা গুপ্ত	৬·০০
শিক্ষা—মহাত্মা গান্ধী	৩·০০
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ—অনাথনাথ বসু	১·২৫
প্রাথমিক শিক্ষা—রেণু মিত্র	৪·০০
শিশু পরিবেশ—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়	৬·০০
শারোদৎসব দর্শন—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়	২·০০
গুরু-দর্শন—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়	২·৫০
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা—সুধীরচন্দ্র কর	৪·০০
সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা—সুধীরচন্দ্র কর	৫·০০
বুনিয়াদী শিক্ষা—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	২·০০
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি—বিজয়কুমার ও সাধনা	৩·০০
নঈ তালিম—ধীরেন্দ্র মজুমদার	২·০০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম—অনিলমোহন গুপ্ত	২·০০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য়—অনিলমোহন গুপ্ত	৪·৫০
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন—অনিলমোহন গুপ্ত	৪·০০
বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি—অনিলমোহন গুপ্ত	২·৫০
শিক্ষকশিক্ষণ-প্রবেশিকা—বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত	২·৫০
শিক্ষার নূতন পথে—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী	
নয়া-শিক্ষা—ফণিভূষণ বিশ্বাস	
গ্রন্থাগারে পুস্তকনির্বাচন—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	·৭৫
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	৯·০০